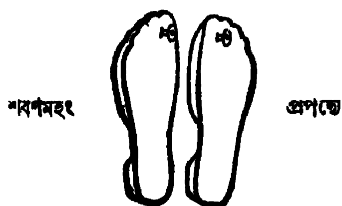
যুগদেবতা রামগোবিন্দ

ওঁ নমো রামগোবিন্দচরণৌ



শ্রীমতে রামগোবিন্দায় নমঃ

ব্রহ্মচারী তুলসীদাস

ব্রহ্মচারী প্রেমদাস

শ্রীগোবিন্দ আশ্রম। বাক্‌সাড়া। হাওড়া।

প্রকাশক
শ্রীধ্রুব চক্রবর্ত্তী
শ্রীগোবিন্দ আশ্রমএর পক্ষে
৩৬, বাক্সাড়া রোড
পোঃ বাক্সাড়া, হাওড়া

প্রথম প্রকাশ
পৌষ সংক্রান্তি ১৩৬৭
১৪ই জানুয়ারী ১৯৬০

প্রাপ্তিস্থান

(১) শ্রীগোবিন্দ আশ্রম
৩৬, বাক্সাড়া রোড
পোঃ বাক্সাড়া, হাওড়া

(২) শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী
১৬৭এ, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৭

(৩) কমলা বুক ডিপো
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

(৪) নীলমণি হালদার এণ্ড কোং
১৩, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১৩

মুদ্রক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে
দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রি এণ্ড
ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃএর পক্ষে
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

উৎসর্গ

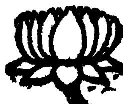
শ্রিয়ৈ নমঃ। অমৃতোদ্ভবায় নমঃ। কান্তায় নমঃ। চন্দ্রশোভিণ্যৈ নমঃ। বরারোহায় নমঃ। হরিবল্লভায় নমঃ। বিষ্ণুদেবস্থৈ নমঃ। বিষ্ণে নমঃ। বৈষ্ণবীশক্তিভ্যো নমঃ। বৈষ্ণবে নমঃ। বিষ্ণবে নমঃ। সারগুণ্যৈ নমঃ। দেবদেবিক্যৈ নমঃ। লক্ষ্মীণ্যৈ নমঃ। সুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ। অস্মদগুরুভ্যো নমঃ। অস্মৎপরমগুরুভ্যো নমঃ। অস্মৎসর্ব-গুরুভ্যো নমঃ। অস্মৎপরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ। অস্মৎপরাপরগুরুভ্যো নমঃ। অস্মৎপরমার্থতত্ত্বচৈতণ্যানন্দাত্মগুরবে নমঃ। অস্মৎসচ্চিদানন্দ-তত্ত্বচৈতণ্যানন্দাত্মগুরবে নমঃ। শ্রীমতে রামরাঘব গুরবে নমঃ। শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। শ্রীপরাঙ্কুশদাসায় নমঃ। শ্রীমদ্‌যামুনমুনয়ে নমঃ। শ্রীরামমিশ্রায় নমঃ। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ। শ্রীমন্নাথমুনয়ে নমঃ। শ্রীমতে শঠকোপায় নমঃ। শ্রীমতে বিষ্বকসেনায় নমঃ। শ্রিয়ৈ নমঃ। শ্রীধরায় নমঃ।

ওঁ নমঃ নারায়ণায় শ্রীমন্নারায়ণায়চরণৌ শরণমহং প্রপদ্যে শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ। ওঁ নমঃ রঙ্গনাথায় বিদ্মহে রামগোবিন্দায় ধীমহি তন্নো রঙ্গর্নায়কী বল্লভঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ নমঃ রামরামায় প্রচোদয়াৎ, ওঁ নমঃ নারায়ণায় প্রচোদয়াৎ। ওঁ নমঃ রামগোবিন্দায় বিদ্মহে রাঘবসীতাসুতায় ধীমহে তন্নঃ শৃঙ্গারীরঙ্গনায়কীবল্লভঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ নমঃ রামগোবিন্দায় চরণৌশরণমহং প্রপদ্যে শ্রীমতে রামগোবিন্দায় নমঃ।

সৃষ্টজনাবর তুষ্টহর খগতুরগোত্তমবাহনতে। কল্কিরূপঃ পরেশো নমঃ, রামগোবিন্দরূপ পরেশো নমঃ ভক্তস্তে পরিপালয় মাম্।

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরঃ
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরমোব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
ধ্যানমূলং গুরোমূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোর্পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরুকৃপা।

শ্রীগুরুনারায়ণচরণযুগলে সমর্পণমস্তু



কলিগতাব্দ—	৫০৭২
শকনরপতেরতীতাব্দ—	১৮৯৩
সন—	১৩৭৮
খ্রীষ্টাব্দ—	১৯৭২
বিক্রমাব্দ (সম্বৎ)—	২০২৮
বঙ্গাব্দ (সন)—	১৩৭৮
শ্রীচৈতন্যাব্দ—	৪৮৬।৮৭
শ্রীশঙ্করাব্দ—	৫২২।২৩
বুদ্ধাব্দ—	২৫১৪
রামানুজাব্দ—	৯৫৫
রামগোবিন্দাব্দ—	৭৬

অথশ্বেতবরাহ কল্পাব্দ—৪৩২০০০০০০০

বৈশাখশুক্লপক্ষীয়াক্ষয়তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিঃ।

বর্ষ ১৭২৮০০০—মৎস্যকূর্ম্মবরাহনৃসিংহা।

কার্ত্তিকস্য শুক্লপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ সোমবারে ত্রেতাযুগোৎপত্তিঃ।

বর্ষ ১২৯৬০০০—বামনপরশুরামশ্রীরামচন্দ্র।

ভাদ্রকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বৃহস্পতিবারে দ্বাপরযুগোৎপত্তিঃ।

বর্ষ ৮৬৪০০০—কৃষ্ণবলরামবুদ্ধ।

মাঘমাসস্যপূর্ণিমায়াং তিথৌ শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ।

বর্ষ ৪৩২০০০—রামগোবিন্দকল্কি।

সত্য— নারায়ণপরা বেদানারায়ণপরাক্ষরা।
নারায়ণপরা মুক্তির্ণারায়ণপরাগতিঃ॥

ত্রেতা— রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

দ্বাপর— হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

কলি— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীগুরু নারায়ণ ঠাকুর বলিতেন, "আমাদের ধর্ম—জীবে সেবা, নাম সার, প্রেম ধর্ম। কলিহত জীব সাড়ে ২৪ ইন্দ্রিয়কে প্রেমিক করিয়া তোল। অহরহ নামপ্রেমে বিভোর হইয়া থাক। ইন্দ্রিয়-গণকে একমুখী করিয়া না রাখিলে, ইতি উতি ধাইবে, মনকে স্থির হইতে দিবে না। নতুন করিয়া নাক টিপিয়া যোগভ্যাস করিতে হইবে না। মাতো, মাতো, নাম সংকীর্ত্তনে মাতিয়া যাও। মনে রাখিও ভাঙতে হবে উল্টা চাবি গুরুমন্ত্র ক্রিয়ার জোরে।"

আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্যদেব সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন। তিনি তাঁহার নবকলেবরে নিজে খাইয়া দীন দুনিয়াকে খাওয়াইতে আসিয়াছিলেন। অষ্টসাত্ত্বিকী ভাব ও চিহ্ন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সদা সর্বদা ফুটিয়া থাকিত। তিনি বলিতেন, "চালাইয়া যাও, একদিনে না হয় পাঁচদিনে হইবেই। শ্রীগুরুর কৃপায় সকলই সম্ভব। চাই দৃঢ়বিশ্বাস। আর চাই গুরুকৃপা। গুরুকৃপাই পথের পাথেয় জানিয়া রাখিও।"

শ্রীগুরুজীবণ-চরিত রচনা করার সাধ্য মানুষের নাই। যাঁহার প্রসাদে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয় তাঁহার লীলা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার অধিকার কোথায়, সাধ্য ত' দূরের কথা? একদিন বুঝি সেইজন্য প্রিয় ভক্তকে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার কি জীবন চরিত লিখিবে? তোমায় লিখিতে হবে না। আমার জীবন-চরিত স্বয়ং গণেশ আসিয়া লিখিবে।" তাঁহার মহিমা, অপার লীলা কলমের সীমায় লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা বা স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। আমাদের বাসনা, আমাদের ইচ্ছা তাঁহার নাম জগতে প্রচারিত হউক, প্রকাশিত হউক। লোকে জানুক যে পরমেশ্বর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত আবার আসিয়াছিলেন—অতি সাধারণভাবে—এই দীন কুটীরে, এই ধরার ধুলায়। কিন্তু আমরা এবারও ব্যস্ত ছিলাম নিজ কর্মকাঁদে। এবারও আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারি নাই, কারণ এবারও আমরা

পূর্বেকার ন্যায় রঙ্গ-রসে মাতিয়া মোহে মজিয়াছিলাম। সেই কারণে শ্রীধর অধরা ধরা দিলেও আমরা ধরিতে বা বুঝিতে পারি নাই।

আমরা মাটির মানুষ। আমরাই বা নিত্যলীলাময়ের লুকোচুরি কি করিয়া ধরিতে পারি? চৈতন্য অচৈতন্যের, জ্ঞান অজ্ঞানের লুকোচুরিতে পঞ্চভৌতিক অন্নকোষময় জীব আমরা অবাঙ্‌মানস গোচরকে ধরিব কি করিয়া? পূর্ণব্রহ্মসনাতন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে যেমন তৎকালীন যাদবগণ, মথুরাবাসী ও হস্তিনাপুরবাসিগণ ধরিতে পারেন নাই এই কলিযুগে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাদের সীমিত চিন্তাধারায় তাঁহাকে মাপিতে গিয়া বরাবরই ঠকিয়া গিয়াছি। তিনি ধরা দিলে তবেই যশোদা মা তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন, মুখমধ্যে মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া দিলেন। সেজন্য আচার্য্যদেবের জীবন চরিত লিখিবার দুঃসাহস নাই। তাঁহাকে স্মরণ মননের একটি উপায়মাত্র এই কাহিনী-সংকলন। ভক্তদের বহুদিনের অনুরোধ ও দাবী যে ঠাকুরের জীবনী প্রকাশিত হউক। তাই আমাদের ক্ষুদ্র এই পূজার ডালিতে তাঁহার ভক্তদের সবরকম পুষ্প সাজাইয়া তাঁহার চরণে অর্ঘ্য প্রদানের একটি প্রচেষ্টামাত্র। প্রকাশে ত্রুটি ও ব্যর্থতা যাহা উহা আমাদের। দ্বিতীয় সংস্করণে উহা স্খালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

শ্রীগুরুনারায়ণ তাঁহার ভক্তের পরশ ও প্রেমবারি, তাঁহার ভক্তের প্রেমতুলসী, হাতের চন্দন বড়ই ভালোবাসিতেন। তাই দিনের পর দিন ভক্তদের দিয়া চন্দন বাটাইয়াছেন। দিনের পর দিন সেই চন্দন সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তদের হাতে বাটা চন্দনের পাহাড় চন্দনকূট করাইয়া মহাপ্রয়াণের পূর্বে বলিলেন, "আমার প্রাণের ভক্তদের হাতের বাটা চন্দনের পাহাড় দুইটি মহাযজ্ঞের দিন আমার বুকে তুলিয়া দিও।" সকলের প্রেমচন্দন বুকে লইয়া ঠাকুর যেন পরমতৃপ্ত, চিরশান্ত। ভগবান্, ভক্ত ও ভাগবত এক ও অবিচ্ছেদ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভক্তের নিকট আমাদের আবেদন তাঁহাদের জীবনে শ্রীগুরুগোবিন্দের যাহা ও যেইরূপে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ও লীলামাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন উহাসকল আমাদের লিখিতভাবে

জানাইয়া প্রকাশে অনুমতি দিলে আমরা গুরুগ্রন্থ মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কলিযুগদেবতা পরমপুরুষ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীরামগোবিন্দের লীলাচরিত বিংশশতাব্দীর জগৎবাসীকে নিশ্চিত আলোর পথ দেখাইবে, তাহার পিপাসায় প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়া তাহার ক্ষুব্ধ, অশান্ত, জর্জরিত হৃদয় প্রশান্ত করিবে এবং উদ্যমী ও পুনরুৎসাহিত করিবে এই বিশ্বাস রাখি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকাহিনী অশেষ এবং আমরা এই পুস্তকে মাত্র কয়টি লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আশা রাখি ক্রমশঃ আমরা ভক্তদের নিকট হইতে উহাসকল উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সদা নিত্যলীলায় রহিতেন এবং কখন কোথায় কি করিয়াছেন তাহা সঠিক সংবদ্ধ করিতে পারিলে সত্যই এক মহাভারত হয়। একদিন বিশাল এক গাছের গুঁড়ি যজ্ঞকুণ্ডে দিয়া বলিলেন, "এই কামান দাগিলাম।" চার ঘণ্টার ভিতর বেতারে শুনিলাম যে বৃটিশ রাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। যিনি বালক অবস্থা হইতে দর্শনের ভিতর ডুবিয়াছিলেন, তাঁহার নিত্যলীলার অবস্থা সাধারণে বুঝিবে কি করিয়া? ১৯২৭ নাগাদ তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় আবির্ভূত হন।

ধারাবাহিকভাবে তাঁহার জীবনী কোন একজনের নিকট পাওয়া যায় না। অমৃতের দূতের ন্যায় তিনি কখন কোথায় গিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন আবার পরমুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন কে বলিতে পারে? একবার বালীর পঞ্চাননতলার শ্রীবিজয়কুমার ঘোষালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবব্রত ঘোষাল ঠাকুরের পিছন পিছন বৈকালে বালী হইতে বেলুড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাকে তাঁহার পিছন পিছন আসিতে নিষেধ করিতেছিলেন এবং অগত্যা তাহাকে তাঁহার খড়ম জোড়া লইয়া বাড়ী চলিয়া যাইতে বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ঐদিনে সন্ধ্যাবেলা ভক্তের আকর্ষণে তিনি ধানবাদে এক ভক্তের গৃহে আবির্ভূত হইলেন। দুইদিন বাদে পত্র আসিল যে তিনি দুইদিনে আগে নিরাপদে ধানবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং এ হেন পুরুষের জীবনী কাহারও রচনা করা সাধ্য আছে বলে মনে করি না। তবু আমাদের আর্তি, আশা,

আকাঙ্খা আমরা আমাদের আচার্য্যদেবের গুণগরিমা জগৎসভায় প্রচার করি, প্রতিষ্ঠা করি।

আশা রাখি সহৃদয় পাঠকগণ ঠাকুরের জীবনের কিছু অংশ লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার আমাদের এই যৎসামান্য প্রচেষ্টা সহৃদয়ে উপলব্ধি করিবেন। এইটুকু আমরা নিবেদন করিতে পারি যে এই জীবনী বা সংকলনে কোনওরূপ আতিশয্য বা বাড়তি কিছু প্রকাশ করি নাই। তিলকে তিলই রাখিয়াছি,-তাল করি নাই। যাহা প্রকৃত তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি উহাই প্রকাশ করিয়াছি।

পাঠ করিবার পূর্বে পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে তাঁহারা গুরুগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। যে জগতের যাহা উহা অন্য জগতের লোকের নিকট অবান্তর, অবিশ্বাস্য বা অবাস্তব ধারণা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতির নিকট, বাস্তবের নিকট, সত্যের নিকট, মহাকালের নিকট তাহা সত্য।

এই পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকগণের একটি বদ্ধমূল ধারণা হইবে যে রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে উহার প্রত্যেকটি সত্য। একটিও অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তি নহে। ঐ ইতিহাস দুইটি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনে মিথ্যা বা আজগুবি কোন কালেই স্থান পায় নাই। যাঁহারা জীবনে সত্যের সাধনাই করিয়া চলেন তাঁহারা আর যাই সৃষ্টি করুক কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা সৃষ্টি করিতে বা চিন্তা করিতে সমর্থ নহেন। কলিহত, বীর্য্যহীন, সন্দেহজর্জ্জরিত মানুষের হয়ত উহা বিশ্বাস করিতে অসুবিধা হয় বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার তাড়নায়। কিন্তু উহা সকল সত্য, সত্য, সত্য।

হরি ওঁ তৎসৎ।



শ্রীগোবিন্দ আশ্রম
(মাতৃ আশ্রম)
পোঃ—গদীবেড়ো
জিলা—পুরুলিয়া

শুভ আশীর্ভাজনেষু তুলসী পরিতোষ,

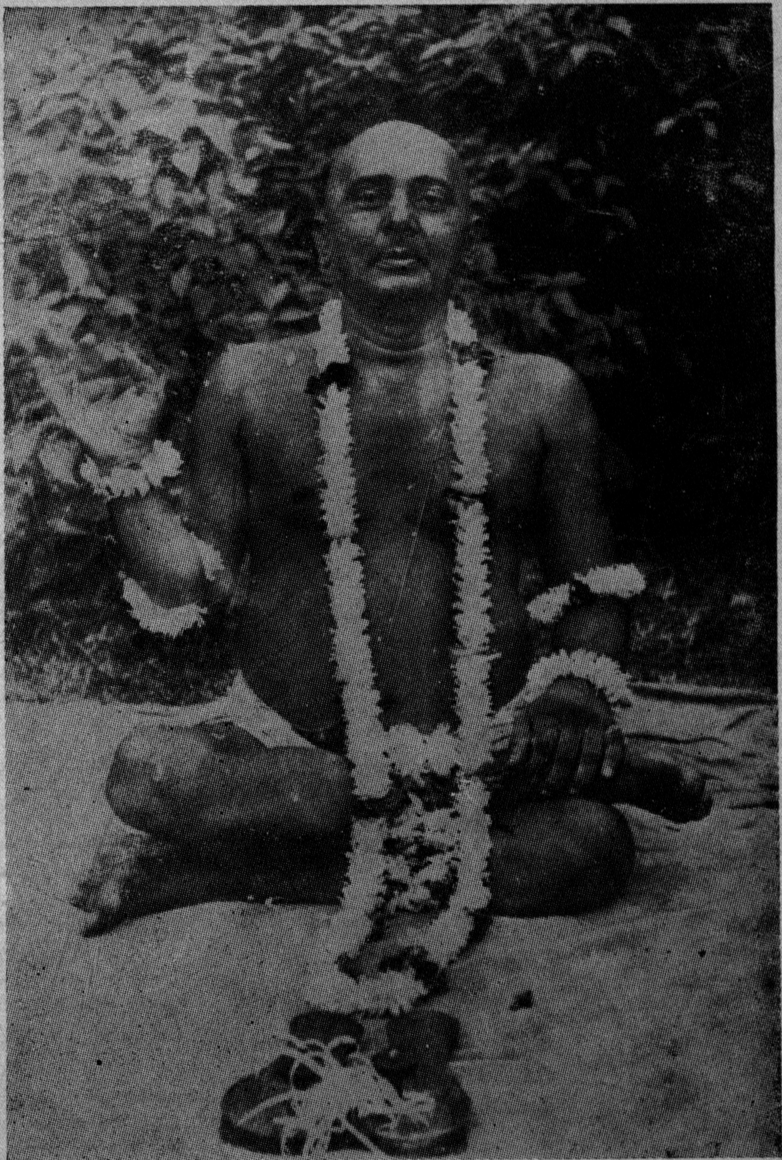
তোমরা শ্রীগুরু জীবন-চরিত প্রকাশ করিতেছ জানিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হউক।

ইতি

শৃঙ্গারী আম্মা

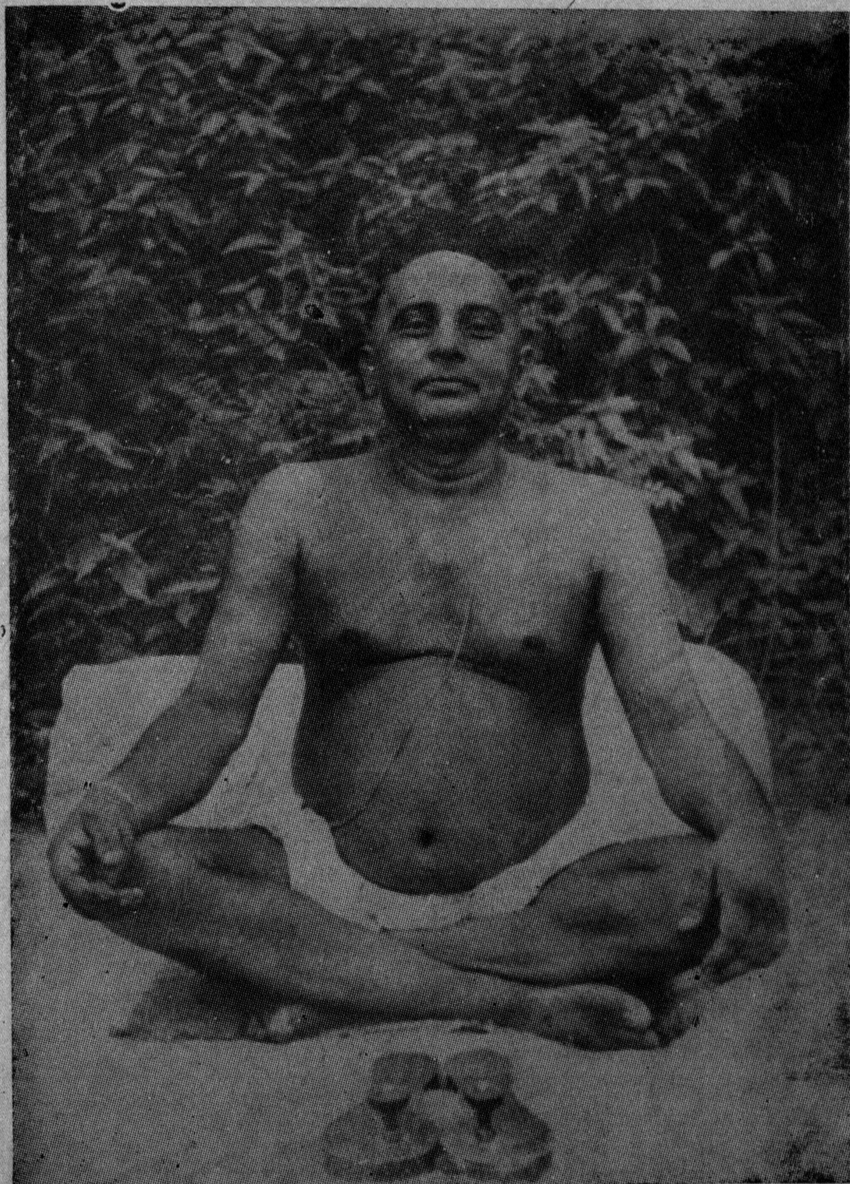
যুগদেবতা শ্রীশ্রীরামগোবিন্দের শ্রীহস্তলিখিত এই পংক্তিকয়টি তুলসীর ডায়েরী হইতে উদ্ধার করি।

জগদ্গুরু যুগদেবতা শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্যদেব



যদাযদাহি ধর্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীল শ্রীশ্রী১০৮ গীতগোবিন্দ আচার্য্যদেব



মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ

(আশ্রমে ১৯৫২)

প্রথম অধ্যায়

আবির্ভাব, বিবাহ ও সাধনা

যখন খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীতে মোড় ঘুরিতেছিল এবং বঙ্গাব্দ ত্রয়োদশ শতক চতুর্দ্দশ শতকে পরিণত হইল ঐ চার শতকের মহাসন্ধিক্ষণে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ –পুরুষোত্তম গোবিন্দ –স্বর্গে দুন্দুভি বাজাইয়া, মর্ত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বৎসরের পুণ্যতম দিবসে যখন বাংলার আনন্দমুখরিত গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে পৌষের ফসল তুলিয়া নবান্নের উৎসবে গৃহস্থ মুখরিত, দাওয়ায় বালক বালিকাগণ পায়েসের বাটীতে পিঠা-পুলি লইয়া ব্যস্ত, মণ্ডপে মণ্ডপে সমৃদঙ্গ হরিকীর্ত্তন চলিতেছিল, যখন বাংলার পুণ্যসলীলা গঙ্গাসাগরের সম্মিলনে লক্ষ লক্ষ সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহী পুণ্যার্থীগণ অবগাহনরত ও কপিলমুণীর আশ্রমে আরতি ও হোমাগ্নিতে আহুতি চলিতেছিল ও স্বর্গের দেব-দেবীগণ মর্ত্তে নামিয়া মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে অবগাহন করিতেছিলেন এবং হিমালয় ও দক্ষিণ মেরু হইতে বহমান পুণ্যবায়ু বাংলার আকাশে বাতাসে মিশিতেছিল, একাদশীর শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথিতে আহিমাচল কন্যাকুমারিকা সনাতন আর্য্যভূমির অরণ্যে, গুহায়, তটে, মন্দিরে সাধুগণ শ্রীরঙ্গনাথ বৈকুণ্ঠনাথের ধ্যান, আরতি, পূজা ও কীর্ত্তনে মগ্ন সেই শুভ মুহূর্ত্তে রাত্রি এগারোটায় জগদীশ্বর নারায়ণ মর্ত্তলোকে একটি শিশুর রূপে ছোট্ট কুটীরে ঢেঁকিশালায় হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হইলেন। সেদিনও সকলের অলক্ষ্যে দেব দেবীগণ স্তবস্তুতি করিতেছিলেন এবং অশ্বিনী নক্ষত্রও আনন্দে নাচিতেছিল। গ্রামের অতি মনোহর প্রাকৃতিক শিলা যাহা গরুড়ের ন্যায় দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া পথের মাঝে কেশবচাঁদের দ্বার রক্ষা করিতেছেন সেই বিশাল হনুমান শিলার দক্ষিণকোলে সেদিন আকাশের চাঁদ মাটিতে নামিয়া আসিয়াছিল। প্রতি একাদশীর ন্যায় ঐদিনটিতেও

গ্রামের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ও আচার্য্য পরিবারের গুরু বালবিধবা ব্রহ্মচারিনী শেষলক্ষ্মী আম্মা গ্রামেব মায়েদের লইয়া শ্রীরঙ্গনাথজীর স্তোত্র, পঞ্চসূক্ত, আলওয়ান্দার স্তোত্র, গুরুবন্দনা ও কেশবচাঁদের গুণকীর্ত্তনে ও হরিবাসরে যখন গৃহ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই সময় ধরার ধূলায় ধরা দিলেন শঙ্খচক্রধারী গোবিন্দ।

মহাপুরুষ মাত্রই কি দিন ক্ষণ দেখিয়া জন্মগ্রহণ করেন? কেহ জন্মগ্রহণ করেন গভীর আঁধারে কারাগারে, কেহ পথিমধ্যে অরণ্যে, কেহ আস্তাবলে, কেহ নিমবৃক্ষের তলায়, কেহ ঢেঁকীশালায়। কি আশ্চর্য্য!

আমাদের পরমপ্রিয় শ্রীগুরু গোবিন্দের জন্ম বাংলা ১৩০৩ সাল পৌষ সংক্রান্তি, সোমবার। বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথি, অশ্বিনী নক্ষত্র, রাত্রি ১১টা। হরি বাসরের আনন্দ উৎসবে চারিদিক যখন মুখরিত, মানভূম জেলার অন্তর্গত 'গদিবেড়ো' গ্রামে মাতুলালয়ে হনুমানশিলার পার্শ্বে ঢেঁকিশালে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামী ধরাধামে অবতীর্ণ হন। পিতা তাঁহার রাঘব আচার্য্য, মাতা সীতা দেবী। পবিত্র ব্রাহ্মণের অল্পবিত্তের সংসার, শ্রদ্ধাচারিতা ও ন্যায়পরায়ণতায় ভরপুর।

এইবার যে মুহূর্ত্তটি যুগাবতার বাছিয়া লইলেন উহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের সাধনা মানুষ শুরু করিয়া অহঙ্কারে একদিকে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে অন্যদিকে "ততঃ কিম্?" এই প্রশ্ন তাহাকে বিজ্ঞানের সারহীনতা সম্বন্ধে ও তাহাকে অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনার আকর্ষণে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ভারতের সনাতন ধর্মের প্রচারক বৃহত্তম শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির কেন্দ্রে গিয়া তাহাদের মত্ততা ও অসারসাধনা সম্বন্ধে সাবধানবাণী ও সতর্ক করিয়া দিতেছেন। ভারতের দরিদ্র জনগণ জাগিয়া উঠিতেছে। ম্লেচ্ছ ও যবনজাতি বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-উপনিষদ হইতে জ্ঞানলাভ করিতে শিখিতেছেন ও তাঁহাদের সীমিত জগৎ ও সাধনা সম্বন্ধে সচেতন

হইয়া তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতাসম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। অন্যদিকে পরাধীনতার গ্লানি ভারতের মর্মে প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্বধর্ম সম্বন্ধে হৃতজ্ঞান করিয়া তুলিতেছে এবং যাহাই বিজাতীয় ও বিদেশী উহাই আকড়াইয়া ভাসিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রাহ্মধর্মের এক স্রোত আসিয়া সনাতন ধর্মের দুর্গে আঘাত হানিতেছে ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা উহার ভিতর অনুপ্রবেশ করিতেছে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সব্যসাচীর ন্যায় দুই হাতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া গোঁড়ামীহীন ও মুক্ত নবভাবত গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। দশদিক আলো করিয়া বাংলার মণিষীগণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিতেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রামেন্দ্রসুন্দর, কেশব সেন. গিরীশ, দেবেন্দ্রনাথ, জগদীশ. প্রফুল্ল রায়, সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র, দেশবন্ধু, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, হরপ্রসাদ, প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগুলি চতুর্দিকে আলো বিকীরণ করিতেছেন। অধ্যাত্মজগতে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ্য, বামাক্ষ্যাপা, নিগমানন্দ, বারদীর ব্রহ্মচারী, জগবন্ধু, বালানন্দ, ভোলানন্দ, কাঠিয়াবাবা প্রমুখ অবধূত ও অবতারসদৃশ পুরুষগণ উনবিংশ শতাব্দীতে সন্দেহজর্জরিত মনে ও বৃটিশরাজের চিত্তে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। দিকে দিকে গৃহত্যাগী হইবার এক আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে! এমন যুগসন্ধিক্ষণে কলিকাতাই ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী।

কলিকাতা হইতে মাত্র দেড় শত মাইল দূরে বেড়ো গ্রাম। আসানসোল বা আদ্রা ষ্টেশন হইতে ট্রেণ বদল করিয়া আসানসোল-আদ্রা প্যাসেঞ্জার অথবা আদ্রা-আসানসোল প্যাসেঞ্জার চড়িলে মাত্র এক ঘণ্টার পথ গদীবেড়ো ষ্টেশন। ষ্টেশন্ হইতে মাত্র দুই মাইলের মেঠো, গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিলেই বেড়ো গ্রাম। দুই পার্শ্বে উর্বর ক্ষেতের মধ্য দিয়া সর্পিলভঙ্গিতে পায়ে হাঁটা মেঠো পথ ষ্টেশন হইতে মিশিয়া গিয়াছে বেড়ো গ্রামে।

পাহাড় বেড় দিয়া আছে বলিয়াই এই গ্রামের নাম বেড়ো। তিনটি পাহাড়ের কোলে ও একটি অতিমনোরম কোকোনদশোভিত হ্রদের ধারে এই পুণ্যভূমি বেড়োগ্রাম। 'বড় পাহাড়' 'ধবা পাহাড়' ও 'চণ্ডি পাহাড়' ও পদ্মবাঁধ। জঙ্গলাকীর্ণ পঞ্চকূট পাহাড় বিশাল ধূসরবর্ণের বরাহের ন্যায় দূরে দেখা যায়। গ্রামে হনুমান শিলাব সম্মুখে কেশবচাঁদের অতিমনোরম যুগলমূর্তি ও নাটমন্দির সহ স্বর্ণচূড়া শোভিত মন্দির বিদ্যমান। প্রহরে প্রহরে নিত্য ভোগ, আরতি, পূজা, পাঠ ও কীর্তন হয়।

কাশীপুররাজ সিংদেও কয় পুরুষ আগে দক্ষিণ দেশ হইতে গুরুকে সসম্মানে এইস্থানে আনয়ন করিয়া এই গ্রাম ও চতুঃস্পার্শ্বস্থ ভূমি কেশবচাঁদের নামে দেবোত্তর করিয়া দান করেন। কেশবচাঁদ হইলেন এই গ্রামের মালিক। গুরু হইলেন প্রধান পুরোহিত ও জমিদার। রাজার গুরু বলিয়া তাঁহাকে সকলে মহাপ্রভু আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই গ্রামের শিরোমণি। শংকর আচার্য্যের বংশধর। তিনি কেশবচাঁদের সেবার জন্য হায়দ্রাবাদের বল্লভী (বল্লভীপুর-বর্দ্ধণ্যপেটা) আচ্চি গ্রাম হইতে আচার্য্য পরিবারবর্গকে এই স্থানে আমন্ত্রণ করিয়া পত্তনি দেন। এই আচার্য্য পরিবারবর্গ মাদ্রাজের কাঞ্চীপুরম্-বঙ্গীপুরম্ এর আচার্য্যরূপে কীর্তিত। বল্লভীপুরে তাঁহাদের মন্দিরে পূজার্চনার জন্য বল্লভীপুরের রাজা তাঁহাদের গুরুবরণ করিয়া কাঞ্চিপুরম্ হইতে লইয়া আসেন! সুতরাং বেড়োর আচার্য্যগণ আদি মাদ্রাজের কাঞ্চীপুরম্-এর আচার্য্য পরিবার যাঁহাদের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কপুরুষ শ্রীশ্রীরামানুজ আচার্য্যদেব। অবতার শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামীর পিতা ছিলেন শ্রীরাঘব আচার্য্য গোস্বামী। রাঘব আচার্য্যের পিতামহ কাঞ্চীপুরম্-বঙ্গীপুরম্ হইতে রাজার আমন্ত্রণে বল্লভীতে আসিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিলেন। বেড়োর মহাপ্রভুর ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের সাত কন্যার দ্বিতীয়া কন্যা সীতারামদবী (সীতারামাম্মা) বা সীতা

দেবীর সহিত শ্রীরাঘব আচার্য্য গোস্বামীর বিবাহ হয়। শ্রীরাঘব আচার্য্য গোস্বামী বেড়োতে বিবাহ করিয়া শ্বশুর শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুরোধে ও ব্যবস্থাপনায় বেড়োগ্রামে রহিয়া যান। ক্বচিৎ কখনও বল্লভী-বর্দ্ধণ্যপেটায় স্বগ্রাম আচ্চীতে যাইতেন। ঐ স্থানেই তাঁহার ভ্রাতাগণ ও পিতা থাকিতেন ও বর্ত্তমানে বংশধরগণ আছেন।

আচার্য্য গোস্বামী বংশ দক্ষিণের আয়েঙ্গার অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শ্রদ্ধাচার ও ভক্তির অদ্যাপি কেন্দ্র বলিয়া জনসমাজে কীর্তিত। তাঁহাদের চরিত্রের সেই মূল বৈশিষ্ট্য-গুলি বেড়োর আচার্য্যগণ বহন করিয়া এইস্থানে পোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এতই শুদ্ধাচারী যে তাঁহাদের গৃহে সাধারণের প্রবেশই নিষিদ্ধ। আচারের মধ্যেই তাঁহাদের বাস। না দেখিলে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিয়মনিষ্ঠা বর্তমান কলিকাতার বা বাংলার সমাজ ধারণায় আনিতে পারিবেন না। তাঁহাদের গুপ্ত আচার বাহিরে যাহাতে প্রকাশ না হইয়া পড়ে এই জন্য ইঁহারা সমাজের অন্যদের এড়াইয়াই চলেন। শুচি ইঁহাদের সম্পদবিশেষ এবং সনাতন ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মিশ্রভাবাপন্ন পরিবেশের কাল ও হাওয়ায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামী। গোবিন্দের জন্মক্ষণ হইতেই লক্ষ্মীর কৃপা এ সংসারে বর্ষিত হইল। তাঁহাব ছয় মাস বয়সেই নিজেই অন্নপ্রাসন করিলেন। হামাগুড়ি দিয়া সকলের অলক্ষ্যে কখন নিজেই কণ্ব মুণির ন্যায় অন্নের থালা হইতে অন্ন মুখে তুলিয়া লইয়াছিলেন

শ্রীরাঘব আচার্য্য গোস্বামী ও সীতা দেবীর আট পুত্র তিন কন্যা। নৃসিংহ, কেশব, শ্রীকান্ত, রামগোবিন্দ, কৃষ্ণ, গোপাল, হরি ও নারায়ণ এবং কনকচম্পা, রঙ্গনায়িকী ও নার্ষা। শ্রীগোপাল আচার্য্য ও রঙ্গনায়িকী আম্মা এখনও বর্তমান। রঙ্গনায়কী আম্মা রামগোবিন্দ হইতে দুই বৎসর বড় ও গোপাল আট বৎসর ছোট।

আট মাস বয়সেই মহাপ্রভু হাঁটিতে শেখেন। বয়স যখন তাঁহার এক, তখন থেকেই পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে দিন যাপন। সকলেরই স্নেহের পাত্র গোবিন্দ। উপদ্রবে অস্থির অনেকেই, ফলে বকাবকি মারপিঠ কিছুই বাদ যায়না। আবার ক্ষণিক অদর্শনেই সকলে আকুল পাগল। মাত্র চার বৎসব বয়সে পিতা তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন কিন্তু লেখাপড়ায় আগ্রহ বিশেষ নাই। পণ্ডিত মহাশয়কে তিনি বলেন "তুমি আমায় কি শেখাবে, সবই আমার জানা"। পণ্ডিত মহাশয় রাগিয়া যান, তিরস্কার করেন, কিন্তু বৃথা। ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন—১৫ বৎসরে বিবাহ। বিবাহের পরই তিনি অত্যুগ্র বিষ পান করেন। চব্বিশ ঘণ্টা নিদারুণ যন্ত্রনা ভোগ করেন, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। ডাক্তার কবিরাজগণের অভিমত এ বিষে মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। পরমপুরুষের শক্তি ছাড়া এ আর কিছুই নয়। যখন আচার্য্যদেবের বয়স ১৮ তখন তিনি পিতার সঙ্গে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যান। এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রথমা পত্নী রঙ্গনায়কী আম্মা ইহলোক ত্যাগ করেন। বিবাহের তুই তিন বৎসরের মধ্যে পিত্রালয়ে থাকিবার সময় মাত্র এগারো বৎসর বয়সে হঠাৎ তুই দিনের জ্বরে তিনি মারা যান। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় মাতা সীতা দেবী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে থাকেন। পিতা রাঘবাচার্য্য গোস্বামী শেষ বয়সে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন। এই ভ্রমণকালে হায়দ্রাবাদে বল্লভীতে পিতৃভূমিতে পত্নী এবং পুত্রদের কোলে রাঘবাচার্য্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহাপ্রভু গোবিন্দের বয়স যখন তেইশ চব্বিশ বৎসর তখন তিনি মাতৃআদেশে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।

শ্রীশ্রীপ্রাণের ঠাকুর মাতৃআদেশে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন বটে, তবে সংসার তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। তিনি পূর্ব্বাপরের ন্যায় বাহিরে বাহিরে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। কোথাও বা হরিনামের দল খুলিয়া, কোথাও বা নিজে কীর্তন করিয়া নাচিয়া, কাঁদিয়া অপরকে নাচাইয়া, কাঁদাইয়া গ্রামকে গ্রাম প্রেমের বন্যায় বহাইয়া দিতেন। আবার মায়ের কথা মনে পড়িলে যতদূরেই থাকুন না কেন একছুটে বাড়ি আসিয়া "মা-মা" বলিয়া মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িতেন। খালি হাতে বাড়ি ফিরিতেন না। যখনই আসিতেন শিষ্যভক্ত বাড়ি হইতে চাউল, ডাল, তৈল, ঘি, নারিকেল, গুড়, আনাজ তরিতরকারি লইয়া হয়ত গরুর গাড়ি করিয়া হাজির হইলেন। চতুর গোবিন্দ গৃহের মা, ভাই, ভগিনীদের বুঝিতেই দিতেন না যে তিনি মহাসাধনায় ব্যাপৃত, মহাযোগে কাল কাটাইতেছেন,—'যোগে যাগে জেগে আছেন মহাযোগী'। তাঁহার সদা হাস্যময় আনন ও চঞ্চল ব্যবহার দেখিলে কাহারও সাধ্য ছিল না উনি কি অবস্থায় রহিয়াছেন। দুই এক রাত বাড়িতে থাকিয়া প্রাণপণ মায়ের সেবা করিয়া মায়ের প্রাণ ঠাণ্ডা করিয়া আবার পালাইয়া যাইতেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে, দেশে বিদেশে কৃষ্ণ নামের প্রচার এবং বাড়ি বাড়ি চাল, ডাল ভিক্ষা করিয়া নিজহস্তে রন্ধন করিয়া হাজারে হাজারে জীবের সেবা করিতেন। বলিতেন, "শুধু নাম করিলে চলিবে না। দমসে খাও আর দমসে নাম করো।" তাঁহার জীবনে একটি গুণ সকলে লক্ষ্য করিতেন যে, তাঁহার জীবনে অলসতা কখনও স্থান পায় নাই। এক এক সময় এক এক জায়গায় নবরাত্রি অর্থাৎ নয় দিন নয় রাত ধরিয়া কীর্তন হইতেছে, সকলে মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, ইতি উতি পলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু ঠাকুর আমার নিরলস নিত্য নূতন ভাবে চালাইয়া যাইতেছেন।

শ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামী মানুষের রোগ, শোক দেখিতে পারিতেন না। কাহারও কোনরূপ অসুখ করিলে তাহাকে কি করিয়া সত্বর আরোগ্য করা যায় সেই চিন্তা করিতেন এবং প্রাণপণ কৃষ্ণনাম শুনাইতেন। শ্রীমুখে শোনা যে, জীবের এই

রোগমুক্তির জন্য একগলা মাটি খুঁড়িয়া এক বৎসর হনুমানমন্ত্র জপ করিয়া হনুমানমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন এইরূপে গুপ্তসাধনা, যাগযজ্ঞে ও কীর্ত্তনে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর নাম বিলাইতেছেন, একদিন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে গৃহে পাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে গোবিন্দ, তুই কি দিনের পর দিন শীত নেই, বর্ষা নেই, গ্রীষ্ম নেই, এইভাবে নাচিয়া কাঁদিয়া বেড়াইবি? তবে তোর বিবাহ দিলাম কিসের জন্য? আমি একটি নাতি নাতনীর মুখ দেখিতে পাইব না?" ঠাকুরের চমক ভাঙ্গিল। একি বজ্রপাত! একি মায়ের আদেশ! ভাবিলেন আমি ত এজন্যে জগতে আসি নাই, আমি যে জীবকে নামের তরী দিয়া তরাইতে, দেহব্যাধি মোচন করিয়া নামৌষধি বিতরণ করিতে আসিয়াছি। কিরূপে রোগ শোক হইতে জীবকে উদ্ধার করা যায়, সেই ভাবেই আমি বিভোর হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু একি মায়ের আদেশ! এইরূপে চিন্তা করিয়া পুরুষোত্তম মাতৃআদেশ শিরোধার্য করিয়া কয় দিবস গৃহবাসী হইলেন।



দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ন্যাস ও পরিব্রজ্যা

শ্রীরামগোবিন্দের যখন ২৯ বৎসর বয়স, শৃঙ্গারী মাতার যখন ১৭।১৮ বৎসর, আচার্য্যগৃহে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দ যেন ঐক্ষণটির জন্য অপেক্ষামান ছিলেন। সালটি হইবে ১৯২৪।২৫ (সন ১৩৩১।৩২)। কাণে শুনিবামাত্র জ্যামুক্ত তীরের ন্যায় ছুটিলেন মাতৃসন্ধানে। এই সময় তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সীতা দেবী খুরদা রোডে সেজো ছেলে কৃষ্ণআচার্য্যের কোয়ার্টারে ছিলেন। বেড়োতে স্বগ্রামে জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ ও অন্যান্য সকলে ছিলেন।

খুরদা রোডে সেজো ভাইয়ের কোয়ার্টারে গিয়া "মা মা" করিয়া মাতৃ-চরণে আছড়াইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিলেন "মা, আমি তোমার কথা রাখিয়াছি, এবার তুমি আমায় বিদায় দাও। প্রাণভরে আশীর্বাদ কর মা, যেন জগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। আর দেরী সহ্য হয় না তুমি আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও", প্রভৃতি বলিয়া চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার নিকট আর্থিক কিছু আশা করিও না মা। আমি তোমায় আর্থিক সাহায্য কিছু করিতে পারিব না। তবে যদি নারায়ণদর্শন করিতে চাও, তাহা এই দীনহীন সন্তান দ্বারা সম্ভব হইবে। মৃত্যুকালে তোমার শয্যাপার্শ্বে আমায় পাইবে না বটে, তবে তোমার মুখে অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়—স্ফুরিত হইবে এবং নারায়ণদর্শন করিতে করিতে তাঁহার চরণে লীন হইয়া যাইবে।" পুত্রের আকুতি মিনতি দেখিয়া এবং অন্তিমকালে নারায়ণ-দর্শন পাইবেন জানিয়া জননী সন্ন্যাসের আদেশ দিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, আমার জীবদ্দশায় মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়া যাস্ বাবা, নইলে আমি বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।"

গোবিন্দ তাঁহার কথা রাখিয়াছিলেন। বেড়ো গ্রামে অদ্যাপি সীতা আম্মার মধুর স্বভাবের জন্য গ্রামবাসীগণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং সাক্ষীগণ তাঁহার দেহত্যাগের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করেন। সীতাম্মা সুস্থ শরীরে সকলের খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রি ৯টার সময় গ্রামের বালক বালিকাগণকে ডাকিয়া কীর্ত্তন করিতে বলিয়া নিজে নারায়ণের স্মরণ করিয়া উচ্চৈস্বরে নারায়ণকে ডাকিতে ডাকিতে রাত্রি দশ ঘটিকায় তাঁহাতে লীন হইয়া যান। ৩০শে আষাঢ় ১৩৫১। (১৪।৭।১৯৪৪)।

মাতৃ আদেশ পাইবামাত্র শ্রীরামগোবিন্দ ছুটিলেন দক্ষিণ ভারতেরদিকে। প্রথমে গিয়াছিলেন পিতৃভূমি—হায়দরাবাদে। সেখানে অন্তরে অন্তরে ৺পিতৃদেবকে এবং অন্যান্য পরলোকগত গুরুজনপদে প্রণাম জানাইয়া ছুটিলেন আরও দক্ষিণদিকে। স্বপ্নে শ্রীমন্‌নারায়ণের আদেশে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিন দিন তিন রাত ধরিয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর চরণে সন্ন্যাস-গুরুর জন্য আছাড় পাছাড় খাইতে থাকেন। শ্রীমুখের কথা, ঐ সময় তাঁহার কপাল ফাটিয়া রক্তপাত হইয়াছিল। তিন দিন তিন রাত পর একদিন ভোর তিনটার সময় শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজী স্বয়ং এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর রূপে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যান।

শ্রীরঙ্গম মন্দির বিরাট সাতটি গ্রাম লইয়া প্রতিষ্ঠিত। সপ্তগ্রাম পার হইয়া বৈকুণ্ঠনাথ আদিরূপে শেষশায়ী শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মণিখচিত শ্রীবিগ্রহ বিদ্যমান। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহাই হইল প্রধান কেন্দ্র। ইহাকে দক্ষিণের শ্রীবৃন্দাবন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতবর্ষে বৈষ্ণবসমাজ ও সম্প্রদায় সনাতন ধর্মের রক্ষক হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। সনাতন ধর্মের আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এই জন্য যেহেতু উহাই সৃষ্টির ধর্ম শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত। সেই বৈষ্ণবসমাজের প্রথম সৃষ্ট সম্প্রদায় হইল শ্রীসম্প্রদায়। শ্রী-ই হইল বৈষ্ণবী। ভারতীয়গণ বিষ্ণুর পুত্র মা

হইলেন তাহাদের জগজ্জননী মহালক্ষ্মী। প্রজাপতি ব্রহ্মার ঔরসে মনু এবং মনু হইতে মানব-সমাজ ও মানব সভ্যতা।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর তিন মূর্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীদেবী, ভূদেবী ও নীলাদেবী। শ্রীদেবী জগজ্জননীর প্রথম রূপ। ইনি "বিষ্ণুবক্ষস্থলস্থিতাম্ শ্রীবিষ্ণুহৃদকমলবাসিনী"। ভূদেবী ইহার দ্বিতীয় রূপ। শ্রীমন্নারায়ণের দৃষ্টিরূপ বিলাসক্ষেত্র। নীলাদেবী ইহার তৃতীয় রূপ।

"শ্রীভূর্নীলাদিসহিত ওঁ নমোনারায়ণস্বামি পরমব্রহ্মণে নমঃ।"

শ্রীরঙ্গম হইল সেই পুণ্যপীঠ যেই স্থানে অনাদিকাল হইতে—যখন বাহিরের শত্রুগণ অন্ধকারের অজ্ঞানগর্ভে নিমজ্জিত ছিল—শ্রীশ্রীমহাবিষ্ণুর অনুপম মূর্ত্তি সুশোভিত এবং ভক্তি ও সদাচারে সুপূজিত হন। অনন্তনাগশয্যায় চতুর্ভুজনারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লইয়া যোগনিদ্রায় শায়িত। শ্রীচরণে জগজ্জননী মহালক্ষ্মী সেবারতা ও নাভিদেশ হইতে উত্থিত কমলাসনে চতুর্মুখ প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্বেদের স্তবগানরত। ইহাই হইল বৈষ্ণব সমাজের আদি পূজিত রূপ ও মূর্ত্তি। ইহা নিত্যলীলার স্থল। ইহা প্রতি সনাতন হিন্দুর অবশ্য গন্তব্য পুণ্যতমতীর্থ। এই স্থলের লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি শ্রীরঙ্গনাথ নামে ত্রিলোকে অদ্যাপি পূজিত। শ্রীরঙ্গনাথজীর স্থলের নাম শ্রীরঙ্গম্ বলিয়া কীর্ত্তিত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, সিন্ধু, নর্মদা ও কাবেরী—সপ্তম নদী কাবেরী পার হইলে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর দর্শন মিলে। সপ্তলোকের, সপ্তনদীর, সপ্তসুরের, মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত যোগীর সপ্তরঙ্গভূমি অতিক্রম করিলে তবেই নারায়ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শনলাভ হয় এই অর্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া সপ্তগ্রাম সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতিটি গ্রামের প্রবেশদ্বার বিশাল গো-পুরম্ দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত। দূর হইতে সাতটি গো-পুরম্ অতিমনোহর দেখায়। সাতটি দরজা পার হইলে তবেই মূলমন্দির ও মূল মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। তবেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের দর্শন মিলে।

মন্দিরের পিছনে কাবেরী নদী হইতে প্রত্যহ ভোরে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর স্নানের জন্য হস্তির পিঠে রূপার ঘড়ায় জল আসে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কলিযুগের অবতার শ্রীশ্রীরাম গোবিন্দকে কাবেরী নদীতটে লইয়া গিয়া মস্তকমুণ্ডন করাইলেন। স্নানান্তে গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং তিনি তাঁহার গুরুর সহিত শ্রীরামানুজ আচার্য্যের মন্দিরে আসিলেন। স্বয়ং মহাবিষ্ণু আমাদের পরমপ্রিয় ঠাকুরকে শ্রীশ্রীরামানুজ আচার্য্যের আদি মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডকমণ্ডলু দিয়া সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। রামগোবিন্দ হইলেন শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ। সেইদিনও ছিল পৌষ-সংক্রান্তি, বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথি। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীরও ঐ দিবস আবির্ভাবদিবসরূপে পালিত হয় ও মহা উৎসব হয়।

শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে শ্রীশ্রীরামানুজ আচার্য্যের একটি পৃথক মন্দির আছে। ঐ পৃথক মন্দিরে প্রস্তরনির্মিত শ্রীশ্রীরামানুজ আচার্য্যের দুইটি মূর্ত্তিতে দুইটি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেহ দর্শনার্থী মন্দিরে যাইলে শ্রীশ্রীরামানুজের উপরের মূর্ত্তি দেখিয়া আসেন। যাঁহারা জানেন তাঁহারা পূজারীকে অনুরোধ করিলে তিনি শ্রীশ্রীরামানুজের আসল মূর্ত্তিটির দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'আসল' এই জন্য বলিলাম যে শ্রীশ্রীরামানুজ আচার্য্য দেহাবসানের পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করাইয়া উহার সম্মুখে নিজে উপবেশন করিয়া উহাতে স্ব-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি নিজে প্রস্তর হইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামানুজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিটির দর্শনলাভ বহু পুণ্যের ফলে সম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথি পৌষ সংক্রান্তির দিন দুইবার আসিয়াছিল। তাঁহার জন্ম বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথিতে। সেদিনটিও পৌষ সংক্রান্তি ছিল। যেদিন পুনর্জ্জন্ম অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবিষ্ট হন সেইদিনটিও ছিল বৈকুণ্ঠ একাদশী, পৌষ সংক্রান্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমার গৈরিকবসন পরিয়া দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের চরণে প্রণতি জানাইয়া নিজ তৃতীয় আচার্য্য সন্ন্যাসী গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া জগতের তথা জীবের মঙ্গলার্থ শ্রীমন্নারায়ণেব সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বংশগুরু এক মাতৃশক্তি। শ্রীশ্রীশেষলক্ষ্মি আম্মা। বংশের দুইটি দীক্ষামন্ত্র যেমন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ"—ইহা গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন এবং "ক্লীংকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় নমঃ—" ইহা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপনয়নের সময় প্রথম বয়সে প্রথম দীক্ষা। ঠাকুর বলিতেন, "আমার পিতাই আমার দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, জীবনের সর্বস্ব ধন।" এই বংশের প্রতি পুরুষানুক্রমে কেহ না কেহ কিছু দিনের জন্য বাড়ীর বাহির হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা শ্রীরাঘবাচার্য্য এক সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কোন এক পাহাড়ে পিতা রাঘবাচার্য্য যখন তাঁহার সন্ন্যাসগুরুর সহিত তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন ধ্যানভঙ্গ করিয়া সেই সন্ন্যাসীগুরু বলিয়া উঠিলেন, "রাঘব, তোমার এ পথ নয়। সংসার তোমায় করিতেই হইবে। স্বয়ং ভগবান তোমার গৃহে আসিতেছেন, তুমি শীঘ্র যাও। যাইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যা সীতাম্মাকে বিবাহ করিবে। তোমার ঔরসে সীতা আম্মার গর্ভে আটটি পুত্রসন্তান ও তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। তোমার যে তৃতীয় পুত্র জন্মাইবে তাহার নাম রামগোবিন্দ রাখিবে। তাহারই ভিতর তুমি একাধারে রাম ও গোবিন্দ শ্রীমন্নারায়ণের রূপ দেখিতে পাইবে। তোমার যাহা কিছু শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত উজাড় করিয়া উহাকে শিখাইবে এবং সব সময় নজর রাখিবে। তোমার কাছছাড়া করিও না। যাও, শীঘ্র যাও, আমার আদেশ পালন কর।" সেই জন্য পিতা রাঘবাচার্য্য শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার পূর্বপর্যন্ত তৃতীয় পুত্রকে সঙ্গছাড়া করেন নাই এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার জীবনে সর্বাধিক শ্রদ্ধা

করিতেন তাঁহার পিতা শ্রীরাঘব আচার্য্যকে।

শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীকে বারবার প্রণিপাত করিতে করিতে পরিব্রজ্যায় বাহির হইলেন। "কোথায় শ্রীমন্নারায়ণ, কোথায় আমার প্রাণগোবিন্দ, একবার দেখা দাও, দেখা দাও", এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে এদেশ, ওদেশ করিয়া শেষে হিমালয়ের প্রান্তে। অনন্ত-সৃষ্টির মাঝে তাঁহার সাধনার ধন, সর্বজীবে নারায়ণদর্শন এই প্রেমে বিভোর হইয়া দিন রাত সপ্তাহ, মাস, বর্ষ এক করিয়া ফেলিলেন। শ্রীমুখের কথা হিমালয়ের পাদদেশে এক জ্যোতি দর্শন করিয়া আদিষ্ট হইয়া সেইখানকারই এক পাহাড়ে সাধনায় আসীন হন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বরফ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সাপ প্রভৃতি কোন কিছুরই জ্ঞান ছিল না। পিতৃলব্ধ ধনে ধনী হইয়া তিনি স্থির হইয়া বসিবামাত্র সাধনার অনন্তভাণ্ডার তাঁহার নিকট আপনা হইতে খুলিয়া গেল। যিনিই অধিকারী তাঁহারই জন্য বস্তু।

যিনি নিজেই জীবের সাধ্য, নিত্যসিদ্ধ লীলাময়, জগতের ইষ্ট তাঁহার আবার সাধনা কিসের ? লোকশিক্ষার জন্য পথভোলা মানবসমাজকে মানবোচিত পথে লইয়া যাইবার জন্য বারংবার জগদীশ্বর স্বয়ং মর্ত্তে আগমন করিয়া হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহার রঙ্গভূমি সমাধিক্ষেত্র হইতে অবতরণ করিয়া সমতল ভূমি মানবরাজ্যে পুনরায় অবতীর্ণ হইলেন। আনন্দময় অবতার অবতীর্ণ হইলেন নিরানন্দময়-ব্যাধি-জরা-দুঃখময় মানবসংসারে, মানুষের ঘরে ঘরে উহাকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে। গোবিন্দের আগমনেই বা তাঁহার দর্শনেই নিরানন্দ, জরা, ব্যাধি পলাইয়া বাঁচিত। দুঃখের ও নিরানন্দের সেইস্থানে মুহুর্ত্তকাল তিষ্ঠাইতে স্পর্দ্ধা হইত না।

এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া রামগোবিন্দ যখন হিমালয় হইতে সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন মর্ত্ত্যবাসী আনন্দে পুলকিত

হইতে লাগিল। পথে পথে, স্থানে স্থানে পুরাতন পরিচিতগণ মুখরিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-উলুধ্বনি, কীর্ত্তন হইতে লাগিল। আবাহন গীতি গাহিয়া, পূজা, আরতি করিয়া ভগীরথ-সদৃশ অমৃতবহনকারী অমৃতময় রামগোবিন্দকে হিমাচল হইতে বাংলা পর্য্যন্ত মানবকুল বরণ করিয়া লইলেন। কোথাও গীত-গোবিন্দ, কোথাও নারায়ণস্বামী, কোথাও গোবিন্দ, কোথাও রাম-গোবিন্দরূপে প্রচারিত সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। "আমার ধ্যানে, জ্ঞানে, মনে, প্রাণে ছিল জীবসেবা,—কিরূপে এই কলিহত জীবকে উদ্ধার করা যায়। আতুর, অন্ধ, খঞ্জদের কিভাবে তাঁহার শ্রীচরণে টানিয়া লইয়া যাওয়া যায়। আজ আমি যেমন তোমার ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রতি কথায়, কাজে, উঠিতে বসিতে তোমার সঙ্গ করিতেছি, এইরূপে এই কলিহত জীব কবে তোমায় বুঝিতে পারিবে, চিনিতে পারিবে, জনমে জনমে তোমার একান্ত অনুগত হইয়া থাকিবে। কলিহত জীব তরাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাবিষ্ণুর আজ্ঞা লইয়া সনাতন চাতুর্বর্ণ ধর্মের গুণ ও কর্ম পুনরুদ্ধারণার্থ পাহাড় হইতে নামি।"

কলিহত জীবকে, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন সনাতন ভারতীয়ের বংশোদ্ভূত-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং নারায়ণ কলিযুগে কলিজীবের সাধ্য অনুযায়ী সাধারণভাবে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের সহিত সখ্যলীলা করিয়া তাহাদের আকর্ষণ করেন। পরম দয়াল সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণায় পাপী-তাপী মানবকুল বার বার দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার পান। লীলাময় হরি তাই আসিয়াছেন কলিযুগের কলিকাতাপুরী। শ্রীশ্রীঠাকুর রামগোবিন্দ যেন তাঁহার লীলার জন্য সদাই প্রস্তুত। তাঁহার অধিকারেই সদা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকিত। ভগবানই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই পরম-পুরুষ—পুরুষোত্তম। ত্রিকালজ্ঞ পুরুষোত্তম যখন অরূপ হইতে রূপপরিগ্রহ করেন তখনই তিনি দেখা দেন মৎস্য, বরাহ, কূর্ম,

নরসিংহ, বামন, ভৃগুরাম, সীতাবল্লভ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামগোবিন্দ রূপে।

যুগে যুগে লীলাধর কতবার কতরূপেই আবির্ভূত হইতেছেন। কিন্তু মানবসমাজে এমন আনন্দঘনরূপে, বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে সন্দেহ বিজ্ঞান-জর্জরিত মানবসভ্যতায় বিস্ময়সৃষ্টিকারী গোলকবিহারী যে রামগোবিন্দরূপে এইবার ভক্ত-অভক্তের দ্বারে দ্বারে, সময়ে অসময়ে নাম-ভিক্ষা করিয়া, রোগযন্ত্রণা দূর করিয়া, নামশ্রবণ করাইয়া, প্রেমের বন্যায় বহাইয়া গিয়াছেন সেই অপরূপমূর্তির জোড়া আর মিলিবে না। পাঠকগণ ভাবিবেন না যে বৈষ্ণবোচিত ভক্তি ও ভাবের আতিশয্যে ইহা লিখিতেছি। ইহা অতি বাস্তব সত্য। তিনি এই নবরূপে এক ডাকে, এক দৃষ্টিতে, এক পরশে বিংশশতাব্দীর অতিবড় সন্দেহাকুল, দেহাত্মবাদীকে, বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক কষাকষিজীবকে, বাস্তববাদীকে উদ্ধার করিয়াছেন। সত্য দর্শন করাইয়াছেন। নারায়ণ দর্শন করাইয়াছেন। করাইয়াছেন কালিদর্শন, ইষ্টদর্শন। তাঁহার প্রদত্ত কীর্ত্তনাবলীতে তিনিই রচনা করিয়াছেন—

"রামকৃষ্ণং রামকৃষ্ণং রামকৃষ্ণং রাম হে।
রামগোবিন্দং রামগোবিন্দং রামগোবিন্দং রাম হে।
কৃষ্ণরাম কৃষ্ণরাম কৃষ্ণরাম কৃষ্ণ হে।

ওঁ নমো রামগোবিন্দায়। ওঁ নমো রামগোবিন্দায় বিদ্মহে, রাঘব সীতাসুতায় ধীমহি, তন্নঃ শৃঙ্গারীরঙ্গনায়কীবল্লভঃ প্রচোদয়াৎ॥

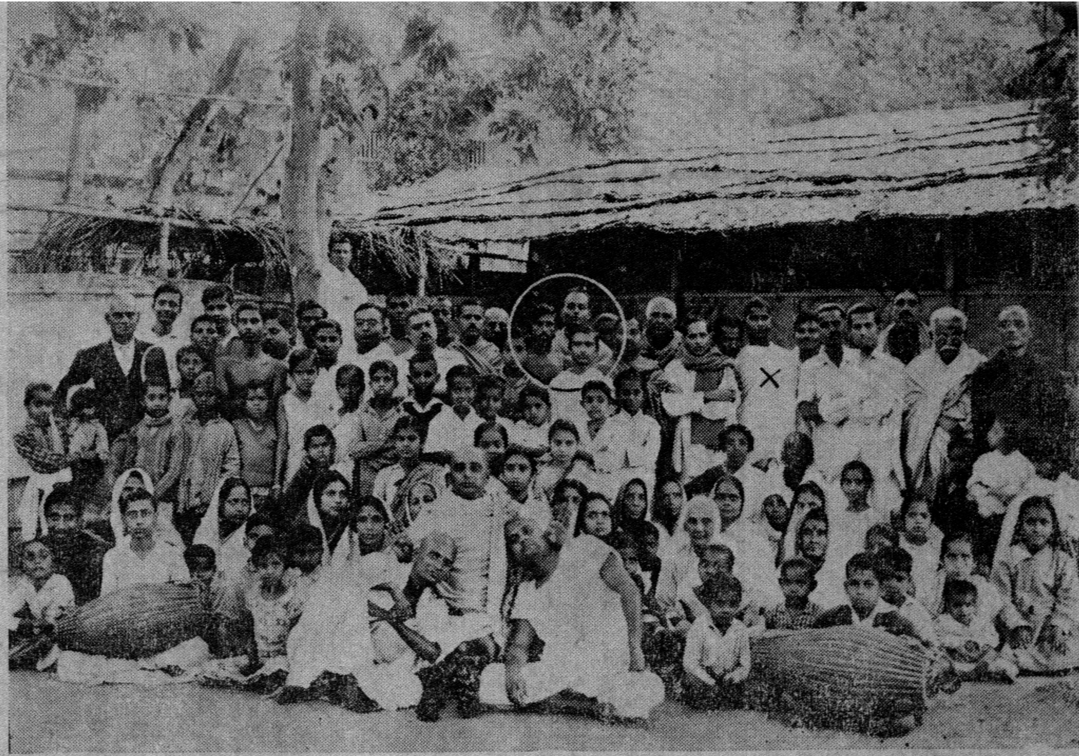
ওঁ নমো রামগোবিন্দায় চরণৌ শরণমহং প্রপদ্যে, শ্রীমতে রাম-গোবিন্দায় নমঃ।"

শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ প্রবর্তিত 'ৎ কীর্ত্তনাবলী' যাহা তাঁহার শিষ্য ভক্তের ভিতর দৈনন্দিন কীর্ত্তিত হয় উহাতে দশাবতার স্তোত্রে তিনি যাহা যোগ করিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃতি রাখিলাম—

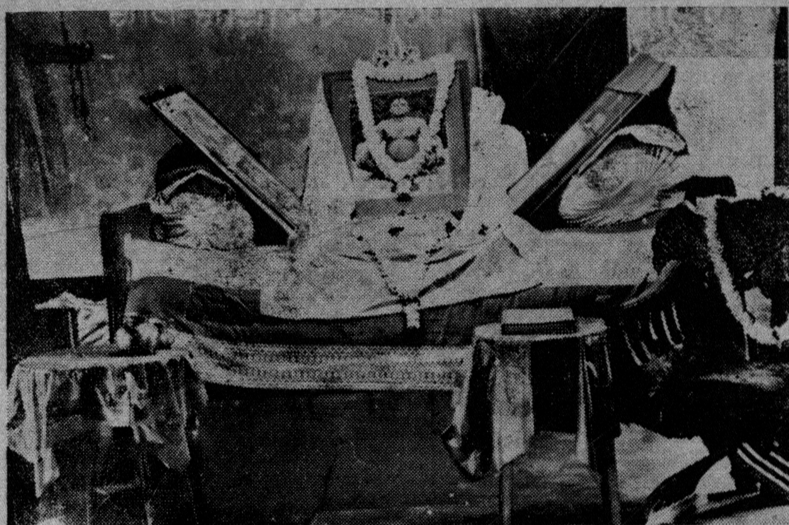
বেদোদ্ধার বিচারমতে সোমকদানব সংহরণে।
মীণাকারঃ শরীরো নমঃ ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥



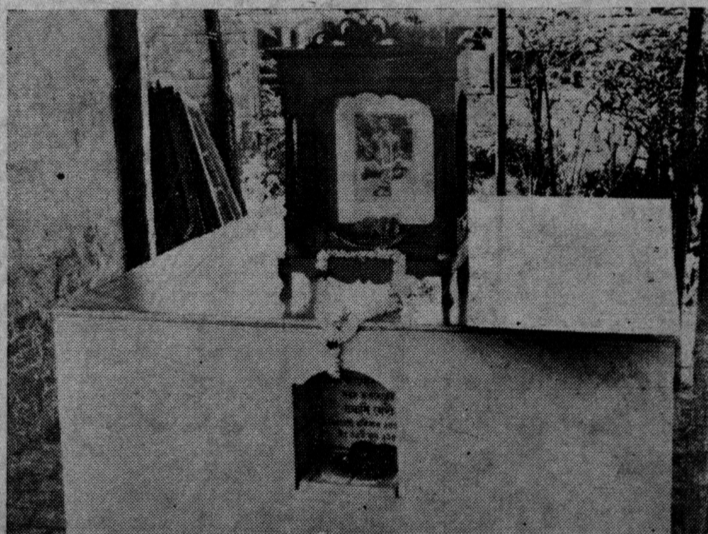
১৯৩২ সালে বালীতে ডানদিক হইতে অরুণদা, শংকরদা, শ্রীশ্রীঠাকুর (জোড়হস্তে), অদ্বৈতদা, দাদু প্রমুখ অন্তরঙ্গভক্ত সনে।



১৯৪৪ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত ভক্তবৃন্দসহ শ্রীশ্রীঠাকুর। ঠাকুরের দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে শীতলদা ও অদ্বৈতদা। পিছনে গোলচিহ্নের মধ্যে অরুণদা, তুলসীদাস ও প্রেমদাস। ক্রশচিহ্নে মাষ্টার (রঘুনাথ)।

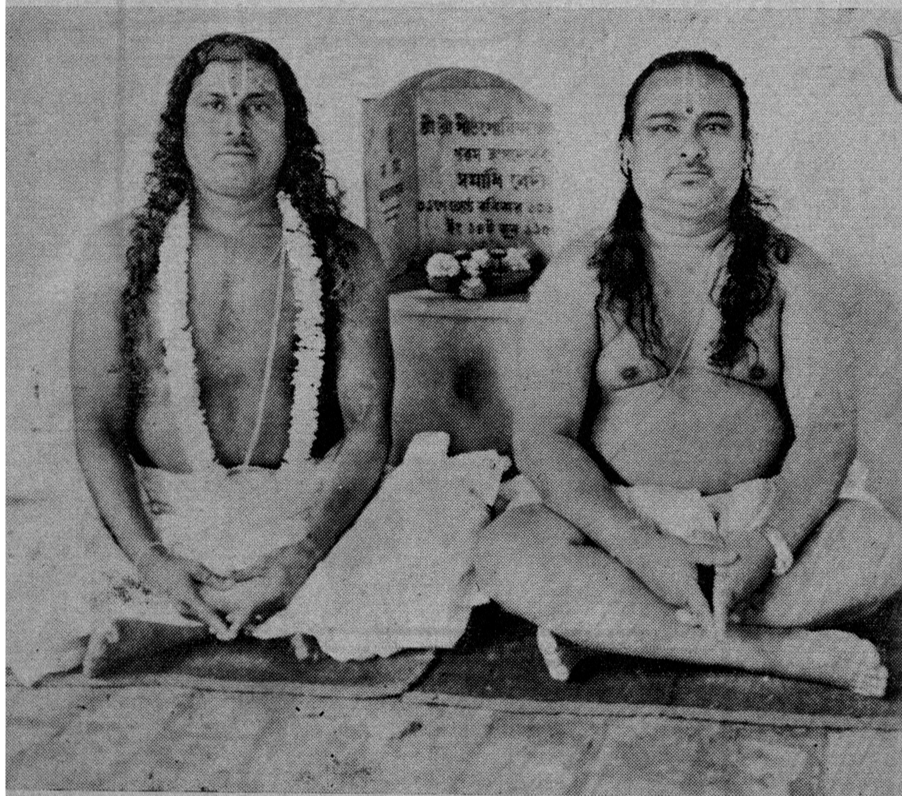


শ্রীশ্রীগুরুনারায়ণের আসন



শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি বেদী

শ্রীগুরুনারায়ণের সমাধিবেদীর সম্মুখে লেখকদ্বয়



ব্রহ্মচারী তুলসীদাস   ব্রহ্মচারী প্রেমদাস

মন্ধানাচলধারণহেতো দৈবাসুরপরিপালয় বিভো।
কূর্মাকারশরীরো নমঃ ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥
ভূচোরকহর পুণ্যমতে ক্রোড়োদ্ধৃতভূদেব হরে।
ক্রোড়াকারশরীরঃ নমঃ, ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥
হিরণ্যকশিপুচ্ছেদনহেতো প্রহ্লাদাভয়দায়কহেতো।
নরসিংহোহচ্যুতরূপো নমঃ, ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥
ভববন্ধনহরবিততমতে পাদোদকবিততাগততে।
বটুপটুবেশমনোজ্ঞে নমঃ, ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥
ক্ষিতিপতি বংশক্ষয়করমূর্ত্তে ক্ষিতিপতিকর্ত্তাহরমূর্ত্তে।
ভৃগুকুলরামঃ পরেশো নমঃ, ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥
সীতাবল্লভদাশরথে দশরথনন্দনলোকগুরো।
রাবণমর্দনরামো নমঃ, ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥
কৃষ্ণানন্তকৃপাজলধে কংসারিকমলেশহরে।
কালীয়মর্দনলোকগুরো, রাধাবল্লভকৃষ্ণনমঃ ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥
স্পৃষ্টজনাবরদুষ্টহর খগতুরগোত্তমবাহন তে।
কল্কিরূপপরেশো নমঃ রামগোবিন্দরূপঃ পরেশো নমঃ ভক্তন্তে পরিপালয় মাম্॥



তৃতীয় অধ্যায়

লোকশিক্ষা, পার্ষদ আকর্ষণ ও বিভূতি

হিমালয় হইতে নামিবার সময় করুণানিধি (নামটি ঠাকুরের মুখে শোনা) বলিয়া এক ভক্ত দণ্ডকমণ্ডলুধারী গেরুয়া পরা ঠাকুরের একখানি ফটো তুলিয়াছিলেন। হৃষিকেশে গঙ্গার ধারে। অনন্তর ঠাকুর আমার সারা ভারত উদ্ধার করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। শুধু কি ঘুরিয়া বেড়াইলেন? নামের ডালি ও প্রেমের পসরা সঙ্গে ছিল। জীবের উদ্ধার লাগি যাঁহার আগমন তিনি কি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন? তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন কাতারে কাতারে লোক মনে করিয়াছে এতদিনে আমরা আমাদের নিজজন পাইলাম; স্বার্থান্ধ জগতে এমন লোক পাইনা যাহার নিকট নিজের ব্যথা জানাইতে পারি। কিন্তু আজ এমন লোক পাইয়াছি যাহার কাছে মনপ্রাণ উজাড় করিয়া দিতে পারি; আহা, এযে আমার বড় আপনজন; এতদিনে যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছি।

এইরূপে সেবা করিতে করিতে ঠাকুর আসিলেন বাংলায় দক্ষিণেশ্বর ঘাটে। সেখানে আসিয়া ঠাকুর আদিষ্ট হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন। এক গরীব ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দুই হাত সাদা কাপড় ভিক্ষা করিয়া লইয়া গৈরিক বসনও ত্যাগ করিলেন। সালটি ১৯২৭ হইবে।

গৈরিক বসনের মর্য্যাদা ও সনাতন ধর্মের নিয়মাবলী সম্বন্ধে শিষ্য-ভক্তদের সচেতন করিবেন বলিয়া এবং "আমি আমার শিষ্য ভক্তদের শ্বেতবস্ত্র পরাইব বলিয়া নিজে শ্বেতবস্ত্র ধরিলাম।"

শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা, হাওড়া, বালি, বর্দ্ধমান, বিহারের ধানবাদ-ঝরিয়া অঞ্চল জুড়িয়া লীলাময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। কেহ তাঁহাকে মাদ্রাজী সাধু, কেহ তাঁহাকে চরণ-দেওয়া সাধু,

কেহ তাঁহাকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ১৯২৭ সালে আহিরীটোলা ও বাগবাজার অঞ্চলে তাঁহার চরণস্পর্শ দিয়া রোগীর রোগ উপশমের অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময় নাগাদ শ্রীশীতলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বালী), শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী (দাদু) শ্রীযতীন মুখোপাধ্যায় (ধানবাদ ও বালী), শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী (মজঃফরপুর ও পাটনা), শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী (বালীব সাধনমা), নিত্যানন্দ বংশের শ্রীগোবর্দ্ধন গোস্বামী (সিমলা পাড়া), বালী চটকলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ সুরেন ঘোষ (শিবপুর) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

আহিরীটোলায় বটতলার পুস্তক ও মুদ্রণ ব্যবসায়ী শ্রীচুনীলাল ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমোহরলাল ভট্টাচার্য সপরিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের গৃহে অন্নপূর্ণা, মহাদেব ও জগদ্ধাত্রী পূজিত হইতেন। শ্রীমোহরলাল ভট্টাচার্য্য (গুল্টুবাবা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে অষ্টধাতুনির্মিত অনিন্দ্য-কান্তি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিটি দান করেন এবং জগন্মাতা তদবধি আশ্রমে পূজিত হইতেছেন।

আহিরীটোলায় লীলাখেলার সময় শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে দেখা। তিনি তখনকার দিনে আহিরীটোলার নামকরা শক্তি-শালী ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত ও শক্তিশালী কুস্তিগীর বলিয়া জানিত।

শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলীর গৃহে ঠাকুর তাঁহাকে আপনার বস্ত্র দিয়া 'অদ্বৈত' নামকরণ করিলেন। তাঁহার কলিকাতায় অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ী খাটিত এবং প্রচুর আয় ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আকর্ষণে ঐ সকল তুচ্ছ করিয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়া কাছা ত্যাগ করিয়া ধনীর তুলাল ঠাকুরের পথে উদ্বুদ্ধ হইলেন।

১৯৩০-৩১ সালে ঠাকুর পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইলেন হাওড়ার বালিগ্রামে। কয় বৎসর আগে দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভাবের সময়েই উত্তরপাড়া ও বালির ধর্মপ্রাণ লোকেরা খবর পাইয়াছিলেন যে পঞ্চবটীতে এক অপরূপ সাধু আসিয়াছে যিনি গঙ্গায় দিনরাত ভাসিতেছেন ও যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন অলৌকিক লীলা ও বিভূতি ফুটিয়া উঠিতেছে ও যিনি চরণস্পর্শে রোগীর সকল জ্বালাযন্ত্রণা সারাইয়া দিতেছেন। সেই সাধুকেই বালির ফুটকড়াই চক্রবর্তী পাড়ায় যতীন মুখুজ্যের বাড়ি দেখা গিয়াছে। যতীনবাবু তখন ধানবাদে এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর কয়লাখনিতে কাজ করিতেন এবং সেইস্থানে গীতগোবিন্দের সহিত প্রেমের বাঁধনে ধরা পড়িয়াছিলেন।

এই যতীনবাবুর বাটীতে বালিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সহিত পরিচয়। অরুণদাদা কোন এক বন্ধুর কথায় সাধু দর্শনে আসিয়াই ধরা দিলেন। শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ম্যাকিনান ম্যাকেঞ্জীর চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া তখন বসিয়া আছেন। কখনও কখনও ভাইদিগের দোকানে বাহির হইতেছেন এবং সেই দোকানেই অপরূপ মধুরহাসি মাখানো এই সাধুর কথা শুনিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই হাসিয়া উঠিলেন, "তুমি এসেছ অরুণদাদা? তোমার জন্য কতদূর হইতে আমি আসিতেছি বল ত?" তুমি ত এখান হইতে আসিতেছ আর আমি কতদূব হইতে আসিতেছি বলত?" তাঁহার এই মধুর বাণী এবং প্রাণমাতানো জগৎভোলা প্রেমময় সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়া কোন এক অজানার টানে ধরা দিলেন ভবানীপুরের পদ্মপুকুরনিবাসী শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। বয়সে ঠাকুরের চেয়ে দুই-তিন বৎসরের বড়ই হইবেন। বয়স চল্লিস হইবে। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী।

পূর্ণভক্ত গীতগোবিন্দের অপরিচিতের নাম ধরিয়া কথা বলার এক অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতা আমরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতাম।

বালীতে থাকাকালীন দুইতিন বৎসর প্রত্যহ ভোরে কুস্তি না

লড়িয়া, গঙ্গাস্নান না করিয়া কিছু গ্রহণ বা কথা পর্যন্ত বলিতেন না। ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়িবার জন্য বহু বড় বড় কুস্তিগীর আসিয়াছে। একবার নাটোরে গামা পালোয়ানের সহিত কুস্তি লড়িয়া তাঁহাকে হারাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদও করিয়াছেন "তোর কুস্তিতে খুব নাম হইবে।"

তাঁহার অদ্ভুত কুস্তির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঠাকুরের চেহারা ছিল খুব রোগা। খাওয়া ছিল দুটি নিমপাতা ভাজা, দুটি চিনাবাদাম ভাজা আর একটু বেশী করিয়া অর্থাৎ সারা দিনেরাতে পাঁচ সাত গ্লাস চা পান। ঐ দুটি নিমপাতা ভাজা ও দুটি চিনাবাদামের যে কি শক্তি, তাহা ধারণায় আনিতে পারা শক্ত। সেই রোগা শরীরে যেন বজ্রের বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত। যাঁহারাই সেই সময় সঙ্গ করিয়াছেন প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেন যে সেই রোগা শরীরের ভিতর এক বজ্রশক্তি বাঁধা থাকিত এবং মুহূর্ত্তেই উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত ও উপছাইয়া পড়িত। একাধারে দৈহিক শক্তির তুফান, নাম-কীর্ত্তন প্রেমের তুফান ও আতুরের রোগমুক্তির তুফান—এ তিন তুফানের ধ্বজা উড়াইয়া যাইতেছেন। যে কেহ ঐ ধ্বজার তলে আসিয়া পড়িতেছে সেই নিজেকে হারাইয়া ধন্য মনে করিতেছে।

ঠাকুর আমার প্রতি সোমবার মৌন হইতেন। কখনও ২৪ ঘণ্টা মৌন থাকিতেন, কখনও ১২ ঘণ্টা মৌন থাকিতেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত সংকীর্ত্তন করিতেন। মৌনের দিনে তিনি কোথাও বাহির হইতেন না। যেখানে রবিবার রাত্রে থাকিতেন সোমবার রাত্রেও সেখানে থাকিতেন। তিনি অবশ্য বরাবরই প্রায় রাত্রেই ভক্তমণ্ডলীর বাড়ী বাড়ী যাওয়া আসা করিতেন। ভক্তগণ অনেক সময় তাঁহাকে 'রাতের চর' বলিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে আবাহন করিয়া রাত্রে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুইতেন, যদি আজ রাত্রে গোবিন্দ আসে।

১৯২৯ সাল নাগাদ যতীনবাবুর বাটীতে বাস করিবার সময় আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ পরমহংসদেব শ্রীশীতলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আকর্ষণ করেন। তখন শীতলদা বালীর গাঙ্গুলীপাড়ায় স্ব-বাটীতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ঠাকুর প্রিয়ভক্তের টানে রোগীর বাটী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সারাইয়া তুলিলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় ঐ সময় হইতে গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গী হইলেন। উনি বর্ত্তমানে আশ্রমে বাস করিতেছেন এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় 'শীতলদা' নামে পরিচিত। শীতলানন্দজীর বাটীতে শ্রীগোবিন্দ "মা, মা" বলিয়া আবির্ভূত হন। তাঁহার "মা" ডাকটি ছিল অতীব মধুর। একটীবার যাঁহাকেই ঐ নামে ডাকিয়াছেন তাঁহাকে বাৎসল্য অপত্যস্নেহে আত্মহারা করিয়া দিয়াছেন। তিনিই ভাবিয়াছেন যে কতদিন বাদে তিনি যেন তাঁহার নিজজনকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করিয়া ঠাকুর শীতলদাকে রোগমুক্ত করিলেন। শীতলদার হাতে অঙ্কিত ছবি অতীব সুন্দর হইত বলিয়া শীতলদাকে ঠাকুরের ছবি আঁকিয়া ভক্ত-শিষ্যের মধ্যে উহা বিতরণ করিবার আদেশ দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বালি পঞ্চাননতলার শ্রীশম্ভুপ্রসাদ ঘোষালকে চরণে টানিয়া লন। বালি গঙ্গার ঘাটে শিবমন্দিরের পার্শ্বে একদিন শম্ভুবাবু ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় গঙ্গার ঘাটে এক সাধু গান করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেই সেই সাধুটি গান থামাইয়া হো-হো করিয়া আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শম্ভুদা, আমি বালিতে তোমার জন্য আসিয়াছি। আমার সঙ্গে চল। 'আমার উপদেশ, ধরেছত ছেড়োনা, মরেছত কেঁদোনা।" শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তের অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াই গান ধরিয়াছিলেন—

"পড়িয়াছি গো মা নিবিড় আঁধারে, আমায় পথ দেখায়ে দাও মা।"

তিনদিন পরে সকালে গঙ্গার ঘাটে সেইস্থানে তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। ভক্তের হৃদয়ে সন্দেহের কথা জানিয়া সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তনে আখরের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, "যা পেয়েছ, চালাইয়া যাও। আগের কাজ হইয়া গিয়াছে।" শম্ভুবাবু ১৮ বৎসর বয়সে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। সেইজন্য অপরিচিত সাধুর দীক্ষা প্রদানে সন্দেহ ও পরীক্ষার মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। অন্তর্যামী গোবিন্দ উহা জানিতে পারিয়া সন্দেহ নিরসন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা সকলকে চমক লাগাইয়া দিত। কেহ কোন প্রশ্ন, সন্দেহ বা ভাব লইয়া আসিলে আগন্তুকের উহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই ভাবগ্রাহী জনার্দন উহাব উত্তর ও রূপ দেখাইয়া বিমোহিত করিয়া ফেলিতেন। ভক্তগণ লুটাইয়া পড়িতেন, প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতেন এবং আনন্দসাগরে ভাসিতেন। সন্দেহকারীকে একেবারে আপন করিয়া জয় করিয়া ফেলিতেন। চণ্ডালও মহাভক্ত হইয়া উঠিত।

আর জুটিয়াছিল সেই সময় দুই পাগল। নাম দুইজনেরই কানাই। 'একেবারে উন্মাদ পাগল। ঠাকুর এই দুই পাগলের সেবা করিতে করিতে নাস্তানাবুদ হইয়া যাইতেন। একবার পাগল দুইটির একটি করিয়াছে কি, প্রাণপণ ছুটিয়া একেবারে আগেকার হাওড়ার কাঠের পুলের নিকট আসিয়া হাজির। ঠাকুরও ছুটিতে ছুটিতে তাহাকে ধরিতে ঐ স্থানে আসিয়া হাজির। ঠাকুরকে দেখিয়া পাগল ঐ উঁচা পুল হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। তারপর দুইজনই সাঁতার কাটিতে কাটিতে বালির ঘাটে আসিয়া উঠিলেন। এইরূপ দিনের পর দিন পাগল দুইটির সেবা করিয়া সারাইয়া তুলিলেন। উভয় পাগলই পরে বিবাহ করিয়া সংসারী হইল। তাহাদের ভিতর শুনিয়াছি একজন বর্ত্তমান এবং অন্যজন মারা গিয়াছেন।

মানুষ যেমন রোগীকে সেবা করে বা ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা, তাহার রোগ আরাম করে—আমাদের ঠাকুরের কিন্তু ছিল রোগ আরোগ্যের বা রোগী সেবার এক অভিনব ও অলৌকিক প্রক্রিয়া। তিনি রোগীকে আরাম করিতেন বা তাহার সেবা করিতেন তাঁহার ধন্বন্তরী চরণ স্পর্শের দ্বারা। রোগীর পেটে, বুকে ও মাথায় তাঁহার চরণ স্পর্শ দিয়া রোগীদেহের রোগগুলি টানিয়া লইয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন, এবং তাঁহার নিজ দেহে আনীত সেই রোগগুলিকে যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মলমূত্রাকারে বাহির করিয়া দিতেন।

এইরূপে ক্লান্তিহীন অবস্থায় দিনের পর দিন তিনি হাজার হাজার রোগী দেখিতেন। 'শ্রী গোবিন্দ আশ্রম' স্থাপিত হইবার পর কোন এক সময় চরণস্পর্শে রোগ নিরাময়ের ইতিবৃত্তের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"আমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া সেবাকুঞ্জের সম্মুখে দিন কয়েক ছিলাম। সেখানে মাঝে মাঝে পরিক্রমায় বাহির হইতাম। পরিক্রমা করিবার সময় 'রাধেকৃষ্ণ' ও 'রাধেগোবিন্দ' নাম লইতাম। একদিন সকালে সেবাকুঞ্জের সামনের বাড়ীর বাহিরের রকে বসিয়া দাঁতন করিতেছি, এমন সময় একটি ৭/৮ বৎসরের মেয়ে এক অন্ধ বুড়িমার হাত ধরিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। মেয়েটি আমাকে দেখাইয়া বুড়িকে বলিল, "রাধে, এই রকে একজন সাধু বসিয়া আছে। তুমি সাধুর নিকট তোমার অন্ধত্ব ঘুচাইবার ঔষধ চাও।" বুড়িটি এই কথায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে এমনভাবে হাতড়াইতে হাতড়াইতে আমার চরণ ধরিয়া ঔষধ মাঙ্গিতে লাগিল। আমি উত্তর করিলাম,—"আমি সাধু ও ফকির, ঔষধ পাইব কোথায়? ডাক্তার দেখাও, তিনি ঔষধ-পত্রাদি দিয়া তোমার চক্ষুরোগ সারাইয়া দিবেন।" ছোট মেয়েটি তখনই বলিয়া উঠিল,—"তোমার কাছেইতো সর্বরোগের এমন কি ভবরোগের ঔষধ রহিয়াছে। কৃপণতা করিতেছ কেন? সকল জীবকে বিলাইয়া

দাও। আর্ত্তত্রান কর। তোমার ঐ ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলে সর্ব রোগের মহৌষধি রহিয়াছে। তুমি ঐ বুড়া আঙ্গুল যার অঙ্গে বুলাইয়া দিবে সে-ই রোগ মুক্ত হইবে। তোমার ঐ আঙ্গুল বুড়ীমার চোখে বুলাইয়া দাও, সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবে।" আমি বলিলাম—"যদি তা-ই হয় তবে নাও, আমার কোন আপত্তি নাই।" ছোট মেয়েটি তৎক্ষণাৎ আমার বুড়া আঙ্গুলটি ধরিয়া বুড়িমার চোখে বুলাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ধত্ব ঘুচিল। আনন্দে আত্মহারা বৃদ্ধা চক্ষুষ্মান হইয়া তখন কৃষ্ণদর্শন করিতে লাগিল এবং সকলকে ডাকিয়া আমার চরণ স্পর্শ করাইতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "সেবাকুঞ্জে কৃষ্ণ আবার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, কে দেখিবি আয় তোরা, কে দেখিবি আয়।" এমন সময় বুড়িমার হঠাৎ সেই ছোট মেয়েটির কথা স্মরণ হওয়ায়, সে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট মেয়েটি তখন কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছে। আর তাকে কোথায় পাওয়া যাইবে! স্বয়ং রাধারানী আসিয়া ভক্তের ভক্তিরস-সিন্ধু উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া যথাস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। সেই দিন হইতে সেবাকুঞ্জে কাতারে কাতারে লোকের ভীড় হইতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনে মন্দিরের ভীড় কমিয়া গেল। ইহা দেখিয়া পাণ্ডারা বিরক্ত হইয়া উঠিল। আমি সেবারে ঝুলন যাত্রায় ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।" একথা আর গোপন রহিল না। শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, বাংলা, বিহার প্রভৃতি ভারতের নানা স্থান হইতে অগণিত আর্ত্ত ও রোগী, যোগী ও ভক্ত—সকলেই পরমপুরুষ সাধুবাবার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায়, তাঁহার চরণযুগল স্পর্শের আশা লইয়া দলে দলে আসিতে লাগিল। যে স্থানেই তিনি আসন করিতেন, দরিদ্র-নারায়ণ আবালবৃদ্ধবণিতা, ধনী, শেঠ সকলেই ভগবান দর্শনে যাইতেছেন এই মনে করিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বালিতে থাকাকালীন দুর্গাপূজা করিতে আদিষ্ট

হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশ ব্যতীত নিজে কিছু করিতেন না। তিনি বলিতেন, "মাকে জানাই, মা যদি বলেন, যদি আদেশ দেন তবেই করিব।"* তিনি আদেশের অপেক্ষা করিতেন এবং মহাকারণ-সম্ভূতা জগজ্জননীর আদেশ ব্যতীত স্বেচ্ছায় উদ্যোগী হইতেন না। বালকের স্বভাব—বাৎসল্যভাবেই যেন তাঁহাকে স্ব-ভাবে মনে হইত।

শ্রীশীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে দুর্গাপূজা হইবে ঠিক হইল। শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত তিনটি তামার ঘট ও পূজার উপকরণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী কিনিয়া আনিলেন। ইতোমধ্যেই শীতলদার বাটী আশ্রমের ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছিল এবং অরুণদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তবাড়ি হইতে ভিক্ষা করিয়া বা নিজে জোগাড় করিয়া চা, চিনি, চিড়া, চিনাবাদাম, গাওয়া ঘী, প্রভৃতি লইয়া আসিতেন। সঙ্কল্প করিলেন—

"ব্রাহ্মণবলঃ ধর্মশক্তিরক্ষণার্থং ক্ষত্রিয়বলঃ রাজশক্তিরক্ষণার্থং
বৈশ্যবলঃ ধনশক্তিরক্ষণার্থং শূদ্রবলঃ শ্রমশক্তিরক্ষনার্থং
গুণ ও কর্ম পুনরুদ্ধারণায় মহাশক্তি পূজামহং করিষ্যে।"

মহা অষ্টমী পূজার দিন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। মৃণ্ময়ী প্রতিমা নাই। পূজায় বসিয়াছেন এই যুগের একাধারে রাম ও গোবিন্দ—রাম-গোবিন্দ যুগদেবতা। জগজ্জননী মা দুর্গার পূজা করিতেছেন তিনটি তামার ঘটে। বাজার হইতে অন্যান্য উপচারের সহিত তিন জোড়া শাঁখের চুড়ি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজায় লাগিবে বলিয়া আনা হইয়াছে। সপ্তমী পূজায় এক জোড়া শাঁখা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। পূজার আসনে বসিয়া ঠাকুর অষ্টমীপূজার দরুণ শাঁখা জোড়া চাহিলেন। অরুণদা পাশে বসিয়া ঠাকুরকে পূজার উপচার হাতে হাতে আগাইয়া দিতেছিলেন। পূজার ডালি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া শাঁখাজোড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া খেলায় মত্ত ছেলেমেয়েদের কাজ ভাবিয়া তাহাদের তিরস্কার

ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঠাকুর ইসারায় নবমী পূজার দরুণ যেই শাঁখাজোড়া রাখা আছে উহাই আনিতে বলিলেন এবং উহাই উৎসর্গ করিলেন। মহানবমীর দরুণ এক জোড়া নতুন শাঁখা পুনরায় কিনিয়া উহা নবমীপূজায় উৎসর্গ করা হইল।

সন্ধিপূজা হইয়া গিয়াছে। মহানবমী পূজার আয়োজন চলিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন স্ব-পাক আহার করিতেন এবং ঝাল খাইতেন। বেশ কিছু কাঁচা লঙ্কা লইয়া ছাড়াইতে বসিয়াছেন। বোঁটা হইতে কাঁচা লঙ্কাগুলি ছাড়াইতেছেন! হঠাৎ অরুণদাদাকে ডাকিয়া "এই নাও" বলিয়া অরুণদার হাতের মুঠায় কি দিলেন। অরুণদাও হাতে ধাতবপদার্থের স্পর্শ পাইয়া বাহিরে গিয়া হাতের মুষ্ঠি খুলিয়া দেখিলেন একটি আনকোরা সেই বৎসরের সোনাব গিনি! হাতে ঝক্ঝক্ করিতেছে। সকলে দেখিয়া বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেলেন। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে আপনা হইতেই সকলে লুটাইয়া পড়িলেন। তাহার পর নবমী পূজা সম্পন্ন হইল।

নবমী পূজা পার হইয়া বিজয়ার দিন ঠাকুর আদেশ দিলেন যে ঘট তিনটি লইয়া যাইতে হইবে। তিনটি ঘটের মধ্যখানে যে ঘটটি ছিল উহা দশমীর দিন উঠাইতেই দেখা গেল হারানো শাঁখাজোড়া ডাবের তলায় ঘটে রক্ষিত আছে। উহাতে সকলে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "একি, ঐ ত' শাঁখাজোড়া! ওখানে কি করে গেল?" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "দেখিলে ত' অরুণদাদা। তুমি ছেলেদের বকিতেছিলে। যাঁহার জিনিস তিনিই লইয়াছিলেন। মায়ের পূজা মা-ই করিয়া লইয়াছেন।" কারুর মুখে কোন কথা ফুটিল না। ঠাকুর আমার একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া ঘট তিনটি লইয়া অরুণদার সহিত মোটরে কলিকাতা আহিরীটোলায় চলিয়া গেলেন। পরের বৎসর বালিতে শীতলদার বাটীতে প্রতিমা গড়িয়া দুর্গাপূজা হইয়াছিল।

বালীতে শম্ভুপ্রসাদ ঘোষালের বাড়ী তিন বৎসর লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর বালিতে দুর্গাপূজা সারিয়া আহিরীটোলায় শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্যের বাটীতে সমারোহে দুই বৎসর দুর্গাপূজা হইয়াছিল। পঞ্চম বৎসর আহিরীটোলায় শ্রীকুমার মিত্রের বাটীতে তিনি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। এই পূজার পর হইতেই ঠাকুরের ভাবের পরিবর্তন হইতে থাকে।

আহিরীটোলায় মহেন্দ্রবাবু বলিয়া ঠাকুরের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "বাবা তোর দোল পূর্ণিমার দিন কীর্তন করিতে করিতে মৃত্যু হইবে। তোর বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।" দোল পূর্ণিমার দিন মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে শিবমন্দিরের উঠানে ভোর হইতে প্রভাতী-কীর্তন আরম্ভ হইল। আবিরে আবিরে আকাশ বাতাস লালে লাল হইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নৃত্য যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে। অতি অপরূপ নৃত্য। কখনও গৌরভাব, কখনও সখী ভাব, শিব, কখনও শ্যাম, কখনও শ্যামাভাব। সে নৃত্য না দেখিলে ধারণায় আনা যায় না। যেমন প্রাণহরা অতি সুমধুর গলা তেমনই নৃত্য। ভাবে নৃত্য আরম্ভ হইলে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব ভাবে তাঁহাকে দর্শণ করিতেছেন। কেহ দেখিতেছে রাধা, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রাম, কেহ গৌর, কেহ নিতাই। এইরূপ বহু কথা ঐ নৃত্যের সময় ভক্তবৃন্দের মুখে শোনা যাইত। মহেন্দ্রবাবুও বাবাকে দোলের দিন বাড়ীতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া কীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন। যত বেলা বাড়িতে লাগিল মহেন্দ্রবাবুরও আতিথেয়তা বাড়িতে লাগিল। প্রত্যেককে বাবার নিজজন মনে করিয়াপ্রাণপণ সেবা করিতে লাগিলেন। একদিকে কীর্তনে মাতিয়া অন্যদিকে ভক্তগণের সেবা প্রাণপণ করিয়া চলিয়াছেন। ঠাকুরের নিয়ম "জয় রাধে গোবিন্দ, পেট ভরলে আনন্দ।" সকলকার পেট ভরান চাই। প্রিয় ভক্ত সকলকার

সেবা করাইয়া বেলা ৩টার সময় নিজে স্নান করিতে স্নানঘরে ঢুকিলেন। ব্যস! সব শেষ। স্নান করিতে করিতে মহেন্দ্রবাবু কলঘরে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। সময় চলিয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রবাবু স্নান ঘর হইতে আসিতেছেন না কেন ?—ইহা সন্দেহ হওয়ায় দরজা ভাঙ্গিয়া সকলে দেখে মহেন্দ্রবাবু মহা সুখে চিরনিদ্রা যাইতেছেন। শরীরে কোনরূপ স্পন্দন নাই। মুখে পরম শান্তির চিহ্ন। শোনা যায় ঠাকুর মৃত্যু দেখিতে পারেন না। কিন্তু সেদিন ছুটিয়া আসিয়া মাথায় ও বুকে চরণ দিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহাই হইল।

১৯২৭ হইতে ১৯৩২ সালের ভিতর ঠাকুরের পার্ষদ হিসাবে শীতলদা, দাদু, শঙ্করদা, অদ্বৈতদা ও অরুণদা আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুরের লীলা আস্বাদন ও বিভূতি দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৯৩৭-এর ভিতর অন্তরঙ্গ গৃহীভক্তগণও আসিয়া তাঁহার চারিপাশে সমবেত হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সাধনমা, চুণীবাবু, গুল্টুবাবু, ডাক্তারবাবা, প্রমথবাবা, শম্ভুদা, অমূল্যবাবা, যতীনবাবু, গোবর্দ্ধন গোঁসাই, বিনয় মুখোপাধ্যায়, মোহিনীবাবু, জ্ঞানবাবা, ডাঃ দীর্ঘাঙ্গী, বীরেশ্বরবাবু, সাণ্ডেল মশাই, শ্রীপশুপতিনাথ দেব প্রমুখ অগ্রণী ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

উপবাস ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা

ঠাকুর ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। বর্তমান, ভবিষ্যত, অতীত সব বুঝিতেন, সব জানিতেন। সব সময় ঠাকুরের নিকট হাজার হাজার লোক সমাগম হইত। কিন্তু কে কি জন্য আসিয়াছে, কি বলিবে, কি চায়, সব সময় মুড়ি মুড়কির মত বলিয়া যাইতেন। তাঁহাকে কোনরূপ ফাঁকি দেওয়া যাইত না। অবশ্য সব সময় যে প্রকাশ পাইত তাহা নহে। বেশীর ভাগ কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া মনের কথার জবাব দিতেন। ঐ দোল পূর্ণিমার দিন হইতে ঠাকুর যেন কি রূপ হইয়া যাইতে লাগিলেন। সব সময় যেন একটা গম্ভীর ভাব। খাওয়া দাওয়া কোন দিনই বিশেষ কিছুই নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু সেই সময় চিড়া, পাঁপড়, বাদাম ভাজা খাইতেন। তাহাও আস্তে আস্তে কমিয়া যাইতে লাগিল। চাপান ও বিড়ি ধূমপান করিতেন। তাহাও কমাইতে লাগিলেন।

এইরূপ অবস্থায় শ্রীগোবিন্দ কলিকাতা হইতে শিবপুর বাজারের উপর হোমিও ডাক্তার সুরেন ঘোষের বাড়িতে উঠিলেন। সেখানেও কিছু খাইতেন না। সুরেন বাবা ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা যত্নের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া সেবায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই খাওয়াইতে পারিতেন না। পুরা উপবাস আরম্ভ হইল। একটু লেবুর রস, একটু চা, সবই জোর করিয়া দিলে মুখ দিয়া আবার বাহির হইয়া আসে। এইরূপে কয় মাস ধরিয়া উপবাস চলিতেছে। সকল ভক্তবৃন্দ যাতায়াত করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন ঠাকুর আমাদের বোধ হয় আর বেশিদিন নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরও অরুণদাকে, ডাঃ বাবাকে কখনও বলিতেছেন, "আমায় কোন

গাছতলায় কিংবা গঙ্গার ধারে লইয়া চল, আমি গৃহস্থবাড়িতে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি না।"

ঐ সময় একদিন বর্ত্তমান শ্রীগোবিন্দ আশ্রমের জমির স্বত্বাধিকারী ৺প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছেন। প্রাণের ঠাকুর প্রমথবাবাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, এখানে তোমার কোথায় বাগান আছে, আমায় তথায় লইয়া চল, আমি এক্ষুনি যাব।" প্রমথ বাবা বলিলেন, "বাগান আছে বটে, তবে বনজঙ্গলে ভর্ত্তি। ঘরদোর নাই, আপনি সেখানে কোথায় যাইবেন? কেবলমাত্র সামনে একটি পুকুর আছে ও একটু বাঁধানো ঘাট বা বসিবার জায়গা আছে। ইহা ছাড়া কিছুই নাই। ঘর, দোর, পায়খানা না থাকিলে আপনি সেখানে যাইয়া থাকিবেন কি করিয়া?" ঠাকুর সব শুনিয়া বলিলেন, "আমি ঘাটে গিয়া কি থাকিব? বনজঙ্গল সাফা করিয়া লইব। আমায় এক্ষুণি লইয়া চল। প্রাণ যদি যায় সেইখানেই যাইবে, মোটর ডাক"।

শ্রীরামগোবিন্দ ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪৪ সন, ১১ই আগষ্ট ১৯৩৭ খ্রী বুধবার রাত্রি ১১টা নাগাদ এই বাগানে আসিয়া উঠেন। তখন বাগানটির নাম ছিল "কেদার-কানন"। সঙ্গে ছিলেন সর্বশ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত, জীবন কর্মকার, নৃপেন্দ্রনাথ সেন, কার্ত্তিকদা, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। গুরুনারায়ণকে ভক্ত শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মোটরে পৌছাইয়া দিয়াই সেই মোটরে ফিরিয়া যান। শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'কেদার কাননে' প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি গুরুদক্ষিণা বা গুরুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন রাখিলেন।

এই বাগানটি পূর্বে পাশের বাড়ির প্রপিতামহের পিতা ৺রামরত্ন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি ছিল এবং প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺চণ্ডিচরণের কণ্যার পৌত্র শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। কেদারবাবুর নামানুসারে 'কেদার কানন'।

কেদারবাবুর দৌহিত্র শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। ১৯২৭।২৮ সাল হইতেই ঠাকুরের চরণাশ্রিত। শীতলদার বাড়িতে যখন শীতলদার মা তাঁহার বাটীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় আপত্তি জানাইলেন প্রমথবাবু তখন (১৯৩৫।৩৬ সালে) ঠাকুরকে তাঁহার 'কেদার কাননে' আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাগানটি অযত্নে 'ভূতের বাগান' হইয়া পড়িয়াছিল। বাগানে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত। বহু পূর্বে একটি মালি বাগানটি দেখা শোনা করিত বলিয়া ইহাকে 'মালির বাগান' বলিয়াও অনেকে উল্লেখ করিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "এই বাগানের বাঁশ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর জন্ম।" শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধির অবস্থায় বহু দুর্লভ কথা বলিতেন। এক সময় ইহার নিকটেই গঙ্গা প্রবহমানা ছিলেন এবং ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে এই গ্রামের পাশদিয়া চাঁদ সওদাগর ও বিজয় সিংহ নৌবহর লইয়া গিয়াছিল। এখানে কপিল মুনির আশ্রম ছিল একথাও শোনা যাইত। ধন্য বাকসাড়া গ্রাম। ভরদ্বাজ, কশ্যপ ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয় অধ্যুষিত ও লাবণ্যমণ্ডিত গ্রাম এই বাক্‌সাড়া। ব্রাহ্মণ-প্রধান। দুই চার ঘর ঘোষ, পাল ও নন্দীও আছেন। ভদ্র, সদাচারসম্পন্ন গৃহস্থ পল্লীর ন্যায় সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি, প্রদীপ দেওয়া, নারায়ণপূজা, তুলসীপূজা, চণ্ডিপাঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রতিমাসে সত্যনারায়ণপূজা, একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার উপবাস, ব্রত, নিশিপালন পারণ ও ঋতু আবর্তনের সাথে অম্বুবাচী, গঙ্গাস্নান, গন্ধেশ্বরী, সাবিত্রীব্রত, দশহরা, গঙ্গাপূজা, মনসা পূজা, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, রথ, ঝুলন, গ্রহণ, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, পিতৃতর্পণ, মহালয়া, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, আম. কার্তিকপূজা, সরস্বতীপূজা, শিবরাত্রি, দোল, অন্নপূর্ণাপূজা, অরুং প্রভৃতি পালিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা



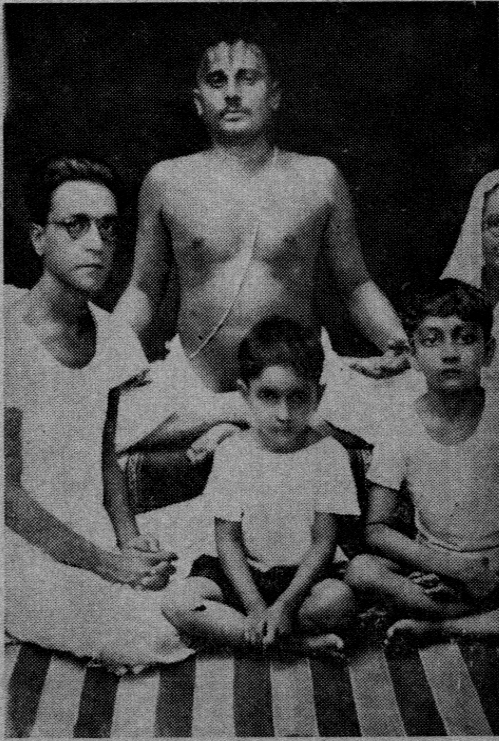
অনশনের পূর্বে ১৯৩৬

বেদান্তাচার্য্য
শ্রীল গীতগোবিন্দ পরমহংসহদেব



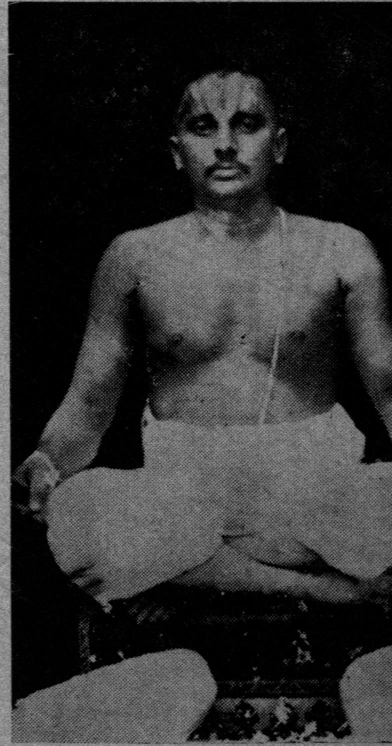
কুণ্ডের উপর যজ্ঞেশ্বর আসীন (১৯৪৭)

রামানুজাচার্য্য শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ



সাঁত্রাগাছীস্থ শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্যের গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর। মাষ্টার বিভু পায়ের নিকট বসিয়া আছে। (১৯৪১)

ভারতীয় সাধুবাবা



ভক্তগৃহে (১৯৪১)

এই জমিটি বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুর থানার অধীনে বাক্‌সাড়া নামক গ্রামে অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫৮নং বা ৫২এ বাস-রুটে ২৫ মিনিট এর প্রায় চার থেকে সাড়ে চার মাইলের পথ। বেতড় নামক বাস-ষ্টপেজে বাস হইতে নামিয়া সোজা দশ-বারো মিনিট পীচ ঢালা পথ অতিক্রম করিলেই আশ্রমে পৌঁছানো যায়। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ট্রেন-যোগে রামরাজাতলা বা সাঁত্রাগাছি যে কোন রেল ষ্টেশনে নামিলে সাইকেল-রিক্সা যোগে সোজা আশ্রমে আসা যায়। **শ্রীগোবিন্দ আশ্রম।**

প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া এই আশ্রমের দুই পাশে দুইটি নবনারী পূজা হইয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের নয়সখী মিলিয়া একটি হাতি হইয়াছে এবং উহার উপর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বসিয়া আছেন। মুরলী-বিহারী যুগলে উপবিষ্ট। দুই পূজামণ্ডপে এই অপরূপ মনোহর মূর্ত্তি বৎসরের চারমাস পূজিত হন। এই আশ্রমের নিকটেই কয়শত বৎসরের প্রচলিত বাংলাদেশেব বৃহত্তম বামরাজা মূর্ত্তিবাৎসরিক প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। রাজা রামচন্দ্র স-ভ্রাতা স-পার্ষদ রাজ-সভায় বসিয়া আছেন। মহাবীর হনুমানজীব বিশাল দর্শনীয় মূর্ত্তিটিও ভক্তদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। বাংলাদেশের এই তিন মূর্ত্তি অতীব দর্শনীয় প্রতিমা। দুই নবনারী ও এক রামরাজা। ইহাবই মধ্যস্থলে বর্ত্তমানের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। এক-দিকে ইক্ষ্বাকুকুলাধিপতি ত্রেতাযুগের দাশরথি জানকীবল্লভ অযোধ্যা-পতি রামচন্দ্র অন্যদিকে যদুবংশচূড়ামণি দাপর যুগের বাসুদেব রুক্মিণী-সত্যভামাবল্লভ দ্বারকাপতি নিখিলরসিকমণি রসময়রাস-বিলাসী রাধাবল্লভরূপে যুগলে অষ্টসিদ্ধির উপর প্রেমমুরলী ধারী শ্যামলগোবিন্দ উপবিষ্ট—ইহার মধ্যে একাধারে রাম ও গোবিন্দের প্রেমের ও নিত্যলীলার শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগোবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই স্থলে আমাদের আচার্য্যদেব মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বৃন্দাবনধাম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

৩

এই 'মালির বাগান', 'কেদার কানন,' বর্ত্তমানের
শ্রীগোবিন্দ আশ্রম
৩৬নং বাক্‌সাড়া রোড, পো : বাকসাড়া, জিলা-হাওড়া।

শিবপুর ডা: সুরেন ঘোষের বাড়ি হইতেই পুরাদমে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপবাস আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় চার মাস উপবাসের সময় উনি দেহরক্ষা করিবার জন্য চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে এই জমিতে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বদলবলে যে দিন রাত্রে বাগানে আসেন, পরদিন প্রভাতে ঘাটে মুখ-ধুইতে আসিয়া দেখি ঘাটের একটি রাণার উপর কুটকুটে লোমওয়ালা কালো ডোরা-কাটা কম্বল পাতিয়া, ও একটি লাল ডোরাকাটা লোমশ কম্বল মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া কে শুইয়া আছে। তাহার আশেপাশে দুই চারিজন লোক অতীব সন্তর্পণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি মুখ ধুইতে আসিয়া প্রথমটা সাধু-সন্ত দেখিয়া খুব চটিয়া উঠিয়াছিলাম। এমন সময় আমার পিতা জানালার ধারে বসিয়া একটু কাসিতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুর আমার সর্ব-অন্তর্যামী কাশি ধরিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপরে জানালার ধারে কে কাশিতেছে?" আমি বলিলাম, "যেই হোক্ না কেন, আপনার কি দরকার?" উহাতে তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। বলিলেন, "বল না, বল না খোকা, যেন মনে হইতেছে নগীনবাবা আমার বসিয়া আছে। কি হইয়াছে নগীনবাবার? বল না, বল না," বলিয়া অনুরোধ ও মিনতি করিতে লাগিলেন। এমন সময় পিতাও "গোবিন্দ বাবা, সাধুবাবা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। জানালা দিয়া আমগাছ ও চাঁপাগাছের ডাল-পালার ভিতর দিয়া পিতৃদেব ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

পিতার গলায় ক্যান্সার হইয়াছিল। তখন খুবই বাড়া-বাড়ি অবস্থা চলিতেছে। গলার স্বরও সেরূপ নাই। পরে শুনিলাম পিতা নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ সাধুকে পূর্বে দুইবার দেখিয়া-

ছেন। সাধু একটি লাল মোটরে করিয়া একবার একটি যক্ষ্মা রুগী ও অন্য একবার এক কলেরা রুগী দেখিতে এই বাক্‌সাড়া গ্রামে আসিয়াছিলেন। তখন আমারও মনে পড়িল বাক্‌সাড়া মোড়ে শ্রীদুলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে একটি লাল মোটরে করিয়া বৈকালের দিকে আসিয়া ঐ বাড়ির রকে বসিয়াছিলেন। দুলালদার স্ত্রী সাধুবাবাকে বাদামভাজা ও বড় কালো পাথরের গ্লাসে এক গ্লাস চা খাইতে দিয়াছিলেন। সেই সময় আমরা কতকগুলি পাড়ার ছেলে সাধু দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের হাতে সাধুও চিনাবাদাম ভাজা প্রসাদ দিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলাম বেশ রোগা সাধু। গেরুয়া বসন নাই, সাদা কাপড়ের এক ফালি হাঁটু পর্য্যন্ত পরা, আর একফালিও গায়ে। চোখ দুইটি কিন্তু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

ঠাকুর আমার কম্বল ছাড়িয়া উঠিয়া আস্তে আস্তে পায়খানার দিকে পিছনে গেলেন। একটু বাদে ধীরে ধীরে আসিয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "শালাদের জ্বালায় পায়খানা যাইবার, পেচ্ছাব যাইবার উপায় নাই। অমনি আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিবে। নাও, একশালা আসিয়া এটা দিয়া গেল," বলিয়া অরুণদার হাতে একটি গিনি দিলেন। অরুণদাকে আমি ব্যাপার কি, সাধুবাবা ওসব কি কথা বলিলেন, প্রভৃতি জিজ্ঞাসাবাদ করায় অরুণদা ভূত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতির বিষয় বলিয়া বলিলেন, "উহারা উদ্ধার পাইবার জন্য, জল পাইবার জন্য সাধুমহাপুরুষদের নিকট আসিয়া ধরপাকড় করিয়া থাকে। আর শৌচাদি করিতে গেলে জল পাইবার জন্য ছুটিয়া আসে" প্রভৃতি সব উপদেবতাদের কথা, উহাদের কাণ্ডকারখানা আমায় বলিয়া গিণিটি আমার হাতে দিলেন। সে গিনি আজও আমার নিকট আছে।

ঠাকুর ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়া পুকুরে নামিতে শুরু করিয়াছেন। আমরা বলিতে যাইতেছি জল ভালো নয়, স্নান করিবেন না।

কিন্তু কে কার কথা শুনে। ঝপাং করিয়া পুকুরে ঝাঁপ দিলেন অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিয়া উপরে উঠিয়া দুইটি ফুল ফেলিয়া দিয় অরুণদাকে বলিলেন, "আজ হইতে এই জল খাওয়া, রান্না, প্রভৃতি সব কিছু হইবে।" বাস্তবিকই তাহারপর হইতে জলের স্বাদ একদ: পাল্টাইয়া গেল। কি সুন্দর স্বাদ হইল তাহা আর কি বলিব! এই পুকুরের বিশেষ আরো বলিবার আছে যে, ঠাকুর এই বাগানে আসিবার ২।১ বৎসর বাদে পুকুরটির পঙ্ক উদ্ধার করিতে আদেশ দেন। সেই সময় পুকুরের দক্ষিণধারে যে দুটি নারিকেল গাছ আছে তাহার মাঝখান দিয়া পুকুরের ৩।৪ মানুষ তলা দিয়া ত্রিধারাব ন্যায় জল বাহির হইতে থাকে। পুকুরের দক্ষিণধারে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা আছে। রাস্তার তলায় কলের জলের পাইপ আছে লোকে ভাবিল কলের জলের পাইপ ফাটিয়াবুঝি জল আসিতেছে মিউনিসিপ্যালিটির লোক-জন আসিয়া সমস্ত রাস্তা ঘুরিয়া কোথা কোন পাইপ ফাটা দেখিতে পাইল না। ঠাকুর পুকুরের তলায় নামিয়া বলিলেন, "দেখ এই ত্রিধারার সঙ্গে কিরূপ অভ্র ও বালি আসিতেছে। পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা আমার দয়া করিয়া অন্তঃসলীলে এখানে আসিয়াছেন তোমাদের উদ্ধার করিবার জন্য। এ পুকুরের জল কখনও শুকাইবে না। এই জলেতেই পূজা, ভোগ, খাওয়া, প্রভৃতি চলিবে। রোগীরা এই জলে স্নান করিলে রোগমুক্ত হইবে।" তবে এই জলে জলশৌচ করিতে, সাবান কাচিতে প্রস্রাব করিতে, পুকুর কোনরূপ অপবিত্র করিতে বারণ করিলেন। এককালে এই জল ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা পান করিবার জন্য বড় বড় পাত্র আনিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাগল, যক্ষ্মা রোগী, প্রভৃতিকে এই জলে স্নান করাইয়া ঠাকুর রোগমুক্ত করিতেন। কত দূর দূরান্ত হইতে এই জল লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়াছে। আশ্রমেও বরাবরই এই জলে পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া আসিতেছে।

ঠাকুর আমার এই ঘাটেই মাথায় দুইখানি হোগলা দিয়া ছেলে খেলার ন্যায় একটু ঘেরিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। উপবাসের বিরাম নাই।

আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়া উঠিল। আমার নিকটে প্রত্যহ ২।৪টি হরিতকী চাহিতেন এবং হাত দেখাদেখি হইত। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ ও সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। তাঁহার হাতের রেখা দেখিয়া বলিতাম, "দেখুন সাধুবাবা, আপনার হাত ও আমার হাত প্রায় সমান। অতএব আপনি যেমন সাধু আমিও তেমনই সাধু।" তিনি একটু হাসিতেন।

দুই এক সপ্তাহ যাইবার পর আরম্ভ হইল দারুণ ঝড়। চারিদিকে গাছপালা পড়িতে লাগিল। ইলেকট্রিক লাইটপোষ্ট পর্য্যন্ত বাঁকিয়া দুমড়াইয়া গেল। চারিদিকে গেল-গেল রব উঠিল। প্রকৃতি তাণ্ডব-লীলা শুরু করিয়াদিল। সেইরূপ ঝড় বোধ হয় এই ৩৩।৩৪ বৎসরের ভিতর মাত্র দুই তিন বার হইয়াছে। সন্ধ্যার পর আমার পিতা ও গ্রামের দুই চার জন ভক্ত সাধুবাবাকে এই ঝড় হইতে বাঁচাইবার জন্য 'আমাদের বাইরের ঘরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে যে কি ঝড়, মানুষ চলিবার বা যাতায়াত করিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। ঠাকুরের কাছে আসিয়া দেখা গেল যে তিন চারজন ভক্ত লইয়া তিনি অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের পিছনে অর্থাৎ ঘাটের রাণার পাশে একটি বিরাট চাঁপা গাছ ছিল। সেই চাঁপা গাছের একটি বিরাট ডাল ভাঙ্গিয়া মাথার ওপর আটকাইয়া ঝুলিতেছে। মাথার উপর হোগলাটি ছাড়া সব উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঠাকুরের দেহে বা আশেপাশে এক ফোঁটা জল পড়ে সুস্থ শরীরে নাই। না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না ঠাকুর আমার অক্ষত দেহে, বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য উপভোগ করিতেছিলেন। যাঁহারা শুধু রাতটুকুর জন্য লইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ঠাকুর

বলিলেন, "একি বাবা, তোমরা এ সময় বাহির হইলে কেন? শীঘ্র বাড়ি চলিয়া যাও। আমি খুব ভালো আছি। আমার কোন রূপ অসুবিধা হইতেছে না। তোমরা শীঘ্র চলিয়া যাও, প্রাকৃতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এত দুর্য্যোগের মধ্যে বাহিরে থাকা উচিত নয়। যাও বাবা, যাও, শীঘ্র চলিয়া যাও।"

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম বাড়ির সম্মুখে বিরাট জামগাছ পড়িয়া গিয়াছে। এদিকে ওদিকে বহু গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পথ চলিবার উপায় নাই। কোঠা-বাড়িতেও লোকে থাকিতে ভয় পাইয়াছে। কখন কি হয়। এদিকে আসিয়া দেখা গেল ঠাকুর আমার যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। ঠাকুরের মাথার উপর চাঁপা গাছের বিরাট ভাঙ্গা একটি ডাল সামান্য একটু ছালের উপর ঝুলিতেছে। ডালটি পড়িলে কেহই বাঁচিতেন না। কোথাও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। হোগলার ছাউনি প্রায় সবই উড়িয়া গিয়াছে। শুধু ঠাকুরের মাথার উপরেরটি উড়ে নাই। এই ঝড়ের পরই তিনি সাড়ে চব্বিশ কোণবিশিষ্ট একটি বিরাট যজ্ঞকুণ্ড খনন করাইলেন। কুণ্ডটি গভীরে প্রায় মানুষ সমান এবং চারিপাশে বেদী তৈয়ার হইল যাহাতে যজ্ঞকুণ্ড ঘেরিয়া ১৫।১৬ জন বসিতে পারে। এ যজ্ঞকুণ্ডে যে কোন কাঠ দেওয়া হইত। বড় বড় গাছের গুঁড়ি হইতে শুরু করিয়া জঙ্গল সাফ করিয়া সমস্ত ডাল-পালা প্রভৃতি দেওয়া হইত কারণ ঠাকুরের অনুমতি ব্যতীত এ যজ্ঞাগ্নি নির্বাপণ করা হইবে না বা ইহাতে পূর্ণাহুতি দেওয়া যাইবে না ইহাই তাঁহার আদেশ ছিল।

শ্রীগোবিন্দের সহিত সেই সময় দাদু, অরুণদা, নৃপেনদা, চক্রবর্ত্তিদা, শঙ্কর দা ও বেলদা আছেন। প্রথমে দাদু, পরে শঙ্করদা ভিক্ষায় বাহির হইতেন। তিন বাড়ি ঘুরিয়া যাহা ভিক্ষায় পাওয়া যাইত তাহা ঘাটের সামনে তিন চারখানি ইঁট পাতিয়া একটি লোহার বালতি করিয়া প্রত্যহ রান্না হইত। তাঁহারা খুন্তির অভাবে

কলাগাছের ডাঁটা ব্যবহার করিতেন। প্রত্যহ বৈকালে ইস্কুল হইতে আসিয়া আমার জন্য রাখা ঐ মধুর খিচুড়ি প্রসাদ পাইতাম। যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে!

সময় এক রকম কাটে তবে বৃষ্টি আসিলে ভীষণ কষ্ট। জলে আগুন নিভিয়া যায়, রান্না করা যায় না। যদি বা রান্না হইল এবং কলাপাতায় প্রত্যেককে পরিবেশন করা হইল বৃষ্টিতে ভাসিয়া ধুইয়া যাইত। সে যে কি কষ্ট চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। রাত্রেও অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। নৃপেন বাবা আটা ভিক্ষায় বাহির হইতেন। কাছাকাছি জুটিলে এ-বাড়ি ও বাড়ি করিয়া তৈয়ার করাইয়া আনিতেন তাহা না হইলে ভবানীপুরে তাঁহার নিজ বাটীতে বা অন্য ভক্তবৃন্দের বাটী হইতে রুটি তৈয়ার করাইয়া ও কিছু তরকারি লইয়া রাত্রি নয়টা দশটায় আশ্রমে আসিয়া পৌঁছুতেন। তাহার পর ভোগ হইত।

এই সময় একদিন কলিকাতার রামদুলাল সরকারের প্রপৌত্র শ্রীপশুপতিনাথ দেব আশ্রমে গোবিন্দের চরণ দর্শন করিতে আসেন। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ উচ্চহৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতি সুষমা দেব ও তাঁহার তিন সুযোগ্য পুত্র বড়দা, মেজদা ও ছোড়দা—সুহৃদ, সুজিত ও সুনীত শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে পূজা ও সেবা করিতেন। মাসের পর মাস বিডন ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর সংযোগস্থলে তাঁহাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় গুরুনারায়ণকে রাখিয়া যথাযোগ্য সেবা-যত্ন ও পূজা করিয়াছেন। এক সময় দেব পরিবার শ্রীরামগোবিন্দের প্রধান রসদদার ছিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সামনে এক চুরুটের বাক্স ও উহার উপর ২৮০০০৲ টাকার একটি চেক্ রাখিয়া নিবেদন করিলেন, "বাবা, আপনার চালাঘরে চারিদিকে জল পড়িতেছে। আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন ও আশ্রমটি সারাইয়া পাকা করিয়া লউন।" সিগারের বাক্সটি

লইয়া ঠাকুর উচ্চৈস্বরে হাসিলেন ও চেকটি ফিরাইয়া বলিলেন, "ইহা মায়ের ঘর। মা আদেশ দিক, মা যখন বলিবে তখন লইব। তুই লয়ে যা।" আশ্রমস্থ সকলের মনে আশ্বাস আসিয়াছিল এইবার বুঝি জল পড়া বন্ধ হইবে, এইবার বুঝি একটু সুদিন আসিল।

এখনকার আশ্রম দেখিলে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার আশ্রমের কোন কল্পনাই হইবে না। এক্ষণে মাটিতে সিমেণ্ট হইয়াছে। মাথায় টিনের বিশাল ছাউনি হইয়াছে। বিদ্যুতের দৌলতে সুইচ টিপিলেই আলো জ্বলিতেছে, পাখা চলিতেছে। পাতকূয়া, টিউবওয়েল হইয়াছে। স্যানিটারী পায়খানা হইয়াছে। খাট, টেলিফোন, রেডিও আসিয়াছে। কালে আরও ব্যবস্থা হইবে ও প্রস্তরের মন্দির হইবারও তোড়জোড় চলিতেছে। কিন্তু তখন ভিজা স্যাঁতসেঁতে মাটি ছিল, মাথায় অল্প হোগলার চাল, চতুর্দিকে জল পড়িতেছে, টিমটিম হারিকেনের ও উৎসবে পেট্রোম্যাক্সের বাতি, হাত-পাখা সার, পুষ্করিণীর জল পানীয়, ভাঙা-চোরা খাটাপায়খানা খড়-শয্যা বা ছেঁড়া চট ও থলি শয্যা ও বালতীতে রন্ধন। কেহ কেহ "ইট্যালিয়ান বালিশ" অর্থাৎ ইঁটের বালিশ ব্যবহার করিতেন। দাদু সারাজীবন মাথায় ইঁট রাখিয়াই রাত্রি যাপন করিলেন এবং উনি 'ইটালিয়ান বালিশ' কথা প্রচলন করেন।

ইতোমধ্যেই আচার্য্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের এক এক করিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন। ১৯৩২ সালে বালিতে পূর্ণ-ভাবে আবির্ভাবের সময় হইতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর দুইবার বাক্সাড়ায় ঘুরিয়া গিয়াছেন। একবার শ্রীদুলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রকে বসিয়াই বোধ হয় ভবিষ্যতের তাঁহার লীলা-স্থল—কেদার কাননে শ্রীগোবিন্দ আশ্রম—মাতৃ-আদেশে দেখিয়া গিয়াছিলেন। জগজ্জননী মায়ের সহিত তাঁহার নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল এবং তাঁহার আদেশ ব্যতীত তিনি কোন কাজে হাত দিতেন না। ১৯২৭ সালে দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভাবের সময় হইতে

১৯৩২ সালে বালিতে আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত তিনি আহিরীটোলা, বরাহনগর, বর্ধমান, অগ্রদ্বীপ, উত্তরপাড়া, বেহালা, বাগবাজার, বৃন্দাবন, ধানবাদ, ঝরিয়া, ভবানীপুর, পুরুলিয়া, কোকানাড়া, হাওড়া, বিজয়নগর, ব্যাঙ্গালোর, বারাণসী, পাটনা, গয়া, রাজগীর প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চল নামপ্রেমে ভাসাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৫৩ সালে লীলাবসান পর্যন্ত শ্রীগোবিন্দ আশ্রম কেন্দ্র করিয়া তিনি ষোল বৎসর মানব সমাজকে পথ দেখাইয়াছেন। ষোল বৎসর আশ্রমে তিনি ষোলটি দুর্গাপূজা, ষোলটি মহালক্ষ্মীপূজা, ষোলটি অন্নকূট মহোৎসব এবং ষোলটি মহারাস ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন।

অরুণদার আশ্রম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত প্রচেষ্টা মনে পড়ে। তিনি আশ্রমকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ভোর হইতে ঝাঁট দেওয়া, রান্নার বাসন মাজা, তা'র পর কার কি দরকার। সে সব দেখাশুনা করিয়া প্রত্যহ তাঁহার খাইতেই একটা দুইটা বাজিত। আমি যে কয়জন অন্তরঙ্গের নাম উল্লেখ করিলাম ইহারা কেহ গরীবের ছেলে নন। ইঁহারা প্রকৃতই সাধুসঙ্গ করিতে বাহির হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে আমার সব সময় বুকে করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। প্রাণপণ সেবা করিতেন। ঠাকুরের তখন ছয় মাস উপবাস চলিতেছে।

বন পরিষ্কার করিলে কি হইবে এদিকে সাপ, ব্যাঙ, বড় বড় বিছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর কম্বলের উপর শুইয়া ঘুমাইতেছেন ও বিষধর সর্প আসিয়া সেই কম্বলের গরমে আরামে কুণ্ডলি পাকাইয়া তাঁহার পাশেই শুইয়া আছে। ইহা নিত্যকার ঘটনা ছিল, সাপ যেন আশ্রমবাসীদের নিত্যসঙ্গী। অরুণদার প্রাণঢালা সেবায় ঠাকুর আমার ছয় মাস উপবাস অবস্থাতেও সজীব হইয়া ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় নামকীর্তন ও লোকজন আসিলে তাহাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া এবং সন্ধ্যার

কীর্ত্তনের পর গীতাপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি সকলই তাঁহাকে করিতে হইত।

বর্ত্তমানে প্রচলিত '৺ কীর্ত্তনাবলী'র কীর্ত্তন তখন ছিল না। শুধু নাম কীর্ত্তন এবং তাহার ব্যাখ্যা হইত। কীর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ণব্রহ্মসনাতন পূর্ণ অবতার শ্রীশ্রীরাম-গোবিন্দ আচার্যদেব বলিয়াছেন, "আমাদের ধর্ম হইতেছে জীবে সেবা, নাম সার, প্রেম ধর্ম। কলিহত জীব, সাড়ে চব্বিশ ইন্দ্রিয়কে প্রেমিক করিয়া তোল। অহরহ নামপ্রেমে বিভোর হইয়া থাক। কারণ ইন্দ্রিয়গুলিকে একমুখী করিয়া না দিলে ইতি-উতি ধাইবে, মনকে স্থির হইতে দিবে না। নতুন করিয়া নাক-কান টিপিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে না। মাতো, মাতো, নাম সংকীর্ত্তনে মাতিয়া যাও। মনে রাখিও ভাঙতে হবে উল্টো চাবি গুরুমন্ত্র ক্রিয়ার জোরে।" তিনি যে নাম কীর্ত্তন করিতেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইহাই মূলাধার॥

এই মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে॥ স্বাঠিষ্ঠান॥

এইরূপ ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিতেছে।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্॥ মণিপুর॥

তাহার পর

কৃষ্ণ কেশব হরে রাম রাঘব হরে।
কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব রাম নারায়ণ হরে॥

ইহাই হইল অনাহত। তাহার পর আর ও উপরদিকে মন তাহার সাড়েচব্বিশ ইন্দ্রিয়কে লইয়া যাইতেছে।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—

বিশুদ্ধায় লইয়া গেল। এইরূপে উঠিতে উঠিতে

হরিজ্ঞান প্রেমানন্দে গোবিন্দ গোবিন্দ

বলিয়া আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত মিলন করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া

হরি নারায়ণায় গোবিন্দ গোবিন্দ

বলিতে বলিতে সহস্রারে অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত রমণ করিল এবং সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া 'রাধে রাধে গোবিন্দ জয় জয়' বলিয়া নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইল। বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। অমৃতের সন্তান অমৃতে মিলাইল এবং প্রাণমন ভরিয়া অমৃত পান করিতে লাগিল।" ঠাকুর আমার নিজে খাইয়া দীন দুনিয়াকে খাওয়াইতে আসিয়াছেন। আরও বলিতেন, "চালাইয়া যাও, একদিনে না হয় পাঁচ দিনে হইবেই। শ্রীগুরুকৃপায় সকলই সম্ভব। চাই দৃঢ় বিশ্বাস, আর চাই গুরুকৃপা। গুরুকৃপাই পথের পাথেয় জানিয়া রাখিও।"

সেই সময় এক ভক্ত আশ্রমের বর্ণনা করিতে গিয়া একটি বাউল গান রচনা করিয়াছিলেন। উহার উদ্ধৃতি রাখিলাম—

(বাউল)

চল যাই কেদার কাননে
আসি যাই, প্রসাদ খাই
সেথা কোন খবর রাখিনে।
সেথা ভাব করে শেয়াল কুকুরে
মাছগুলো সাঁতার কাটে মঠের পুকুরে।

সাপেরা সব খেলা করে
একান্তে আপন মনে
চল যাই কেদার কাননে।
সেথায় পাখীরা সব করে নানা গান
মাতাল হাওয়া বয়ে যায় ধরে সুরতান
এমন প্রাণ মাতান, চোখ জুড়ান
স্থান নাই কোনখানে
চল যাই কেদার কাননে।
রেতের বেলা পেঁচা ডাকে
সকাল বেলা চেঁচায় কাকে
পায়রা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
কানন প্রাঙ্গণে
চল যাই কেদার কাননে।
ঠাকুর ঘরে বেজি ঘোরে, ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর
রান্নাঘরে বেড়াল ঘোরে, কাঠবেড়ালি প্রচুর
এরা কেউ কাউকে ভয় করে না
সাধুবাবার শাসনে
চল যাই কেদার কাননে॥

১৯৩২ সাল নাগাদ বালীর পঞ্চানতলার শ্রীবিজয় কুমার ঘোষাল ও তাঁহার ধর্মপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী পদ্মরাণী ঘোষাল ঠাকুরের চরণে আশ্রয় লন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান লোকব্রত ১৯৩৯ সালে (ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৩৪৬) শ্রীগুরুস্তোত্র রচনা করিয়া ছাপাইয়া ভক্তমধ্যে প্রচার করেন।

ওঁ তৎ সৎ।

১০৮ শ্রীগুরুগীতগোবিন্দ শ্রীচরণাম্বুজাভ্যাং নমঃ

শ্রীবিষ্ণোরবতার এব হি ভবে দুঃখস্য সংহারকঃ
পাপক্লেশভরৈর্নিমগ্নধরণীমুদ্ধর্ত্তু কামো মহান্ !
ভক্তানাং হৃদয়ে য এব সকলা শক্তির্মহাবৈষ্ণবী
তদ্দগ্‌র্ব্বাংঘ্রিযুগং কলৌ ন ভজতীত্যাহো জনঃ পাবনম্ ॥ ১

পিত্রোরপ্যধিকো গুরুঃ ক্ষিতিতলে হেতুশ্চ পারত্রিকো
জীবানাং শুভমস্তু সর্ব্ববিধকং মোক্ষঞ্চ চিন্তাময়ঃ।
কল্যাণে জগতঃ সদামতিরসাবধ্যাত্মলাভাত্মকে
জ্ঞানজ্যোতিরুচা বিধৌততমসা মন্দস্মিতেনোজ্জ্বলঃ ॥ ২ ॥

পুণ্যস্যাবহুজন্মনঃ ফলসমং প্রাপ্যং দুরাপং পদং
যস্য শ্রীগুরুরূপকস্য ভগবন্মাহাত্ম্যযুক্তস্য তৎ।
গোপ্তা সর্ব্বনরস্য তাপিতহৃদঃ সংসারতাপেন যঃ
একৈবাতিমরস্য হেতুরমরস্তৎপাদযুগ্মং ভজে ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মারূপ ইহারবিন্দবসতিঃ যোহয়ং হি গুর্ব্বাত্মকঃ
স্বর্গস্যাতিমহানয়ং প্রতিনিধিঃ বৃত্ত্যা রজোভূষণম্।
সত্ত্বেনাতিসিতেন বিষ্ণুসমকঃ সম্পন্নশুদ্ধাশ্রয়ঃ
পাপৌঘস্য বিনাশনে শিবময়স্তং নৌমি ভক্ত্যাস্পদম্ ॥ ৪ ॥

ধ্বান্তারিপ্রভয়া যথা চ তরলীভূতং হি রাত্র্যান্ধকং
অজ্ঞানান্ধকৃতং তথৈব বিনশন্ ভূলোকতো যো গুরুঃ।
আদিত্যাত্মসমঃ শ্রিতাহিতহরঃ কালে সমালম্বনং
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমামি করুণং মুক্তিপ্রদায়াচিরম্ ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ গুরোঃ স্তবার্থিনা লোকব্রতেনাধমহীনকর্ম্মণা।
অর্ঘ্যেণ দীনেন সমাপ্য পূজনং তদ্দেবপাদাশ্রয়ণং হি যাচ্যতে ॥

১৩৩৮ সাল নাগাদ হাওড়ার বিখ্যাত শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বসুর (যাঁহার নামানুসারে বাঙালবাবুর ব্রীজ) পুত্র শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মসমর্পন করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটি অতি বাস্তব বন্দনা কবিতা আকারে রচনা করিয়া ছাপাইয়া ভক্তবৃন্দের মাঝে বিতরণ করেন (তারিখটি ছিল ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৪৭)।

বন্দনা

সৌম্য শান্ত, স্বর্গীয়ভাব
বিরাজে তোমার আননে
পরশমণির অমোঘ গুণ
লুকায়ে রেখেছ চরণে।
কমণ্ডুলে তব আছে প্রেম বারি
সিঞ্চিয়া তাহা নাও ব্যাধি হরি
প্রেমের পরশে দৃষ্টি হীনের
দৃষ্টি ফিরাও নয়নে।
"সবার উপরে মানুষ সত্য"
তুমিই বুঝেছ সার
সাধনা তোমার পরহিত সদা
নিয়াছ সেবার ভার
সেবায় করেছ ধর্ম, মোক্ষ সুন্দর তব জীবনে॥
চরণ পরশে যক্ষা সারিছ
উদরী, বাতুরী, কুষ্ঠ নাশিছ
পরশে পঙ্গু উঠিছে দাঁড়ায়ে
স্নিগ্ধ মধুর বয়ানে॥
উন্মাদে দিতেছ ফিরাইয়া জ্ঞান
মুমূর্ষের পুনঃ দিতেছ পরাণ
বাখানিতে নারি মহিমা তোমার আমার ক্ষুদ্র বচনে॥

শিশুর মতন শুভ্র হৃদয়
প্রাণ খোলা তব হাসি
সঙ্গ তোমার ছড়ায় মাধুরী
সকল কালিমা নাশি।
অমিয় তুমি দিতেছ বিলায়ে প্রেমের রাখিবন্ধনে॥

আশ্রম তব প্রেমের তীর্থ
খুলিয়াছ সেথা প্রেমের সত্র
ছোট বড় মিলি করে কোলাকুলি তোমার "তপোবনে"॥

শৈব তুমি বৈষ্ণব তুমি
শক্তির উপাসক
সকলের সার নিহিত হৃদয়ে
মুক্তির বিধায়ক॥

ব্রহ্মারে তুমি করিছ তুষ্ট
হোমের আগুন জ্বালি
সৃষ্টির ভার বৃদ্ধি করিতে
করিতেছ ঘটকালি॥

পূর্ণব্রহ্ম তুমি পরমহংস
দুঃখ, দ্বিধা, জরা করিছ ধ্বংস
বিশ্ব প্রেমিক প্রেমের শঙ্খ বাজাও তুমি সঘনে॥

ভেদাভেদ তুমি দিয়াছ তুলিয়া
সর্ব্বভূতে বুকে নিতেছ টানিয়া
প্রেমের আদর্শ করিছ প্রচার যাইয়া ভবনে ভবনে

ভক্তজনের কিবা মনস্কাম
লিখিয়া নিতেছ তার নাম ধাম
প্রেমের চিহ্ন শঙ্খ চক্র আঁকিয়া দিতেছ যতনে॥

গরীবের ব্যথা বুঝিয়া তুমি
তাহারে করিছ ধনী
চরণ পরশে লোহা সোনা হয়
ওগো অপরূপ গুণী ॥
যজ্ঞ বেদীতে বসিয়া তুমি
বুঝিছ গৃহীর ব্যথা
শুভ পরিণয়ে দিতেছ মিলায়ে দূর করি পণপ্রথা।
দিকে দিকে তব যশঃ সৌরভ
যেতেছে ছুটিয়া তব গৌরব
বারতা তোমার চারিভিতে আজি প্রচার করিছে পবনে।
ঘরে ঘরে শুনি তব জয়গান
পুলকিত তনু মেতে ওঠে প্রাণ
বন্দনা গীতি গায় সবে নিতি ভেসে যায় সুর গগনে॥
লক্ষ্মীর ঘট করিছ স্থাপনা—
যাইয়া দীনের ঘরে
তোমার প্রভাবে নির্ধনী ধনী
হোতেছে তোমার বরে
প্রসাদে তোমার সাধক শ্রেষ্ঠ
দুর্ব্বলে তুমি করিছ পুষ্ট তোমার আশীষ দানে॥
বালক বালিকা কিশোর কিশোরী
যুবক যুবতী প্রৌঢ়া বা বুড়ী
তোমার পরশ যাচিতেছে সবে
কামনা লইয়া গোপনে॥
জগাই মাধাই মোরা দীন অতি
দূর হতে তোমা জানাই প্রণতি
মিনতি করি তারি সাথে তোমা রাখিও দোঁহে চরণে॥

পঞ্চম অধ্যায়

মহামায়ার আরাধনা

এইরূপে ভাদ্র মাস কাটিল। আশ্বিন মাস আসিল। প্রাণের ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছেন কেদার কাননে তাঁহার শ্রীদেহ রক্ষা করিতে কোন বৃক্ষচ্ছায়ে, আকাশতলে। তাই কৃশতনু কৃশতর হইয়া উঠিল দিনের পরদিন অনশনে। পাঁচমাস অনশনের মাথায় তিনি একদিন বলিলেন যে জগজ্জননী তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন যে বাংলায় তাঁহাকে ষোল বৎসর মাতৃপূজায় ব্রতী হইতে হইবে। পরম বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের বংশধর, শ্রীসম্প্রদায়-ভুক্ত মহাযোগেশ্বর হরি শ্রীরামগোবিন্দ আমার মাতিয়া উঠিলেন মাতৃ-আরাধনায়। তিনি জগৎকে কৃপা করিলেন। যে মহাব্রত লইয়া হরি আমার নবকলেবরে শ্রীরামগোবিন্দ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহাই পূর্ণ করিতে তিনি সানন্দে অনশন ভঙ্গ করিলেন লেবুর রস, নিমপাতা ভাজা, বেলপাতার রস ও গরম দুধ পান করিয়া। তাহার পর হইতে তিনি ফল, বাদামভাজা, পাঁপড়ভাজা, চিড়াভাজা ময়দা, গমের দালিয়া, দুধ ও গরম চা গ্রহণ করিতেন। অন্ন তখনও গ্রহণ করেন নাই।

তাহার পর সাজো সাজো রব। প্রমথবাবাকে খবর দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া কতকগুলি ভাঙ্গা-চোরা টিন দিয়া একটি একচালা ঘর বানাইয়া দিলেন। ছিটে বেড়ার দেওয়াল ও ঘরের উত্তর দিকে মাঝখানে একটি লাল সিমেন্টের বেদী তৈয়ার হইল। লাল বেদীর সামনে দরজা ও ঠাকুর ঘরের সেই দরজার সিধা একটি বিরাট যজ্ঞকুণ্ড। উহা সদাই জ্বলিতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দুর্গাপূজা দেখিলে জীবন সার্থক হয়। বিভিন্ন বৎসরের তাঁহার দুর্গাপূজা যেইরূপ ভিন্ন সময়ে দর্শন করিয়াছি তাহাই নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

ঠাকুর যখন আসিলেন কেদার কাননে তাঁহার কৃশ দেহটিকে বিলীন করিতে তখন আমরা জানিতাম না তাঁহার মনের অন্তরালে কি ইচ্ছা জাগরূক ছিল। আমরা দেখিলাম মাতৃ-আদেশে পরম-বৈষ্ণব সাধকশ্রেষ্ঠ গুরুগোবিন্দ ব্রতী হইলেন মাতৃপূজায়। শুরু হইল মাতৃপূজা। একটি ছোট টিনের আটচালার ভিতর একটি ছোট লাল বেদীর উপর তিনটি ঘট পরপর স্থাপন ও উহার সামনে সিঁদুরে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র লেখা একখানি তামার থালা। পরমবৈষ্ণব ঠাকুর আমার পূজায় বসিলেন। পূজার কোন আড়ম্বর নাই। শুধু সাদা চন্দন, তুলসীপাতা, বেলপাতা ও দুইচারিটি ফুল। আর তাঁহার শিষ্যভক্তের উপর আদেশ করিলেন—"দেখিও কেহ যেন আসিয়া অভুক্ত ফিরিয়া না যায়।" কিন্তু ঠিক সেই সময়ে অতিথি সংকারের বিশেষ কিছু ভাণ্ডারে ছিল না। কিন্তু আদেশ ঠাকুরের। পূজার আসনে ঠাকুর চোখের জলে দেহ, আসন সব ভাসাইয়া ফেলিতেছেন। হাতের ফুল হাতেই রহিয়াছে—শরীর হইতে কি যেন একটা শুভ্র তেজ বাহির হইতেছে। আর ঠাকুরঘরের বাহিরে কোথা হইতে চাল, ডাল, তরিতরকারী আসিতেছে। আশ্রমের চারি-পাশের লোকেরা কোমর বাঁধিয়া বিপুল উৎসাহে ভোগ রান্নায় ব্যস্ত! বেশ যেন একটা উৎসবমুখর পরিবেশ। আবার ভিতরে একদিকে আমার প্রাণের ঠাকুরের চোখের জল, অন্যদিকে ঘটের ডাব হইতে পিচকারীর ন্যায় জল বাহির হইয়া ঠাকুরকে স্নান করাইতেছে। বুঝিলাম না কে কাহার পূজা করিতেছে। তাহারপর শ্রীহস্তের ফুল স্থাপিত হইল ঘটের মূলে এবং ঠাকুর পূজার আসন হইতে উঠিলেন। আদেশ করিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে, "ভোগ আরতি সারিয়া লও।" বাহিরে আসিয়া বিহ্বল নেত্রে চারিদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন। ক্রমশঃ লৌকিক জগতে ফিরিয়া আসিলেন। উহার পর আরম্ভ হইল কীর্ত্তন। সে যে কি কীর্ত্তন লেখনীতে কি লিখিব? সেই সুমধুর কণ্ঠের প্রাণভরা

ভক্তিরসাপ্লুত ডাক যে শুনিয়াছে সেই মজিয়াছে। মনে হইল যতদূরে বা অতি নিকটে দেবতারা যে যেখানেই থাক না কেন আসিতে বাধ্য। তখনকার নামকীর্ত্তন অবশ্য এখনকার মত নয়। শুধু নাম সংকীর্ত্তন যাহা কীর্ত্তনাবলীর শেষে লিখিত আছে। এইরূপে ৩।৪ ঘণ্টা কীর্ত্তন। কীর্ত্তনের ভিতর মাঝে মাঝে কতরূপ বিভূতি দর্শন, জ্যোতির ছটা, প্রভৃতি। কীর্ত্তনের পর প্রসাদ বিতরণ।

অন্য এক বছরের কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর তাঁহার এই লীলাস্থলে যে সব সময় জ্যান্ত দেবদেবী লইয়া খেলা করিতেন, এরূপ ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। ঠিক সালটির কথা মনে নাই। বাংলার ১৩৪৬।৪৭ সনে (ইং ১৯৩৯ হইবে) এই আশ্রম প্রাঙ্গনে একচালা একটি টিনের ঘরের ভিতর ছোট একটি লাল বেদীতে তিনটি ঘট ও সামনে ওঁ নমো নারায়ণায় লেখা একটি তামার থালার সামনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—প্রত্যহ সকালে নিজে একবার করিয়া পূজায় বসিতেন। পূজায় বসার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উত্তাপ খুব বাড়িয়া যাইত, ও চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। নিজে পরম শ্রীবৈষ্ণব হইয়া আজ শক্তি পূজায় ব্রতী হইয়াছেন। একদিন সকালে পূজা সারিয়া বাহিরের রকে বিরাট বাঘছাল আসনের উপর আসিয়া আত্মভোলার ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বসিয়া আছেন। এদিকে ঠাকুর ঘরের পাশে বড় বড় উনান করিয়া খিচুড়ি ভোগ হইতেছে, এমন সময় জীর্ণ ময়লা লাল পাড় শাড়ী পরা একটি পাগলী নানারূপ দেহভঙ্গী করিতে করিতে আশ্রমে আসিয়া ঢুকিল। হাতে একটি ছোট মাটির নূতন হাঁড়ি ছিল। উপস্থিত আশ্রমের ভিতর ঢুকিতে গেলে বাঁদিকে যে নারিকেল গাছটি আছে, আগে ঐখানেই উৎসবের সময় কলাগাছ ও মঙ্গলঘট বসানো হইত। পাগলী মা-টি ঐ কলাগাছের গোড়ায় হাঁড়িটি রাখিয়া সিধা আসিয়া ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"গোবিন্দ, তোর ফুল মায়ের চরণে সুন্দর দেখাচ্ছে। সার্থক

তোর পূজা, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। পুরী যাবার পথে তোর পুজো গ্রহণ করতে এলাম,'—এই বলিয়া ঠাকুর যে বাঘছালের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেই বাঘ ছালের উপর ঠাকুরের পাশে বসিয়া পড়িল। হাত পাতিয়া ঠাকুরকে বলিল, "রাস্তায় আর খাবার জুটবে কিনা জানি না তুই আমায় খেতে দে।" ঠাকুর কিন্তু সেই আত্মভোলা অবস্থাতেই পাগলী মায়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতেছেন আর এদিকে প্রিয়ভক্তদের দিকে তাকাইতেছেন। যেই ঠাকুর ঘর হইতে নারকেল নাড়ু সন্দেশ প্রসাদ ও অন্যান্য আনিয়া সেই পাগলী মাকে আলাদা খাইতে দিলেন, তখন পাগলী মা চিৎকার করিয়া বলিলেন 'ওরে ওখানে নয়, এইখানে আমায় দে', এই বলিয়া ঐ বাঘছাল আসনের উপর বসিয়া কিছু খাইয়া, কিছু আঁচলে বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং "আমি শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছি, আজ আমি তোর এই আশ্রমকেও শ্রীক্ষেত্র করিয়া দিলাম" বলিয়া সেই আঁচলে বাঁধা প্রসাদ ভক্তবৃন্দের ভিতর ছুঁড়িয়া দিল। ইহাতে অবশ্য সেই সময় পাগলীর আচার ব্যবহার দেখিয়া সাধারণ লোকেরা খানিকটা বিরক্ত বোধ করিতেছিল। ঠাকুর ঘরের পাশে যেখানে লোকজন প্রসাদ পাইতেছিল, সেখানে পাগলী মা-টি আসিয়া প্রত্যেকের পাত হইতে তাড়াতাড়ি কিছু প্রসাদ তুলিয়া লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল ও সেই ছোট নতুন মাটির হাঁড়িতে ভরিতে লাগিল। তখন সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া পাগলী মা-কে তাড়া করায় পাগলী মা তাড়াতাড়ি আশ্রমের গেটের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় ঠাকুর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ধর ধর উহাকে ধর। দেখত ঐ পাগলী কোথায় যায়।" সঙ্গে সঙ্গে সকলে পাগলী মার পিছনে ছুটিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গেটের বাহিরে পাগলী মাকে আর দেখা গেল না। সকলেই এ রাস্তা ও রাস্তা ছুটিয়া গেল বটে তবে সেই পাগলীমার আর কেহ দেখা পাইল না। তাহার পর হইতে

একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ভোগের পর আর তিনি কোনরূপ জাতের বিচার করিতেন না। সকলেই প্রসাদ বিতরণ করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক পূজাতেই ঠাকুরের এক একটি লীলাখেলা প্রকাশ পাইত। পঞ্চভৌতিক দেহে থাকাকালীন ঠাকুর আমার যে কত অলৌকিক খেলা খেলিয়াছিলেন তাহা লেখনীতে লিখিয়া শেষ করা যাইবে না। তখনকার সেই অপরূপ লীলা-মাধুর্য্য ভক্তবৃন্দের চোখে ও অন্তরে রহিয়া গিয়াছে। সেইরূপ ভাবে কিছুই প্রচার হয় নাই কারণ তিনি কখনও নিজের প্রচার চাহিতেন না।

অন্য এক বৎসরের ঘটনা। ঘটনাটি দুর্গাপূজার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৯ কি ১৯৪০ হইবে। অনন্তময়ের অনন্ত-লীলার একটি লীলামাহাত্ম্য সকলের মনে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি সেই সময় ঠাকুর শ্রী, ভূ, নীলা তিনটি ঘটে ৺মায়ের পূজা বোধন, ভোগ আরতি করিতেন। প্রতিমা পূজা কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিয়াছিলেন। উপস্থিত আশ্রম অভ্যন্তরে—সামনে যে বেদীর উপর শ্রীগুরুগোবিন্দের মন্দির, গণেশ প্রভৃতি অন্যান্য দেবতা আছেন ঠিক তাহারই সামনে যে লাল বেদিটি আছে—ঐ বেদীর উপর তিনটি ঘট ও তাহার সামনে একটি তাম্র থালিতে "ওঁ নমো নারায়ণায়" লিখে রাখা থাকিত। ঐ লাল বেদীটি একটি টিনের ঘরের ভিতর অবস্থিত ছিল। ঐ ঘরটিকে আমরা ঠাকুর ঘর বলিতাম। ঐ ঠাকুর ঘরের সামনা সামনি বাহিরে এক বিরাট যজ্ঞকুণ্ড ছিল উপস্থিত যেখানে ত্রিশূল পোঁতা আছে। ঐ যজ্ঞ-কুণ্ডের মাঝখানে ঠাকুর মাটির বড় বড় ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পূজার ষষ্ঠির দিন সন্ধ্যায় আশ্রমের পিছনের একটি বিরাট বেলগাছের তলায় (উপস্থিত গাছটি মরিয়া গিয়াছে) বিল্ববরণের সময় একটি সাদা গরু আসিয়া

উপস্থিত হইল। তাহারপর ঠাকুর সঙ্কল্প করাইলেন। পূজা আরতি হইয়া যাইবার পর যখন সামনের দিকে আসিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন, সেই গরুটি আসিয়া আশ্রম অভ্যন্তরে প্রবেশের ঠিক সামনের জায়গাটিতে শুইয়া পড়িল। পূজার কয়দিন ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যায় নাই। স্থানটি গোময়মূত্র ত্যাগ করিয়া অপরিস্কার করার জন্য আমরা তাড়াইতে গিয়াছিলাম সত্য কিন্তু ঠাকুর উহাকে কিছু বলিতে আপত্তি করিলেন এবং প্রত্যেকবার ভোগের পর গরুটিকে খাওয়াইতে ও বারে বারে সিন্দুর হলুদ লাগাইতে আদেশ দিলেন। বেশ মনে আছে সেবারে সন্ধিপূজা হইয়াছিল সকাল ১০টার পর। সন্ধিপূজার আগে হইতে ঠাকুর আমার মহাভাবে বিভোর হইয়া আছেন—সব সময় চক্ষু দিয়া বিরামহীন বারিধারা বহিয়া যাইতেছে—আর মাঝে মাঝে গগনভেদী প্রাণস্পর্শী 'মা—মা ডাক'। সে সময় চতুর্দিকে কি যে একটি স্বর্গীয় শান্তিময় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল, মনে হইতেছিল মা যেন স্বর্গ হইতে সত্য সত্য নামিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুরের প্রেমময় মুখমণ্ডল যেন ধীরে ধীরে বরাভয়দাত্রী করুণাময়ী মাতৃমুখে পরিণত হইতেছে। মা যেন ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

এইরূপ আর একটি ঘটনায় কোরকোণ্ডায় মহারাজার প্রাসাদে কালী প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আত্মসমর্পন করিতে গিয়া তিনি একেবারে হুবহু কোরকুণ্ডেশ্বরী কালিমাতার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সে সময়েও শুধু আমরা নয়, সহস্র সহস্র ভক্তশিষ্য সেই মূর্তি দেখিয়া হৈ হৈ করিয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বা তাহা দেখিয়া জ্ঞানহারা হইয়াছিল।

তাহার পর সন্ধিপূজার সময় হইতেই ঠাকুর পূজার সঙ্কল্প আরম্ভ করিলেন এবং শ্বেতপদ্ম অর্চনা হইতে লাগিল। নিজেও কতকগুলি ফুল অর্চনা করিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ পূজা

চলিবার পর একটি কালো পাথরের থালায় লুচি, পরমান্ন, ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিয়া ভিতরে এবং বাহিরের বেদীতে আরতি সুরু হইল। আরতি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের এবং বাহিরের ঘটগুলির উপর যে ডাব ছিল সেই ডাবের সামনে অর্থাৎ ডাবের শীশের মুখ ফাটিয়া গিয়া ফিনকি দিয়া জল বাহির হইয়া কাহারও বা মাথায় কাহারও গায়ে পড়িতে লাগিল। বাহিরে দেখা গেল যে সাদা গরুটি কয়দিন ধরিয়া শুইয়াছিল তাহার গায়েও বেদীর উপরের ঘট হইতে ঐরূপ জল পড়িতেছে। শুধু ডাবের মুখ ফাটিয়া নয় ঘটের জলও উপছাইয়া পড়িতেছে। আমাদের প্রাণের ঠাকুর যে সব সময় জ্যান্ত দেব দেবী লইয়া খেলা করিতেন এই সব তাহারই প্রমাণ। তা'রপর আরতি শেষে গরুটিকে চর্ব্যচুষ্য খাওয়ানো হইল। পরে দুপুরে যখন আমরা লোকজন খাওয়াতে এদিকে ওদিকে কাজে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় কখন যে গরুটি কোথায় চলিয়া গেল অনেক খোঁজা খুঁজি করিয়াও তাহার সন্ধান আর মিলিল না। ঠাকুর বলিলেন,—"মা এসে কয়দিন তোমাদের সেবা লইয়া গেলেন এবং শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া সবার ঘট পূর্ণ করিয়া যথা স্থানে চলিয়া গেলেন।" এই ভাবে তাঁহার প্রতি পূজায় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে তিনি যেখানে যখন থাকিতেন সর্বকালে সর্ব অবস্থাতেই এইরূপ এক একটি অলৌকিক ও দৈব ঘটনা ঘটিত।

আরও একটি বৎসরের পূজার কথা বার বার স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করিতেছে। মহাবৈষ্ণব পূর্ণাবতার কত সাধারণ ভাবে আমাদের সঙ্গে খেলা খেলিয়াছেন আমরা কি ধরিতে পারিয়াছি? স্বয়ং পার্থ বলিতেছেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২ (গীতা ১১)

আমাদের অবস্থা "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম"। তাই পুরুষোত্তম রামগোবিন্দ প্রাণের ঠাকুর অবলীলা ক্রমে তাঁহার লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জগৎবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ভক্তদের গোবিন্দদর্শন করাইয়াছেন। তাঁহার নিকট এই সব কিছুই ছিল না। ছোট ছোট ছেলেরা যেমন পুতুল লইয়া খেলা করিয়া থাকে, ঠাকুর আমার দেবদেবী লইয়া তেমন খেলা করিতেন। তাঁহার গলে কেহ মালা বা চরণে পুষ্প দিলে তিনি সেই মালা ও পুষ্প জগদ্ধাত্রী, দুর্গা, কালি, কৃষ্ণ মূর্ত্তির গলে ও মাথায় দিয়া দিতেন অথবা নিজগলা হইতে খুলিয়া কাহাকেও ঐ সকল মূর্ত্তির গলায় পরাইয়া বা পুষ্পগুলি ঘটে দিতে আদেশ করিতেন।

বৎসরটি ১৯৪১।১৯৪২ হইবে। ১৯৪৩ও হইতে পারে। সেই বৎসর শরৎ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শেফালী ৺মায়ের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় চারিদিকে ফুল বিছাইয়া অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় আনন্দময়ী দশভূজা মায়ের আগমনের আর দেরী নাই। তাঁহার প্রিয় পুত্রের ডাকে মনোবাসনা পূরণের জন্য কৈলাস ছাড়িয়া, ভূলোকে শ্রীঠাকুরের লীলাস্থল 'কেদার কাননে' ছুটিয়া আসিতেছেন। আশ্রমের লতাপাতা, পশুপাখী সব যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। মঙ্গলঘট, কলাগাছ, বনমালা দিয়া চারিদিক সাজানো হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আড়ম্বরহীন দুর্গাপূজা দেখিবার জন্য দক্ষিণ হইতে মাদ্রাজী আম্মারা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্ত আরাধন শুরু হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে সাজো সাজো রব কতকটা হয়েছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর কিন্তু সে সময় পঞ্চভৌতিক

শ্রীশরীর লইয়া আশ্রমে উপস্থিত নন। ঠাকুর যে কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না। পঞ্চমীর সন্ধ্যা হইতে হঠাৎ দারুণ ঝড় জল শুরু হইল। মা যেন প্রলয়নাচন শুরু করিলেন। একদিকে দেশ বিদেশ হইতে বহু ভক্তবৃন্দের আগমন ঠাকুরের মাতৃপূজা দেখিবেন বলিয়া এবং অন্য দিকে প্রচণ্ড ঝড় জলে চারিদিকে যেন প্রলয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এদিকে ঠাকুরের কোন খবর নাই। সেই সময় আশ্রমের পুকুরঘাটে হোগলার পূব-পশ্চিম ঘেরা ছাউনি ছিল। ঘাটের সামনে বিরাট হোমকুণ্ড। তাহার সামনে টিনের একচালা ঠাকুরঘর ও উহার সামনে হোগলার ছাউনি খানিকটা হলঘরের মত। এসব বিস্তারিত লেখার উদ্দেশ্য যে ঐ প্রলয়ঙ্কর ঝড় জলের পর দেখা গেল চারিদিকে বহু বড় বড় গাছ পড়িয়া গিয়াছে, ইলেক্ট্রিক থামগুলি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া বা দুমড়াইয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রমের সামান্য হোগলার ঘরের কোন ক্ষতি হয় নাই। একখানি হোগলাও উড়িয়া যায় নাই। পূজার জন্য দেওয়া বনমালাও ছিঁড়ে নাই। যেখানে যাহা সব পূর্ণভাবে বিরাজমান। সেই সময় ভক্তবৃন্দ ও গ্রামবাসীরা উহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীর দিন বিল্ববরণ। তখনও ঠাকুরের খবর নাই। পুকুরের উত্তর পূর্বকোণে অবস্থিত বেলগাছে সন্ধ্যার পর বিল্ববরণ হইতেছে এমন সময় এক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর আবির্ভাব। আধময়লা ছেঁড়া সাদা আলখাল্লার মত কাপড় পরা। বেলতলায় আসিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আরতির পর আশ্রমে ঢুকিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন এবং নিজেদের মধ্যে কি যেন কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনে পূজার চারদিন আশ্রমে ছিলেন এবং সকালে স্নান ছাড়া আর কোনও দিকে তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। খাইতে দাও খাইবেন, কম বেশী সব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। যাহা হউক ষষ্ঠীর দিনও পার হইয়া গেল কিন্তু ঠাকুর অনুপস্থিত

এবং তখন চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল ও ভক্তবৃন্দ খোজ খবর করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাত কাটিবার পরই সপ্তমীর দিন শুভ ব্রাহ্ম মুহুর্ত্তে মোটরে করিয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পূজার কাজ, সঙ্কল্প আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের আরাধ্য দেবতাকে নিকটে পাইয়া আনন্দিত মনে সেবাকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রতি পূজার সময় ঐ ৩।৪ দিন দেখা যাইত, ঠাকুর যেন কিরূপ আন্‌মনা, অসংলগ্ন, ভাবগ্রস্ত। ছেলে মানুষের ন্যায় বিহ্বল, কান্না, সে যেন একটা কি রকম। না দেখিলে লেখনীতে ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। এইরূপে সপ্তমী ও অষ্টমী পূজা আনন্দের সহিত, প্রেমের সহিত অতিবাহিত হইল। আর দেখা যাইত সকালে পূজার আরতি শেষ হইবার পরই অল্প কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী দুইজনে একবার করিয়া সমস্ত গ্রামটা প্রায় ঘুরিয়া আসিতেন। সব সময় যেন একটা নির্লিপ্তভাব। যেন শুধু তাঁহারা ঠাকুরের চাঁদবদন দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। ইহা ছাড়া যেন তাঁহাদের আর কোন কাজ নাই। অষ্টমী পূজার পর ঐদিন সন্ধ্যায় হ্রীং দুর্গাদেবীর সন্ধিপূজা হইবে। ঠাকুর অপলকদৃষ্টিতে বিরাট এক বাঘছালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর ঘরের ভিতর আমাদের প্রিয় ও ঠাকুরের সন্ন্যাসীশিষ্য দাদু সন্ধিপূজায় বসিয়াছেন এবং বাহিরে যজ্ঞকুণ্ডের উপর ঘটের সামনে আমরা বসিয়াছি। প্রচুর শ্বেত ও লাল পদ্মফুল অর্চনার জন্য রহিয়াছে। প্রাণগোবিন্দ আমার সঙ্কল্প আরম্ভ করিলেন। তারপর বলিলেন "ম্লেচ্ছনিধনকারণ্যৈ দশদিশপরিবৃতায়ৈ হ্রীং দুর্গামায়ের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর"। এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। একটু বাদে জিজ্ঞাসা করিলেন "আত্মসমর্পণ করিয়াছ?" দাদু বলিলেন, "আত্মসমর্পণ কাকে বলে, উহার মানে কি?" ঠাকুর কথাগুলো যেন মনপ্রাণ দিয়া শুনিলেন এবং সেই বাঘছালের উপর চক্ষু

মুদিয়া, মাথায় একটি ঘোমটার মত চাদর ঢাকা দিয়া যোগাসনে বসিলেন। আহা সে যে কি রূপ ঠাকুরের হইতে লাগিল, তখন আর শ্রী, ভূ, নীলা ঘটে মা নাই, ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর মা দশভূজা বিরাজ করিতেছেন! কি চমৎকার রূপ, টানা টানা চোখ দুটি দিয়া অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে! শ্রীশরীরের চারিদিক থেকে যেন পাতলা সাদা মেঘের ন্যায় জ্যোতি বাহির হইতেছে—মনে হইতেছে—দশহাত বাড়াইয়া মা যেন ভক্তদের দিকে তাকাইয়া আছেন। সকলে অপলকদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে—কেহ ধারণায় আনিতে পারে নাই ঐ সময়টা আমরা কোথায় ছিলাম বা কোথায় আছি। এইরূপ কিছুক্ষণ থাকিবার পর ঠাকুরের আমার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি প্রাণভরে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "যাও আত্মসমর্পণ হইয়া গিয়াছে। জগৎজননীর চরণে পদ্মফুলগুলি অর্চনা করিয়া ভোগ আরতি সারিয়া লও।" এইভাবে সন্ধিপূজা শ্রী, ভূ, নীলা তিনটি তামার ঘটে, মাঝে অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়" লেখা একটি তামার থালা প্রত্যক্ষীভূত ৺মায়ের সন্ধিপূজা সাঙ্গ হইল।

পরদিন সকালে নবমী শেষ হইবার পর সেই বৈষ্ণব বৈষ্ণবী দুইজন কিছু খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইয়া কি সব কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন ও তাহারপর বৈষ্ণব বৈষ্ণবী কোথায় চলিয়া গেলেন। কোথাও তাঁহাদের আর খোঁজ পাওয়া গেল না। পরে শ্রীমুখে শুনিলাম, "শ্রীভগবান তোমাদের পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। কার্য্যশেষে আশীর্বাদ করিয়া (কোন দেশ নাম বলিয়াছিলেন, আজ আর তাহা মনে নাই) ও দেশে চলিয়া গেলেন।" এই সব ঘটনাবলী আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে ঠাকুর আমাদের কে বা কি ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামানুজ আচার্য্যের বংশধর শ্রীসম্প্রদায়ের পরমবৈষ্ণব হইয়া শিবের গায়ত্রীর সঙ্গে পরমব্রহ্ম রঙ্গনাথকে ধ্যান যেমন—

ওঁ নমঃ শিবায়। ওঁ নমঃ শিবায় বিদ্মহে মহাদেবায়
ধীমহি তন্নো বস্তুবিশ্বনাথঃ প্রচোদয়াৎ।
ওঁ নমঃ শিবায় চরণৌশরণমহং প্রপদ্যে
শ্রীমতে শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুরপরকীয়শেষশায়িনে নমঃ।
শ্রীমতে অনন্তশায়িনে নমঃ, শ্রীমতে রঙ্গনাথায় নমঃ॥
শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম্।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগবিদ্ধ্যানগম্যম্।
বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥

—ঠাকুরের এক অপূর্ব দান। শিবের গুরু নারায়ণ, নারায়ণের গুরু শিব ও আধারশক্তি শ্রীমতী পরমবৈষ্ণবী রাধার সহিত মহাশক্তি কালিমাতার অপূর্ব মিলন দেখা যায় না। একাধারে পরম বৈষ্ণব, পরম শৈব ও পরম শাক্ত—একই অঙ্গে তিনের অপূর্ব সংমিশ্রণ। বইয়ের পাতায় পাওয়া যায় কিনা জানিনা তবে নিজ চর্মচক্ষে দেখা ও তাঁহার সঙ্গলাভ করা বহু ভাগ্যের ফলে সম্ভব ও তাঁহার অশেষ কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না।

তিনি বলিতেন যে তাঁর দেহে একাধারে রামানুজ, শংকর ও গৌরাঙ্গ এইবার আবির্ভাব হইয়াছে। "আমি ভিতরে শাক্ত, বাইরে বৈষ্ণব।"

বিভিন্ন উৎসবে ও পূজায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহাভাবে বিরাজ করিতেন কখনও ভাবাবেশে গান, কীর্ত্তন, পূজা, সংকল্প, কবিতা ও রচনা ইত্যাদি চলিতেছে। তাঁহার ভাবময় ও ছন্দোময় কবিতাবলী ও রচনা পাঠ করিলে তাঁহার অনন্তভাব ও সমাধির অবস্থা আমরা কিছু আভাষমাত্র পাই। তাঁহার হিসাবের খাতা ছিল। তাঁহার হিসাবের খাতায় আয়-ব্যয়ের জমা খরচ পাঠ করিলে তিনি যে সদাই কোন রাজ্যে বাস করিতেন এবং পরমপুরুষ তিনি যে আমাদের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের অতীত

রাজ্যে বিচরণ করিতেন তাহা প্রমাণিত ও বোধগম্য হয়। তাঁহার বিপুল রচনাবলী পাঠ করিলে এবং উহার মর্ম উদ্ধার করিতেই একটি আধ্যাত্মিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট বা গবেষণাগারের প্রয়োজন। তাঁহার রচনা পাঠ ও উহার বিশ্লেষণ করিতে উত্তরকালে হয়ত 'শ্রীরামগোবিন্দ আধ্যাত্মিক গবেষণাগার'-এর প্রয়োজন হইতে পারে। নিম্নে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করিলাম :—

মা

শ্রীশ্রীসাধুবাবা

অনুসন্ধান কর মা কে
কে যে মা, কে যে পুত্র, মন প্রাণ আত্মা কে
অনুসন্ধান কর মা কে।

মার নাম বড় মধুর,
'ম' জীব 'আ' কার ঈশ্বর
মা শব্দ পূর্ণ ঝংকারে—ওঁকারে,
অনুসন্ধান কর মা কে।

অ কারে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়,
নিরাকারে আকার যুক্ত হলে,
পূর্ণ দর্শন মাকে।

মুক্ত জীব, মা মুক্তকেশী
পূর্ণ একাধারেতে কে
প্রতি মুহূর্তে নিরাকার
আকার নিরূপণ করে কে

পূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্ব যে "মা"
মুক্ত জীব ঘুরে যথা তথা রে

নির্বিকারী পরম ব্রহ্ম
পূর্ণজ্যোতি শক্তি কে ?
'মা'র নাম প্রত্যক্ষীভূত
জন্ম জন্মান্তরে রে
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামত, ইচ্ছামত ছেলে কে ?
মা'র প্রেম পথের পথিক করে
নিরবিচ্ছিন্ন সুখেরে ;
নিরবিচ্ছিন্ন শান্তিময়ী মা,
ছেলেও নিরবিচ্ছিন্ন সুখময় রে।
ছেলে কয় শুন মূঢ় মন আমার
কেবল 'মা' 'মা' বলে ডেকে চল
মার কৃপা হলে পরে বুঝবি তখন আমি কে
অনুসন্ধান কর মা কে।

* * * *

একটি খাতায় তিনি এইরূপ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

প্রশ্ন—মা কুলকুণ্ডলিনীকে মন্ত্র ও গুরুর (শ্রী) সহিত একতাকরণ।

উত্তর—ঈড়া, পিঙ্গলা ও শুষুম্নাকে ত্রিধাকরণ। উর্দ্ধে এবং অধে গমনাগমন। অধে মধ্যে উর্দ্ধে অন্তর নিরূপন। শরীরকে ত্রিধাভাগে বিভক্ত করা। মধ্যে শুষুম্নার সহিত মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত সপ্তচক্র ভেদ করা। সাড়ে বার সের পেটে বীর্য্য থাকিলে ইহা করিতে সক্ষম হয়। সাড়ে চব্বিশ সের রস ভগবদ প্রেমরসে মন ও প্রাণকে ডুবাইতে হইবে ; ডুবিলে যুগলরূপের সাক্ষাৎকার হয় এবং তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া তাঁহাকে সঙ্গের সাথী করিয়া সহস্রায় কুলকুণ্ডলিনীর জাগ্রত অবস্থায় রাখিয়া সহস্র-দল পদ্মে অনিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনিমা লাঘিমাদির দেবী যোগমায়ার আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহার সহিত

আলাপ পরিচয়াদি করিয়া অষ্টসিদ্ধি না ছাড়িলে তাঁহার সহিত আলাপ চিরস্থায়ী হয় না। তিনি মস্তবড় পরীক্ষক। সাধকের ভাব ভক্তিধারা তিনি সমস্তই জানেন, তাই তাঁহার নাম তারা; তিনি নিরাকারা ও সাকারা এবং সাক্ষাৎকারা এবং সাক্ষাৎকরা। তিনি জগদ্ধাত্রী। তিনি সাধককে সমস্ত মায়া ও প্রলোভন হইতে কোলে করিয়া রক্ষা করেন। তিনিই সাধকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার একটি নাম মহাযোগী ও আর একটি নাম মহেশ্বরী। তিনি জগদীশ্বরের নিরাকার ছায়ারূপে এবং মহামায়ারূপে সাধকের মনের ও প্রাণের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। অষ্টসিদ্ধির প্রলোভনে পড়িলে যোগমায়ার কৃপা হয় না ও সঠিক সিদ্ধ হয় না ও জন্মান্তর লইতে বাধ্য হয়। জন্মমৃত্যুবিবাহ এই তিনটেই একীভূত হয় এবং সমস্ত ভূতগণের ব্যাভিচারে পতিত হইয়া মহাভূতপুরী নামক চক্রে তিন কাল বাস করে। পরে আবার মহামায়ার কৃপাতে সাধক সাধ্যনিরূপিত অসাধ্যসাধনে তৎপর হয়। তখন যোগমায়া তাকে যোগে যোগান দান করেন। সে সাধনসিদ্ধ হয়; শাস্ত্র-সিদ্ধ হয়। বহুকাল এইরূপ হইবার পর নিত্যসিদ্ধে পৌঁছায় তখন সে সহস্রালোকে বাস করে। এবং যথা ইচ্ছা গমনাগমন করে। কখনও কোন কালে তাহার ক্ষয় হয় না এবং নিত্যপরিষদ হইবার যোগ্য হয়। তখন মন্ত্র তন্ত্র আপনা হইতেই পুষ্ট ও তুষ্ট হয়। এক লক্ষ ইঞ্জিনের শক্তি পরে কোটী সূর্য্যের শক্তি ধারণ করে।

৭

হরি ওঁ তৎসৎ

মহা নবমী ব্রত—

মহা নবমী পূজা মানে

দমসে খাও

পর পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

৭ শ্রীশ্রীহরিস্মরণং

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

হ্বং মহালক্ষ্মীদৈ্যা নমঃ

মম আরাধনা নানা উপনয়য়

প্রত্যক্ষ দর্শনং

এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

এই মাত্র ভগবৎদর্শনান্তর পূর্ণানন্দ

অনুস্বরামি কার্য্য আরম্ভম্

১৭৬০ মাইল

১৮০০০০০০০

২৮০০০০০

৫৮০৯৮৭৯৮১০১১

খরচ ও য়ায়

অন্য এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে—৺৭ শ্রীশ্রীহরিস্মরনং

৺শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা দরুণ ১০৮৲ টাকা

শ্রীশ্রীহরিস্মরণং

মার ভোগের দরুণ

১৫৷৷০

২৮৷৷০

২৪৷৷০

খরচ ১৮২৸/১৫

জমা ২৪৷৷০ জমা—মা'ই মালিক

অন্য পৃষ্ঠায় লেখা আছে—উৎসবে ব্যায়

আয়--১০০০১৲ অমাঃ ও পূর্ণমাসি ব্রতঃ রাস অবধি

৺শ্রীশ্রীহরিস্মরণং

জমা—১১৬৷৷০ খরচ—নাই

১৯৩৬ সালে ঠাকুর আহিরীটোলায় 'অন্নপূর্ণা আলয়'এ দুর্গাপূজা করেন। অভ্র ব্যবসায়ী শ্রীকুমার মিত্রের বাড়ীতে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পুরীধাম হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ধূমধামের সহিত এ পূজা অনুষ্ঠিত হইবার পর প্রাণের ঠাকুর গৃহস্থ বাড়ীতে দুর্গা পূজা বন্ধ করেন এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯৩৭ সালে দুর্গাপূজা শুরু করেন। আশ্রমে পূজার পূর্বে ঠাকুর দুই বৎসর শীতলদার বাড়ী, দুই বৎসর আহিরীটোলায় শ্রীচুণিলাল ভট্টাচার্য্যের বাড়ী এবং একবৎসর ভূতনাথ মিত্রের বাড়ী পূজা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম—

শ্রীগোবিন্দের কথাবার্তায় মনে হ'ত যে তিনি মূর্ত্তিপূজা পছন্দ করেন না অথচ ১৯৩৬ সালের দুর্গাপূজায় তিনি মূর্ত্তিপূজা করবেন জেনে খুবই অবাক হ'য়ে গেলাম। সাধকের খেয়াল, বালকের খেয়াল, আর পাগলের খেয়াল তিনটিই একরকম।

মহামায়ার পূজা, হোতা এবং পূজারী স্বয়ং গোবিন্দ। এই বিরাট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আহিরীটোলায় কুমার মিত্রের বাড়ী।

শরতের সোনালী আলো বর্ষার ক্লান্তি ধুয়ে মুছে দিয়ে দিগ্‌দিগন্ত দিয়েছে রঙ্গিয়ে। আকাশ বাতাস ভরপুর হ'য়ে উঠেছে আগমনীর সুরেলা আমেজে।

৺মিত্র মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য গৃহ অতীতের দুঃখ, শোক, পাপ তাপ হারিয়ে আজ ধন্য হ'য়ে উঠেছে। সাধারণ গৃহস্থের পূজা এবং সাধকের এই বিরাট পূজার মধ্যে প্রভেদ অনেক। মহাপীঠে নাম কীর্ত্তন এবং কথকথা সুরু হ'ল সম্ভবতঃ ঝুলনের পরই এবং মহাদেবীর বোধন বসে গেল রাধা অষ্টমী থেকে। বোধন উৎসবের সূচনা দেখে মনে হ'ল এখনই এমন না জানি পূজা কিরূপ হবে। এইদিন থেকেই দুপুরে এবং রাত্রে কত লোক প্রসাদ পেত তার সঠিক সংখ্যা জানানো সম্ভব নয়।

যাই হোক, ক্রমশঃ দেবীদুর্গার মহাপূজার দিন ঘনিয়ে এল। সারা গৃহ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র ঠাকুর দালানের দৃশ্যও সামান্য লেখনীর দ্বারা সম্ভবপর নয়, কারণ এ যে কল্পনাতীত সমারোহ। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের পরিচয় দেখা গেল বিচিত্র আলপনায়।

কৃষ্ণনগর থেকে আনা বিশিষ্ট কারিগরের দ্বারা অতুলনীয় দেবী মূর্ত্তি সাধক পূজারীর সান্নিধ্যে যেন প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। ৺মায়ের সামনে "ঘট" বলতে যা বুঝায় তা দেখলাম না। সারি সারি প্রায় বারটি বৃহদাকার পিতলের ও তামার ঘট। সিন্দুরের দ্বারা স্বস্তিকা চিহ্নিত। মনে হয় মধ্যেরটিতে সশীষ ডাব ব্যতীত আর সবগুলিতে রাখাছিল নারিকেল, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ শুভ প্রতীক। আম্রপল্লব এবং বিজলীর আলো দুই মিলে সৃষ্টি করেছে নবরূপচ্ছটা। ক্ষত্রীয় কূল-চূড়ামণির মাতৃ আরাধনার সঙ্গে সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল।

বস্ত্রাচ্ছাদনের অভাবনীয় সমাবেশ, দ্বারদেশে দুইটি জলপূর্ণ বৃহৎ পিতলের ঘড়া এবং দুইটি কদলী বৃক্ষ শুধু মহামায়ার আগমনই ঘোষণা করছে না, জানাচ্ছে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সবাইকে সাদর স্বাগত, ভিতরে সামিয়ানা ঘেরা বিরাট প্রাঙ্গণে ফরাস পাতা, মধ্যে যজ্ঞকুণ্ড, যার চারিদিক ঘিরে বসে আছেন দ্বাদশ সুধীজন। আর সমবেত কণ্ঠে অনিবার ধ্বনিত হচ্ছে মহা ওঙ্কার রব। এই মহাযজ্ঞের মিলন ক্ষেত্রে উপনীত হ'য়ে মানুষ নিজের সত্ত্বাকে না হারিয়ে পারে না। জাতিভেদ থাকে না, তখন কেবলই মন হয় "এককে" নিবিষ্ট।

বিশ্বকবির উক্তির যেন পুনরাবৃত্তি ঃ—

"মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।"

এখানে আমিত্ব নেই, আমি কে? আজ মায়ের অভিষেকে তোমরা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমবেত হ'য়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে এই মহাপূজা সার্থক কর। তোমাদের পদরজঃ উৎসব ভূমি

নিষ্পাপ করুক। তোমাদের স্পর্শে মঙ্গল ঘট দশপ্রহরণধারিণীর আবাহনে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

পূজার কয়দিন কারুর অভুক্ত ফেরবার হুকুম নেই কাজেই পাতা করাই আছে, দিন রাতই নানা খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারী হচ্চে।

সামনের রাস্তায় ভীড়ের চাপে চলা কঠিন; সুতরাং দর্শনেচ্ছু জনতার শান্তি ভঙ্গ না হয় সেজন্য পুলিসবাহিনীও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

এই মহা উৎসব আমার গুরুভাইদের অনেকের হয়তো স্মরণ আছে কেননা এ দৃশ্য, এ ঘটনা ভোলবার নয়—তবে কালের পরিস্থিতিতে এবং দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এখন সেই অভূতপূর্ব্ব উৎসবের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

ধন্য তুমি মা, ছেলের মত ছেলের হাতে তুমি পূজা পেলে আর সার্থক জনম আমাদের যারা এই মহাযজ্ঞের কিছু অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপবাস ভঙ্গ ও জন্মোৎসব

সাধুবাবাকে দেখিবার পর হইতে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ঐ বালক চিত্তে আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল যে উহা অর্জনের আকাঙ্খা ও সাধনা আমাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছিল। তাঁহাকে দর্শনের পূর্বে গৌরাঙ্গরূপে আমার স্বপ্নে দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। কৈশোরের কল্পনা এবং আদর্শ কখন শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও সাধনায় রূপান্তরিত হয়।

পূজার পর একদিন ঠাকুর বলিলেন যে তিনি নগীনবাবার জন্য মায়ের নিকট তিন দিন হত্যে দিবেন। যজ্ঞকুণ্ডের পাশে হত্যে দিবার তৃতীয় দিনে সন্ধ্যায় অরুণদাকে বলিলেন, "অরুণদাদা, আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। মায়ের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করিলাম। মা কিছুতেই ছাড়িলেন না। নগীনবাবাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। তুমি গাড়ি ডাক, আমি কলিকাতায় যাইব।" সদর ঘরে পড়িতে পড়িতে শুনিলাম যে সাধুবাবা চলিয়া যাইতেছেন। ছুটিয়া আসিয়া দেখি ঠাকুরঘরের সামনে তিনি পায়চারি করিতেছেন। বলিলাম, "আপনি কলকাতা চলে যাচ্ছেন? তাহলে এখানে ভক্তদের দেখাশোনা করবে কে? আমাকে আপনি আপনার সব ক্ষমতা দিয়ে যান তাহলে আমি দেখাশোনা করব।" এত সরলমনে কথাগুলি বলিয়াছিলাম যে কি চাহিতেছি, কি বলিতেছি তাহা তখন জানিতাম না। ঠাকুর তাহার উত্তরে একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার এখন বয়স কত? তোমার ৩০ বৎসর বয়সের পর তুমি সব পাইবে। যাহা চাইবে তাহাই পাইবে। কিছু চিন্তা করিও না।"

গাড়িতে উঠিতে উঠিতে ঠাকুর বলিলেন, "অরুণদাদা, পরিতোষকে

দেখো। পরিতোষকে আমার দরকার আছে।" তখন রাত্রি নয়টা। পাড়ার নীবুদার ভাড়াগাড়ী করিয়া ঠাকুর কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

ঠিক দুইদিন বাদে শুক্রবার, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৭ সালে রাত্রি ৮-৩০ মিঃ ঠাকুরের নগীনবাবা ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

তাহার পর সাধুবাবা কালীপূজার আগের দিন আশ্রমে পুনরায় আসিলেন। কালীপূজার দিন শংকরদাকে আহিরীটোলায় কালীপূজা করিতে পাঠাইয়া ঠাকুর নৃপেনবাবাকে বলিলেন, "ভবানীপুরে আনন্দময়ী মা ও আরও দুইজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শুদ্ধাচারে দুইটি অন্ন রাঁধিয়া কাল রাত্রে এখানে লইয়া আসিবে।"

পরদিন কীর্ত্তন গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যার পর সাধুবাবা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অরুণদা, দাদু, শংকরদা, চক্রবর্ত্তীদা ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতেছেন। এমন সময় নৃপেনবাবা কালো পাথরের থালায় দুটি অন্ন একটি নূতন গামছায় বাঁধিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। "কে নেপেনবাবা এলে? দরজার সামনে ঠাকুরঘরে রকের উপর রাখ," ঠাকুর বলিলেন। স্থানটি পূর্বেই জল-হাত বুলানো ছিল। ঠাকুর সন্তর্পণে গামছাটি খুলিয়া পাথরের থালায় সজ্জিত অন্ন ৺মায়ের ঘটে নিবেদন করিলেন। তাহার পর আসন হইতে উঠিয়া সকলকে চমক লাগাইয়া থালা হইতে দুইচারিটি অন্ন মুখে দিলেন এবং কিছু অন্ন ছড়াইয়া দিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ যে যাহা পাইল কুড়াইয়া খাইলেন এবং গায়ে মাথায় পরমানন্দে মহাপ্রসাদী হাত বুলাইলেন। কালীপূজার পরদিন প্রতিপদে অন্নকূট উৎসব কাহারো স্মরণ ছিল না। ঠাকুর কিন্তু মাতৃ আদেশে অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অন্নগ্রহণের দিন ক্ষণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রত উদ্‌যাপনের কোন আড়ম্বর নাই, কাক-পক্ষীটিও টের পাইল না। কেবল তুমি জান ও আমি জানি আর যেন কেউ না জানে এই ভাব।

উহাই ছিল আশ্রমের প্রথম অন্নকূট উৎসব। পরমদয়াল ঠাকুর জীবের কল্যাণের ও সেবার জন্য ছয় মাস উপবাস ভঙ্গ করিলেন। তিনি জীবকে দয়া করিলেন। তবে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছিল।

অন্নগ্রহণের ও উপবাস ভঙ্গের সংবাদ বিদ্যুতগতিতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যে যেখানে শুনিলেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে শিষ্যভক্তগণ আশ্রমে আসিতে শুরু করিলেন। নিত্য উৎসব চলিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার শরীর সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরুদ্যমে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে গুরুগোবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রাণমাতানো কীর্ত্তন, নৃত্য, পূজা আরতি, প্রসাদ বিতরণ চলিতে লাগিল। নির্জন, নিস্তব্ধ বাগান সদা মুখরিত হইয়া রহিল। বেদপাঠ, কীর্ত্তন, হোম-যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, দিন নাই, রাত নাই চলিতে লাগিল। "এইখানে একটি হোমকুণ্ড" "ঐখানে একটি হোমকুণ্ড" করিয়া আশ্রমের সারা চত্বরে হোমকুণ্ড খনন করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। দিন-রাত সপ্তাহে, সপ্তাহ মাসে পড়িল। কাহারো আনন্দের আতিশয্যে খেয়াল নাই। অরুণদা কিন্তু ঠাকুরের শরীরের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়াছিলেন। একে অনশনের জের, উপরন্তু নাদ ও তানপূর্ণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্ত্তন, সমাধি, হোম, ভাবাবেশে উত্তাল নৃত্য এই সকল মিলিয়া শরীরের উত্তাপ সব সময় বাড়িয়াই থাকিত। সর্বোপরি রোগ-সারানো। শরীর মোটেই সুস্থ হইত না।

কখনও কখনও আশ্রম হইতে দুই একদিনের জন্য কোথাও গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপে ১৯৩৭ সাল অতিক্রম করিয়া ১৯৩৮এ পদার্পণ করিল। পৌষ সাক্রান্তির দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িল।

আশ্রমের চারিদিকে ভক্তবৃন্দ ফুল, বনমালা, কলাগাছদ্বারা সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সাধুবাবা তখন খুব কম কথা বলিতেন।

প্রচুর গাঁদা ফুল দেখিয়া বলিলেন, "সাদা কাপড়ের উপর গাঁদা ফুল দিয়া—নাম কর, প্রেমে থাক। জীবের সেবাই পরম ধর্ম—লিখ।"

জন্মোৎসবের দিন ঠাকুর ভোরে উঠিয়া মস্তক মুণ্ডন প্রভৃতি ক্ষৌর কর্ম করিয়া গরম জলে স্নান করিলেন। নূতন একখানি বস্ত্র দুই খণ্ড করিলেন। এক খণ্ড কোমরে ঘুরাইয়া পরিধান করিলেন অন্য খণ্ড হইতে এক ফালি ছিঁড়িয়া কৌপীন করিলেন এবং অবশিষ্ট গায়ে চাদরের ন্যায় বাঁধিয়া লইলেন। এই বেশে ঘাটের চাতালের উপর একটি আসনে বসিয়া রহিলেন।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বহু ভক্তের আগমন হইতে লাগিল। কিছু প্রসাদ গ্রহণের পর কীর্ত্তন শুরু হইল। আহা ঠাকুরের কি সুমধুর গলা—সে গলা এখনও কানে বাজে। ছয়মাস উপবাসের পর জীর্ণ শীর্ণ দেহে সেই সুমধুর মহাভাবের কীর্ত্তন এখনও সেইরূপ চোখে ভাসে। তাহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগ আরতির জন্য তাঁহার প্রিয় শিষ্য শান্ত-স্বভাব শংকরদা পূজা ও ভোগের দ্রব্যাদি লইয়া পূজায় বসিলেন। ঠাকুর আমার ঘাটের চাতালে আসনের উপর উপু হইয়া বসিয়া জোড়হাত করিয়া পূজারীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পূজা আরম্ভ হইল, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করা হইল। তাহার পর আরম্ভ হইল আরতি। সে যে কি আরতি লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। এদিকে পুরাদমে "ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি" আরতির গান চলিতেছে। অন্যদিকে প্রিয়শিষ্য পূজারীর নয়ন শ্রীগোবিন্দের নয়নের সহিত মিলিয়া একপ্রাণ একাত্মা হইয়া যেন কোন সুদূর দেশে দুইজনে পাড়ি দিতেছেন। স্বপ্নে, যেমন বহুদূর দেশান্তর পাহাড় পর্বত ডিঙ্গাইয়া সুদূর প্রান্তে চলিয়া যাওয়া যায় সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান করিয়া প্রিয়শিষ্যকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, শিষ্যের ঈপ্সিত বস্তুকে দর্শন করাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সেই উপু হইয়া বসা অবস্থায় শূন্যে উপরদিকে উঠিতে শুরু করিলেন। আহা সে যে কী স্বর্গীয় অবস্থা! মহাভাবে মহাযোগী যেন তাঁহার অন্তরঙ্গদের ভিতর লীন হইয়া যাইতে চাহিতেছেন। এইরূপ অপলক নেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি চলিল। শেষে পুষ্প আরতির সময় আরম্ভ হইল মহাভাবে নৃত্য। সে নৃত্য যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে। দেহ হইতে শ্বেত শুভ্র জ্যোতি বাহির হইতেছে। সেই মুহূর্ত্তে আকাশে বাতাসে একটি কিরূপ সুগন্ধ বায়ু কেদার গঙ্গার ঘাটের চাতাল বৈকুণ্ঠে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। প্রতি রোমে রোমে ঠাকুর বিরাজ করিতেছিলেন। তাহার পর গড়াগড়ি, সমাধির অবস্থা। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে দিনে ও রাত্রে দুইবার—তিন দিনে মোট ছয়বার আরতি হইল।

জন্মোৎসব অতীব আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সর্বশ্রী পশুপতিনাথ দেব, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কিরণ বসু, ডাঃ পুলীন সিংহ, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, চুনিলাল ভট্টাচার্য্য, মোহরলাল ভট্টাচার্য্য, সুশীলাবালা দেবী (সাধনমা) অমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুধীর কুমার বসু, দুলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব সাহা, বিজয়কুমার ঘোষাল, শম্ভুপ্রসাদ ঘোষাল প্রভৃতি সপরিবার ও সবান্ধব জন্মোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সর্বশ্রী নন্দীমশাই, নৃপেন্দ্রনাথ সেন, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, বেলদা প্রভৃতি ও ত্যাগী ভক্তদের ভিতর দাদু, শংকরদা, অরুণদা, শীতলদা, অদ্বৈতদা সব সময় সেবাযত্নে ও নামপ্রেমে আশ্রম মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি, তুলসী, মটর, মাষ্টার প্রভৃতি নবীনদের মধ্যে ছিলাম।

জন্মোৎসবের কিছুদিন পর শ্রীশ্রীঠাকুর অরুণদার সহিত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বিজয়নগর রাজ্য, তিরুপতি, মাদ্রাজ, শ্রীরঙ্গম, নাসিক, ভুবনেশ্বর

পুরী, কটক হইয়া প্রায় চারমাস ভ্রমণ করিয়া কিছু সুস্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সেই সময়কার ডায়েরীর কয়টি পাতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

অরুণদার ডায়েরী

নাসিক, পঞ্চবটী, বৃহস্পতিবার, ৯ই জুন, ১৯৩৮

আজ সকাল হইতেই বেশ বর্ষণ আরম্ভ হইল এবং সমস্ত দিন রহিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একটু ধরণ ধারণ করিলে গোদাবরী তীরে বেড়াইতে যাইলাম। বর্ষার দরুণ নদীর দুই কূল ছাপাইয়া গিয়াছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে জল আসিয়া নদীতে পড়িতেছে। আজিকার এ দৃশ্য আমার খুব মনোমত হইল। বৃষ্টির ভয়ে লোক-সমাগম খুব অল্প হইয়াছে, সেই জন্য বেশ নির্জ্জন বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নদীর জলের স্রোত দেখিতে লাগিলাম। কুলকুল ধ্বনি করিয়া নদী আজ আপন মনে বহিয়া যাইতেছে দেখিলাম। বৃষ্টির দরুণ দাদাকেও আজ আর কেহ দর্শন করিতে আসিল না। Bangalore হইতে একখানি পত্র আসিল; ভিজিয়ানাগ্রামের রাণীমাতা ডাক্তার সাহেবকে লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি স্বামীজীকে (দাদাকে) শীঘ্র Bangalore-এ লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন এবং স্বামীজীর এই অসুস্থ শরীরে যাহাতে কোনরূপ কষ্টবোধ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া যত্ন লইতে লিখিয়াছেন। আমার নামেও তিন খানি পত্র আসিল। একখানি রাঘব আচারীর নিকট হইতে, আর একখানি কুতুদার নিকট হইতে এবং তৃতীয় খানি কচিদার (ছোট চক্রবর্ত্তীদা) নিকট হইতে। রাঘবাচারী দাদাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু কি করিবে, হাত পা বাঁধা, আসিবার উপায় নাই। কুতুদা লিখিয়াছে আমাদের অমরনাথ যাওয়া উচিত। আর কচিদা লিখিয়াছে তাহার বড়ভাই মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, এমত অবস্থাতেও তাহাকে দুঃখের সহিত চলিয়া আসিতে হইয়াছে; ...... আজ রাত্রে কীর্ত্তনের পর দাদার গা আবার বেশ গরম বোধ

হইল ; তিনি কিছুতেই temperature লইতে দিলেন না। দাদার পিঠে ও হাতে কতকগুলি ফুসকুড়ি বাহির হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন ওগুলি মশার কামড়। গত শনিবার একজন ready-made মশারি বিক্রী করিতে আসিয়াছিল ; দাদা শনিবার বলিয়া মশারি কিনিতে দিলেন না। তাহাকে তৎপরদিবস আসিতে বলিলাম, কিন্তু সেই হইতে সে আজ পর্য্যন্ত আর আসিল না। এদিকে মশার কামড়ে দাদার পিঠে বেশ দাগড়া দাগড়া হইয়া উঠিয়াছে। …………কীর্ত্তনের সময় আজ ডাক্তার সাহেবের সুন্দর জ্যোতিঃ দর্শন হইল।

শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৯৩৮

আজ নম্মা আলোয়ারের জন্মতিথি, সেই উপলক্ষে রঙ্গচারী বাবা আমাদের অন্ন ব্যতিরেকে পুলিহোরা ও পতুকুপঙ্গলি নামক দুই প্রকার মাদ্রাজী Dish প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন ; খাইতে মন্দ লাগিল না। রঙ্গচারী বাবার হাতের রান্না চমৎকার ; তবে প্রথমতঃ এই সব রান্না খাইয়া অভ্যস্ত হইতে হয়, তাহার পর উহার taste উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইবার লইয়া আমরা তিন তিন বার মাদ্রাজী খানায় অভ্যস্ত হইতেছি। কাজেই তাহাদের রান্নায় তারতম্য বোধগম্য হইতেছে। বাঙ্গালীর পক্ষে সাধারণতঃ এ সকল রান্না রুচিকর হইবে না ; ………………রঙ্গচারী বাবার এই সকল প্রস্তুত করিতে বেলা ১টা বাজিয়া গেল। দাদা ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া রঙ্গচারী বাবার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাসম্ভব আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দাদার এই অসুস্থ শরীরে এত বেলায় খাইতে বড়ই কষ্টবোধ হইতেছে কিন্তু উপায় কি? রঙ্গচারী বাবা নিজেই অসুস্থ ; তাহার উপর প্রত্যহ আমাদের চার জনের রান্না করিতে হইতেছে। সমস্ত গুছাইয়া রান্না করিতে কাজেই তাহার ১২টা বাজিয়া যাইতেছে। আজ দুখানি পত্র পাইলাম, একখানি দাদুর অপরখানি

ডাক্তারদার। সকাল হইতে যদিও আজ বৃষ্টিপাত হইতেছে না, তবুও আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে আবার রৌদ্রও উঠিতেছে; কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। .... ডাক্তার সাহেব আজ সকালে বসিয়া বসিয়া আগামী বৎসরের গ্রীষ্মকালে তাঁহার পরিবারকে ও দাদাকে লইয়া Southern India ও দ্বারিকায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে তাঁহার ছোট মোটরখানি বদলাইয়া একখানি 8 seater bus ক্রয় করিবেন এবং সেই bus-এ চড়িয়াই এই সমস্ত তীর্থস্থান পরিদর্শন করিবেন। এক বৎসর পূর্বের কথা আগে হইতে বলা কঠিন তবে ভগবান ইচ্ছা করিলে সমস্তই সম্ভব। তাঁহার বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে? নতুবা কোথায় বাঙ্গলা দেশের বাক্‌সাড়া গ্রাম আর কোথায় তিরুমালাই পর্বতের অধিপতি শ্রীশ্রীভেঙ্কটেশ্বর। ডাক্তার সাহেবের মত শ্রীশ্রীভেঙ্কটেশ্বরের একান্ত ভক্তের মনে কে প্রেরণা দিল—যাহাতে ডাক্তার সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াই দাদাকে সেই অসুস্থ অবস্থাতেও টানিয়া লইয়া সেই তিরুমালাই পর্বত শিখরে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন! আবার ডাক্তার সাহেব কোথায় হিমালয় পর্বতে যোশীমঠে কিছুদিনের জন্য সাধন ভজন করিতে যাইবেন না পথিমধ্যে পঞ্চবটীতে আসিয়া শ্রীশ্রীভেঙ্কটেশ্বরের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত অনুযায়ী এই স্থানে স্থগিত হইয়া গেলেন এবং কেমন রঙ্গচারী বাবা ও আমরা দুই জন একে একে আসিয়া মিলিত হইলাম। দাদার শরীর ইতিমধ্যে আবার ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং বায়ু বদল উপলক্ষেই দাদা, আমি, ডাক্তার সাহেব ও রঙ্গচারী বাবার সহিত মিলিত হইলাম। দুই মাস পূর্বে এ সকল ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমরা কেহ আশাও করি নাই। ডাক্তার সাহেব ও রঙ্গচারী বাবা দুইজনে মিলিয়া এই সময়ে হিমালয়ে যোশীমঠে যাইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু দাদা ও আমি তাঁহাদের সহিত এত শীঘ্র মিলিত হইব

এরূপ কোন আশাই ছিল না। কিছুদিন পূর্বে যখন দাদার সহিত কাঞ্চী গিয়াছিলাম তখন কেবল দেশ ভ্রমণই সার হইয়াছিল; দাদা ২৪ ঘণ্টার বেশী কাঞ্চীতে কাটাইতে পারেন নাই; কারণ সে স্থান তাঁহার মরুভূমি-তুল্য বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এবার তিরুমালাই গিয়া দাদা সাত দিন সেই পর্বতোপরি ভক্ত সঙ্গে মহানন্দে দিন যাপন করিয়াছেন; এবং সেই হইতেই ডাক্তার সাহেবও দাদার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই সমস্তই সেই শ্রীশ্রীভেঙ্কটেশ্বরের কৃপায় হইতেছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

শনিবার, ১১ই জুন, ১৯৩৮

আজ দাদুকে (তথা শঙ্করকে পরিতোষকে) ও রাঘবাচারীকে দুখানি পত্র দিলাম। আজ উঠতে একটু বিলম্ব হইল। ভগবানকে ধন্যবাদ; দাদার আজও জ্বর হয় নাই। সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম এখানে একটি sanatorium আছে; নাম Seth Bhagwan Dass Chowani Sanatorium. আবার একটা Leper Asylumও আছে। তবে সে সম্পূর্ণ অন্য দিকে। দাদার সহিত আজ সন্ধ্যার সময় নাম কীর্তন করিবার সময় যখন 'রাধে রাধে গোবিন্দ জয়' গাহিতেছি তখন মনে হইতেছিল যেন অপর একটি মূর্তি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) আমাদের গানের সহিত নৃত্য করিতেছেন। মনে বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছিল। ইংরাজিতে যাহাকে বলে 'exhiliarating sensation'। দাদার আর এস্থান ভাল লাগিতেছে না। তিনি এখন হইতে দ্বারকা যাইবার জন্য বলিতেছেন। দ্বারকা ও প্রভাস Kathiawar state-এর অন্তর্ভুক্ত। দাদার দুইদিন জ্বর হয় নাই দেখিয়া ডাক্তার সাহেবের মুখে হাসি ফুটিল, নাহলে বেচারী ভদ্রলোক দাদার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলেন। এখানে আজ ১৪ দিন আসা হইয়াছে। আমার কোনই অনুভূতি হইল

না। মনে কেবলই প্রশ্ন হইতেছে তবে কি শুধু শুধুই এত দূর আসা হইল? আবার মনই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছে "ইহারই মধ্যে অস্থির হইও না; স্থির চিত্তে দেখ শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।" আজ মাঝে মাঝে বেশ ঝোড়ো বাতাস বহিতেছে। আজ দুইদিন যাবৎ নীলকুটির রবিদার নিকট হইতে আমার পত্রের উত্তর আশা করিতেছি; কিন্তু রোজই বিফল মনোরথ হইতে হইয়াছে। দাদাকে দর্শন করিতে স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষেরা সেই যা দুই দিন আসিয়াছিল; আর তাহার পর হইতে কেহই আসিতেছে না। এই বাটীর দ্বারবান্ বা মালীর নাম ত্র্যম্বক; সে বেশ সরল প্রকৃতির লোক এবং বিশ্বাসী। সে স্থানীয় দোকানে মোট বহার কাজ করে। সকালে ৮টার সময় কাজে যায় এবং ১২টার সময় আহার করিতে ফিরিয়া আসে; পুনরায় ২টার সময় যায় এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে; এখানে সন্ধ্যা মানে ৭৷৷০টা। কলিকাতার সময় তখন রাত্রি ৮টা।

ত্র্যম্বকের পরিবারের নাম চন্দ্রভাগা, তারও গতর খুব; বেশ মোটাসোটা ও সদাই প্রফুল্ল বদন। ত্র্যম্বকের শাশুড়ীর নাম কাশীবাঈ; এই বৃদ্ধা যখন কথা বলে (গোঁও কথা কিনা) তাহার বিন্দু বিসর্গও আমরা বুঝিতে পারি না। ত্র্যম্বকের একটি পুত্র আছে; বয়স ৬।৭ বৎসর; বেশ বুদ্ধিমান। তাহার বা তাহার মাতার পিতার হিন্দুস্থানী ভাষা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। দাদা ত্র্যম্বকের পুত্রের সাদি দিয়া তবে এস্থান হইতে নড়িবেন; দাদার এরূপ কথাবার্তায় ত্র্যম্বক পরিবার দাদার উপর বড়ই সন্তুষ্ট এবং প্রাণপণে ইহারা সকলেই দাদাকে সেবা করিতে ও দাদার আজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকে।

সোমবার, ১৩ই জুন, ১৯৩৮

আজ এই ঠিকানায় সর্বশুদ্ধ চারখানা চিঠি আসিল; দুইখানা

আমার নামে এবং অপর দুইখানির মধ্যে একখানি Nellimanla হইতে রঙ্গচারীবাবার নিকট আসিয়াছে, অপরখানি ৺কাশী হইতে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের নিকট হইতে Dr. Iyenger-এর নিকট আসিয়াছে। শুনিলাম মহারাজকুমার এখানে কোন বিখ্যাত জ্যোতিষী আছেন কি না জানিয়া পাঠাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের জন্মপত্রিকা (Horoscope) পাঠাইয়াছেন। শুনিলাম মহারাজকুমারের এ বিষয়ে খুব সখ আছে; সেই নিমিত্ত এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। রঙ্গচারীবাবার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতাকে পত্র লিখিয়াছে; তাহাতে বাটীর সকলে ভাল আছে এ সংবাদ জানাইয়াছে। আমার নামে দুইখানি পত্রের মধ্যে বাকসাড়ার রবিদার নিকট হইতে একখানি এবং অপরখানি বাপিদার নিকট হইতে আসিয়াছে। রবিদার পত্র দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ; আর বাপিদার পত্রে জানিলাম তাঁহার আর একটি কন্যা সন্তান হইয়াছে। দাদা একথা শুনিয়া বলিলেন, "তিনটি কন্যা দান; এবার কি কেবল মেয়ে হইবারই হাওয়া আসিয়াছে?" অর্থাৎ, আমরা কলিকাতা হইতে আসিবার পূর্বে পশুপতিবাবুর মধ্যমপুত্রের একটি রত্ন হইয়াছে। এখানে মানকচু গাছের মতন একপ্রকার গাছ আছে; তাহাকে ব্রহ্মরাক্ষস বলে। দাদা আজ সেই গাছের পাতা গরম করিয়া পায়ের চেটোয় তাপ লাগাইলেন। কারণ তাঁহার পায়ে আজ কয়দিন যাবৎ ব্যথা অনুভব করিতেছেন। এই গাছের পাতা গরম করিয়া লাগাইলে নাকি আরাম হয়, তাই এইরূপ করিলেন। ছোটছেলে শঙ্কর আসিয়া দাদাকে বিজ্ঞের মত বলিল, "পান্‌কা পাত্তাকা মাফিক ইস্‌পর ঘি লাগাইকে আগপর গরম কর্‌কে গোড়মে বান্ধ রাখনে হোগা তব ঠিক হোগা।" আর একসময় সে দাদাকে বলিল, "আরতি সম মে তুম্‌ মেরী ভাষা বলতে হুঁ, দোসরা বকত ক্যাহে নেই বোলতে?" বিকালবেলা Mr. Ojha আসিয়া All Faith Conference-এর একখানি পুস্তিকাকারে ছাপান report দিয়া গেলেন।

আজ কীর্তন অল্পক্ষণব্যাপী হইল। দাদা গতরাত্রে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলিলেন। তাহা এইরূপ :—

"আমি যেন কোন শ্মশানে বসিয়া আছি; আমার সামনে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের শব দাহ হইতে লাগিল। এমন সময়ে তথায় একটি বৃদ্ধ আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "আপনি তো স্বয়ং হর, আপনি ইচ্ছা করিলে পার্বতী দেবীকে পার্শ্বে আনয়ন করিতে পারেন। আমি এতদিন ধরিয়া এই যুগল মূর্ত্তি দেখিব বলিয়া ধ্যান করিতেছি।" বৃদ্ধের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তথায় এক প্রকাণ্ড বৃষ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমি সেই বৃষের উপর চড়িয়া বসিবামাত্র আমার কলেবর সম্পূর্ণ মহাদেবের রূপ ধারণ করিল; এবং তৎপরেই দেখি স্বয়ং পার্বতী এক সিংহোপরি আরোহণ করিয়া আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ এই যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া বলিল, "আজ আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে; এইবার এই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু হউক কিন্তু তাহা হইল না।" দাদা বলিলেন. স্বপ্নটি এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তৎপরে আবার খানিকবাদে বলিলেন, "বোধহয় গৌরীবাবার মা দেহরক্ষা করিল; এখনই তার করিয়া খবর লও।" আমি এখনই পত্র লিখিতেছি; তার পাইয়া গৌরীবাবা হয়ত nervous হইয়া পড়িবে। Sri Gouranga: The Man (By Durga Chaitanna Bharati) নামক পুস্তকখানি যতই পাঠ করিতেছি ততই ভাল লাগিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন পাঠ করিতে কাহার না ভাল লাগিবে! এই পুস্তকের লিখিত শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ঘটনাগুলির সহিত দাদার কার্য্যকলাপের সহিত অনেক ক্ষেত্রে এতই সাদৃশ্য রহিয়াছে যে পুস্তকখানি আমি একবার আদ্যপান্ত পাঠ করিয়াও পুনরায় পাঠ করিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গের আকৃতির সহিত তুলনা করিলে দাদার সহিত কোথাও মিল হইবে না; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রকৃতি ও আমাদের দাদার

প্রকৃতি দুই-ই এক। ৪৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল; তখন একজোড়া জগাই মাধাই-ই যথেষ্ট ছিল। আজ ৪৫০ বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গের পুনঃ আবির্ভাব হইলে তাঁহাকে আর সেরূপে আসিলে চলিবে না। দাদা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলেন, "এখন প্রতি গৃহে একজোড়া করিয়া জগাই মাধাই বিরাজ করিতেছে, সেই হেতু এ যুগের শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রতি গৃহে গিয়া জগাই মাধাই উদ্ধার করিতে হইবে।"

মঙ্গলবার, ১৪ই জুন, ১৯৩৮

আজ আর আমাদের কাহারও নামে কোন পত্র আসিল না। বেলা ১০টার সময় Mr. Ojha দুইটি ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া দাদাকে দর্শন করিতে আসিলেন। ইহাদের একজনের নাম Mr. Dibakar. তিনি নিজের মুখে নিজের গুণপণার পরিচয় দিলেন যে তিনি একজন জ্যোতিষী এবং তিনি শব্দের Vibration Theory অনুসরণ করিয়া সমস্ত প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। আমরা মুখে যে শব্দ বাহির করি (বা বাক্য উচ্চারণ করি) তাহা যদি ঠিক বিশুদ্ধ ভাবে করি তাহা হইলে আমাদের মুখনিঃসৃত শব্দগুলি মন্ত্র ঔষধির মত কার্য্য করিবে। ভিন্ন ভিন্ন রোগের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ আছে, তেমনি ইহার মতে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের প্রয়োগ করিতে হয়। তবে সে সকল অক্ষরের অর্থবোধ ইনি অনেক গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন। আমি যখন বলিলাম: "What you are aiming at is our 'বীজাক্ষরম্'," তখন তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ, কতকটা তাহাই বটে।' যাহা হউক, প্রথমতঃ তিনি জ্যোতিষ শুনিয়া তাঁহাকে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের প্রেরিত তাঁহার জন্মপত্রিকা দেখিতে দেওয়া হইল। তিনি তাহা অল্প নিরীক্ষণ করিয়াই বলিলেন, "It is a most ordinary Horoscope, there is nothing extraordinary in it." তবে তিনি এই কুষ্ঠি বিচার করিতে করিতে

বলিলেন, "ইহার কি দুইবার বিবাহ হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে তাহা এই কারণে হয় নাই।" যাহা হউক শুনিলাম মহারাজকুমারের সত্যসত্যই একটা বিবাহ সত্ত্বেও, আর একটি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেও বিশেষ বিলম্ব হইত না, যদি না আমাদের ডাক্তার সাহেব গিয়া সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতেন। যাহা হউক, দাদা এবার তাঁহার Vibration Theory লইয়া পড়িলেন। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিতে পারেন আমার কি রোগ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "আপনার kidney trouble হইতে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে।" দাদা উত্তর দিলেন, "না আমার kidneyর কোনরূপ গোলমাল হয় নাই; আমার liver এর গোলমাল হইয়াছে।" তাহাতে Mr. Dibakar বলিলেন; "না, আপনার kidney trouble হইতেই হইয়াছে। আমি শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে আপনার kidney trouble হইতেই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। Kidney হইতে বাহাত্তর প্রকার রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। আমার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা বলিতেছি।" ভদ্রলোক জানে না যে আমাদের সহিত একজন সুদক্ষ ডাক্তার রহিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ ভাবে কথা বলিতে সাহস করিতেন না। ....Mr. Ojhaর এই সকল কথাবার্ত্তায় দাদার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিল, ফলে বেলা ৩টার সময় হইতে তাঁহার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হইতে লাগিল এবং বেলা ৫টার সময় একটু বমি করিয়া কিছু উপশম বোধ করিলেন। দাদা সেই সময় বলিলেন, "এ স্থান আর ভাল লাগিতেছে না, অন্যত্র কোথাও চল।"

এই বর্ষাতে কোথায় বা তাঁহাকে লওয়া যায়? কিন্তু তিনি যেরূপ অস্থির হইয়া উঠিতেছেন, তাহা হইতে বোধ হয় শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। দাদাকে অসুস্থ দেখিয়া ডাক্তার সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকে একজন ডাক্তার আনাইবার

কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে nervous হইতে বারণ করিলাম এবং বলিলাম দাদার এ'ভাব কিছু বাদেই কাটিয়া যাইবে; তখন আবার তাঁহাকে কীর্তন করিতে দেখিতে পাইবেন। হইলও তাই, দাদা কিছু বাদে বেশ কীর্তন সুরু করিলেন।

বৃহস্পতিবার, ১৬ই, জুন ১৯৩৮

আজ সকালে আমার নামে দুইখানি চিঠি আসিল, একখানি বীরেশ্বর বাবুর, আর একখানি বড়দার। বীরেশ্বর বাবু দাদার ঠাট্টা বুঝিতে না পারিয়া টাকা পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং শীঘ্রই টাকা যেমন করিয়া পারেন দাদাকে পাঠাইতেছেন। আমি পত্রপাঠ তাঁহাকে টাকা পাঠাইতে নিষেধ করিলাম। দাদা ঠাট্টা করিয়া বীরেশ্বর বাবুকে লিখিয়াছিলেন—"১০১ টাকা পাঠাইতে পারো ত শরীর সারে।" বড়দার পত্রে জানিলাম পশুপতিবাবুর শরীর ভাল নাই, এবং সেই সঙ্গে ভানুবাবুর পত্রে জানিলাম বড়মা দাদার দ্বারা পূজিত সেই কৃষ্ণঠাকুরটির নাম শ্রীশ্রীগোবিন্দজী রাখিয়াছেন এবং সেই ঠাকুরটির জন্য একটা সুন্দর সিংহাসন কিনিয়াছেন।

আজ আমাদের জন্য ওভালটিন, কোকো, কফি, চা প্রস্তুত, যাহার যাহা ইচ্ছা পান কর। আমি একটু কফি পান করিয়া দেখিলাম। ভানুবাবুর পত্রের আলোচনা করিতে করিতে দাদা এই শুনিলেন যে এই স্থান হইতেই সীতাহরণ হইয়াছিল। তিনি জানিতেন এইস্থানে সুর্পণখার নাক কাটা হইয়াছিল। এস্থান হইতে শ্রীরামচন্দ্র সীতান্বেষণে পম্পাই সরোবরের তীরে গিয়াছিলেন, এবং সেইখানেই হনুমানের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দাদা, সীতাহরণ কোন মাসে হইয়াছিল, রঙ্গচারীবাবাকে তাহা জিজ্ঞেস করিলেন। রঙ্গচারীবাবা বলিলেন—"ও বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে; কেহ বলেন পৌষ, কেহ বলেন মাঘ, আবার কেহ কেহ বলেন ফাল্গুন মাসে হইয়াছিল।" দাদা যখন শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পূজার কথা উত্থাপন করিলেন, তখন ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "আসল বাল্মীকি রামায়ণে

শ্রীরামচন্দ্রের কোনরূপ পূজার কথা উল্লেখ নাই। তবে তিনি তীর্থস্থানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন, এইমাত্র উল্লেখ আছে। বাল্মীকি রামায়ণে আর এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে তিনি যখন সীতা-উদ্ধার করিয়া রামেশ্বর দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি সীতাদেবীকে ঐ স্থান দেখাইয়া বলেন যে মহাদেব ঐ স্থানে তাঁহার উপর সদয় হইয়াছিলেন।" ডাক্তার সাহেব বলেন যে রামশ্বরে যে শিব আছে তাহা কখনই শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত হয় নাই। আমি ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আমরা শুনিতে পাই যে, রাবণ বধ করিবার জন্য তিনি শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিয়া মহানিপাত অস্ত্র লাভ করেন?" ডাক্তার সাহেব উত্তর করিলেন, "এ সমস্ত কিছুই সত্য নহে (যদি বাল্মীকির কথা বিশ্বাস করিতে হয়)। অগস্ত্য মুনি আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে অস্ত্র দিয়া যান। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ হইয়া আবার কাহার পূজা করিবেন? সেই নিমিত্ত বাল্মীকি কোথাও শ্রীরামচন্দ্রের অন্য দেবদেবীর পূজার কথা উল্লেখ করেন নাই। বাংলাদেশে কোথা হইতে এই দেবী পূজার প্রচলন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার রামায়ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, যাহা কিছু জানি সবই শুনিয়া শেখা। যাহা হউক, আপনারা যেমন "নারায়ণ" নামে তৃপ্তি পাইয়া থাকেন, আমরা তেমনি "মাতৃ" নামে তৃপ্তি পাই। ভারতবর্ষের মধ্যে বোধহয় একমাত্র বাংলাদেশেই মায়ের পূজা হইয়া থাকে, সেই হেতু তাহাদের কাছে 'মা' নামের চেয়ে মধুর ভাব আর কিছুই নাই।" ডাক্তার সাহেব বলিলেন—"আমাদেরও নারায়ণকে পাইতে হইলে 'শ্রী'দেবীর পূজা আগে করিতে হয়।" আমি বলিলাম—"তাহা হইলেও আমাদের দেশে যেমনভাবে মাতৃপূজা হইয়া থাকে, আপনাদের দেশে তাহা হয় না।" ডাক্তার সাহেবের সেই কথা—"আমি নারায়ণ ভক্ত; আমি নারায়ণকে পূজা ও ধ্যান করিয়া যেন জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারি, কাজ কি আমার অন্য দেবদেবীর কথায়? আমি

একান্তমনে শ্রীমন্ নারায়ণের ধ্যান করিব, আমি সেখানে এক মুহূর্ত্তের তরেও অন্য দেবদেবীর মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া বিঘ্ন ঘটাইব না। আমি এই জন্যই অন্য কোন মন্দিরে যাই না।" এসব বলিয়া ডাক্তার সাহেব আরও বলিলেন, "তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে যে মহারাজকুমারের সহিত আমি যখন বিলাত গিয়াছিলাম, তখন আমাকে একদিন তাঁহার ৺কালীপূজা করিতে হইয়াছিল।" ডাক্তার সাহেবের এই সব কথা হইতে এক একবার মনে হয় তিনি বুঝি গোঁড়া হিন্দু, কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে যতদিন আসিয়াছি, ততদিনই তাঁহাকে একজন উঁচুদরের প্রেমিক বলিয়াই ধারণা হইয়াছে।

হরি ও হরের প্রভেদ লইয়া সকালটা একরূপ কাটিল মন্দ না। বিকেলবেলা দাদা Temperature লইলেন—৯৭·৮ উঠিল। দাদা এই সময় এখনও শরীর ভারী বোধ করিতেছেন। দাদাকে কবিরাজী ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিতে, তিনি অমত করিলেন। সন্ধ্যাবেলা গোদাবরী তীরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম যে নদীতে খুব জল বাড়িয়াছে এবং সমস্তই জলে ডুবিয়া রহিয়াছে……………।

সন্ধ্যাভ্রমণ করিয়া আসিয়া দাদার সহিত কীর্ত্তন করিলাম। ডাক্তার সাহেব, এক বিড়াল জানলার উপর উঠিয়া চড়াই পাখী শিকার করিবার চেষ্টা করায় তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল এবং তিনি তাহার বাড়ীর কথা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*

দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কলিকাতার বিখ্যাত শ্রীরামদুলাল সরকারের পৌত্র শ্রীপশুপতিনাথ দেব ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে তাঁহাদের বিডন ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর সংযোগস্থলে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং একনাগাড়ে চার চার মাস সেবা করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

তুলসীদাস ও গায়কদের আগমন

বাক্সাড়ায় আবির্ভাবের সময় হইতে আমি যেমন আশ্রমের নিকটতম প্রতিবেশী হইয়া ঠাকুরকে পরদিন পুকুরে মুখ ধুইতে গিয়া দর্শন করিয়াছিলাম সেইরূপ পাড়ার শ্রীতুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন বাদে দুর্গাপূজার পরে পাড়ায় সাধু আসিয়াছে চল্ দেখিতে যাই—এই মনোভাব লইয়া একদিন ফুটবল খেলার পর 'কেদার কাননে' সন্ধ্যাবেলা আসিয়া হাজির হয়। ১৯৩৬ সালে দোল পূর্ণিমার দিন (২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪২) তাহার পিতা ৺মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় অকস্মাৎ বেলা দেড় ঘটিকায় দেহত্যাগ করেন।

তুলসীর নিজের ডায়েরী হইতে স্ব-রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। পিতা ধার করিয়া আমার উপনয়ন দিয়াছিলেন এবং দণ্ডি ভাসাইবার দিন দোল পূর্ণিমায় অকস্মাৎ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং অর্থাভাবের দরুণ বিদ্যাভাস ত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের জন্য ঘড়ির কাজ শিখিতে বাহির হইলাম। বন্ধুবান্ধব সকলই বর্ত্তমান। বৈকালে ফুটবল খেলিতে যাইতাম। পাড়ায় সাধু আসিয়াছে ও সাধু সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে উপরদিকে শূন্যে উঠে এই কথা শুনিয়া আমরা কয়বন্ধু সন্ধ্যাবেলা ফুটবল খেলার পর ঐ আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে বাগানে গেলাম। এই বাগানে আমরা ঢিল ঢিল্ল খেলিতাম। গিয়া দেখিলাম, প্রায়ান্ধকারে সাধু ধ্যান করিতে করিতে একধারে হেলিয়া পড়িলেন। শূন্যে উঠিলেন না। দ্বিতীয় দিনও পূর্ব্বের ন্যায় হেলিয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিনে ধ্যান করিতে করিতে আমার দিকে

বড় বড় চোখ করিয়া এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। আমি সাধু ভস্ম করিয়া দিবে এই ভয়ে পলাইয়া গেলাম। চতুর্থ দিনে সাধু অরুণদাকে ইসারা করিয়া দেখাইয়া কোনে রাখা একটি টিফিন ক্যারিয়ারে যাহা রাখা ছিল উহা আমাদের দিতে নির্দ্দেশ করিলেন। অরুণদা ঐ কৌটা হইতে নাড়ু কিস্‌মিস্ পেস্তাবাদাম প্রভৃতি অল্প করিয়া দিলে সাধু আমাদের উহা সব দিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমরা মহা আনন্দে উহা গ্রহণ করিলাম।

দিন পনেরো এইরূপ চলিবার পর একদিন দেখি সাধু আর ইঙ্গিত করিতেছেন না। ঐদিন বুঝি আমাদের ভাগ্যে কিছু জুটিবে না এই মনে হইবার কিছুক্ষণ পর উনি নিজে আসন হইতে খুব সন্তর্পণে উঠিয়া টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাক্‌না খুলিয়া আমাদের হতাশ করিয়া মুঠা মুঠা ঐ সকল মেওয়া পুকুরে ফেলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে টিফিন ক্যারিয়ারটিও জলে ফেলিয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম এই রে, উপোসে সাধুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সাধু ঘাট হইতে হাত দুইটি মাথার উপর করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আমরাও পাগলকে বাঁচাইবার জন্য সকলে জলে নামিয়া পড়িলাম।

পরদিন আমরা পুনরায় সাধুকে দেখিতে আসিলাম। সেদিন সাধু ইঙ্গিতে আমাদের কাছে ডাকিয়া হাততালি দিয়া আমাদের "রাধে রাধে বল, প্রসাদ দিব" ক্ষীণস্বরে এইরূপ করিতে বলিলেন। আমাদের প্রলোভিত করিয়া জোর করিয়া "রাধে রাধে" বলাইলেন এবং কোলের বাটি হইতে নাড়ু ও মেওয়া আমাদের দিলেন এবং আমরাও প্রতি সন্ধ্যায় হাততালি দিয়া "রাধে-রাধে" করিতে শুরু করিলাম।

মাস-খানেক বাদে বাড়ীতে খবর গেল যে সাধুর বাগানে তুলসী, নিতাই, দুলাল, বীজু, মনা প্রভৃতি ছেলেরা গিয়া "রাধে গোবিন্দ" করিতেছে।

বাগানের পরিবেশ ও সাধুর এবং অরুণদার স্নেহ ভালোবাসায় নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছিলাম।

১৯৩৮এর জন্মোৎসবের পর একদিন গভীর রাত্রে আমার পায়ের আঙুল-হাড়ার যন্ত্রণায় থাকিতে না পারিয়া 'কেদার-কাননে' আসিয়া যজ্ঞকুণ্ডের পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। "কে?" সাধুবাবা বলিয়া উঠিলেন। "আমি তুলসী" উত্তর দিয়া তাঁহাকে যন্ত্রণার কথা বলিতে তিনি নিকটে ডাকিয়া আমার পায়ের কড়ে আঙুলে চরণ দিয়া চাপিয়া ধরিলেন এবং নিমেষে আমার জ্বালা যন্ত্রণা অদৃশ্য হইল। তাহার পর উনি বলিলেন, "বাড়ি যাইও না, এইখানে শুইয়া পড়।" হোমকুণ্ডটির পাশে একটি বেঞ্চী ছিল। ঐটিতে শুইয়া পড়িলাম।

একটি লাল বেদী ও তাহার উপর তিনটি ঘট—শ্রী, ভূ, নীলা, সম্মুখে একটি তামার থালায় অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র ওঁ নমো নারায়ণায় লেখা ও পিছনে একটি লাল শালুর পর্দ্দা। বেদীর নীচে সাধুবাবা আশ্রমে আসিবার প্রথম চরণ ও একটি কাপড় বাঁধা সাধুবাবার ফটো। ঠাকুর আদেশ দিয়াছিলেন যে যখন সময় হইবে ঐ কাপড় খুলিয়া দিতে বলিবেন। ঠাকুরঘরে টিনের চাল, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, ঠাকুরঘরের সামনে একটি তিন হাত লম্বা সিমেন্টের রক ছিল ও একটি ধাপ ছিল—সিঁড়ির মত। ঐ সিঁড়ির নীচে ঐ সময় একটি একটি করিয়া সাতটি একতারা তৈয়ারী করিয়া রাখা থাকিত। কিছুদিন একতারা বাজাইয়া কীর্ত্তন হইয়াছিল।

আমার বাড়ীতে কার্য্যের অবহেলা হইতে লাগিল। ঘড়ির দোকানে লাগিয়া আশ্রমে হৈ হৈ করা কেহই পছন্দ করিলেন না। বাড়িতে মারধোর চলিতে লাগিল। আশ্রমে আসিয়া সাধুবাবাকে এবং অরুণদাকে সকল কথা বলিতে হইত। সাধুবাবা সব শুনিতেন এবং নিজের পিঠ, পাঁজরা দেখাইয়া

বলিতেন, "এই দেখো, আমাকে কি রকম করিয়া মারিয়াছে" এবং চোখের জলে কাঁদিয়া ভাসাইতেন। অঝোরে কাঁদিতেন।

১৯৩৯ সালে সরস্বতী পূজা হয়। একদিন দেখা গেল পুকুরে একটি ঠাকুরের কাঠামো ভাসিতেছে। ঠাকুর ঐ কাঠামো দেখাইয়া আমাদের ঐ কাঠামোতে সরস্বতী প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে বলিলেন। প্রতিমাটি গড়িয়া একটি মাটির পাহাড়ের উপর রাখিয়া পূজা হইল। প্রতিমাটি এক হাত পরিমাপের হইয়াছিল এবং পূজার পর উহা বিসর্জন করিতে বারণ করিলেন। মূর্ত্তিটির বহু বৎসর পূজা হইয়াছিল।

সাধুবাবা ও অরুণদা আমাদের স্নেহ, ভালবাসায় আপন করিয়া লইলেন এবং আশ্রমে রাত্রিযাপন, খাওয়া, বসা, কীর্ত্তন পরিবেশন চলিতে লাগিল। কখনও বাড়িতেও থাকিতাম ও মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতাম। মাঝে মাঝে ঘড়ির দোকানে গিয়াও রোজগার করিতাম।

১৯৪০ সালের অক্টোবরে আমার মাতৃবিয়োগ হয়। আশ্রমে আমি রান্না করিতেছিলাম ও সাধুবাবা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। উনি হঠাৎ কীর্ত্তনে আখর দিলেন, "তোমাব মা মারা যাইবে। তার জন্য দুঃখ কি? আমিই তোমার মা, আমিই তোমার বাবা।" এই কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি রান্না সারিয়া তাঁহার কীর্ত্তনের নিকট দাঁড়াইলাম। আমার মা সাত দিন প্রবল রক্ত আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন। সাধুবাবা আমাকে কীর্ত্তনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। এক জোড়া করতাল লইয়া কীর্ত্তনে বসিলাম। তাড়াতাড়ি উনি কীর্ত্তন সারিয়া সকলকে নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। আমি তাড়াতাড়ি "শ্রীগুরু পরমানন্দে" বলিয়া কীর্ত্তন শেষ করিয়া পরিতোষকে বলিলাম, "তুমি পরিবেশন কর। আমি মাকে ওষুধ খাইয়ে আসছি।" আমার মাকে ওষুধ খাওয়াইবার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় তাড়াতাড়ি কীর্ত্তন সারিয়া

লইয়াছিলাম। স্বাভাবিকভাবে মাকে ওষুধ খাওয়াইয়া মার কাছ থেকে চলে আসিবার সময় মা হঠাৎ আমার হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিলেন এবং পরম স্নেহে আমার হাত দুইটি নিজ বক্ষে বুলাইলেন ও তাঁহার নিজের আঙুল হইতে একটি পলার আঙটি আমার আঙুলে পরাইয়া দিলেন। ঠোঁট কাঁপাইতে ছিলেন। আমি আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলাম। সকলে আসিয়া পড়িলে মায়ের শেষ অবস্থা বুঝিয়া আমি কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে তারকব্রহ্ম নাম শোনাইতে লাগিলাম। আশ্রমে খবর গেল। ঠাকুর যেন প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এক থলে খুচরা পয়সা দুইটি খোল দিয়া আশ্রম হইতে সকলকে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "আমি একা আশ্রমে থাকিব। তোমরা তুলসীর মাকে সমাধা করে দিয়ে এসো।" আশ্রমে আগত মাদ্রাজী আম্মারা, বাবারা, অদ্বৈতদা, অরুণদা, পরিতোষ ও অন্যান্য সকলে শ্মশানবন্ধু হইলেন।

তাহার পর হইতে আমার বাড়ীর সহিত সকল সম্পর্ক চুকিয়া গেল।"

তুলসী প্রথমে চক্রবর্ত্তীদার রান্নার সাহায্যকারী ছিল। চক্রবর্ত্তীদা দেহ রাখিবার পর সে ধীরে ধীরে রান্নার পুরা কাজ নিজ স্কন্ধে লইল। ঠাকুরের ভোগ ও সাধুবাবার রান্না সে করিত। মায়েদের ঠাকুরঘরে ও রান্নাঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আশ্রম হইবার প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত মায়েরা রান্নাঘরে বা ঠাকুরঘরে ঢোকেন নাই। বালির ঘট প্রতিষ্ঠা হইতে ঠাকুরের ষোল বৎসর ব্রত পূর্ত্তির বৎসরে পাঁচজনকে—আমি, তুলসী, মাষ্টার, মনোময়দা ও কেশবদা পূজার সঙ্কল্প করাইলেন এবং বলিলেন, "আমার পূজা শেষ হইল। এইবার তোমরা আশ্রমের ভার লও। এখন হইতে নিত্যপূজা নিত্যউৎসব জানিবে। তোমরা যাহা খাইবে ঠাকুরকে দেখাইয়া খাইবে।" কোরকোণ্ডায় ১৯৪৪ সালে যাওয়া পর্য্যন্ত তুলসী রান্না করিত। সকলের রান্না করিয়া উহা

পরিবেশন করিয়া উচ্ছিষ্ট পাতাসকল ফেলিয়া, খাওয়ার জায়গা মুছিয়া তবে আমি ও তুলসী খাইতে বসিতাম। সাধুবাবা আশ্রমে মাঝে মাঝে আসিয়া দুই তিন দিন থাকিতেন এবং দুপুর বারটা হইতে তিন চার ঘণ্টা কীর্ত্তন করিতেন। তাহার পর দুপুরের খাওয়া দাওয়া হইত। সন্ধ্যায়ও ২।৩ ঘণ্টা করিয়া কীর্ত্তন বা ধ্রুপদ সংগীত হইত।

তুলসী নিয়মিত ডায়েরী রাখিত। অরুণদাও নিয়মিত ডায়েরী লিখিতেন এবং উহাতে বিশদ বিবরণ থাকিত।

১৯৩৭এর পূজার পর বাক্‌সাড়ার শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরকে ৺বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি একজন রসিক গায়ক ছিলেন এবং ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। তাঁহার বাটীতে এবং জগাছা, আন্দুল, মৌড়ীগ্রাম, সাঁত্রাগাছি, জিগাছা, বেতড়, রামরাজাতলা এই অঞ্চল জুড়িয়া তাঁহাদের একটি সংগীত প্রেমিকের দল ছিল। ১৯৩৮।৩৯।৪০ এই কয় বৎসরে শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ বাদক শ্রীদুর্লভ ভট্টাচার্য্যের প্রিয় ছাত্র জগাছার শ্রীহরিশংকর ঘোষ (শংকরদা), গায়ক জগাছার শ্রীবলাইচন্দ্র ঘোষ, বাক্‌সাড়ার শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাঁত্রাগাছির শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া গানের আসরে আসিতে শুরু করিলেন। কলিকাতা হইতে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকণ্ঠী শ্রীঅনাথনাথ বসু, শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফৈয়াজ খাঁ, সারেংগী বাদক শ্রী ছোটে খাঁ প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ আশ্রমে আসিয়া ঠাকুরকে গান শোনাইয়া কৃতার্থ হইতেন। ছোটে খাঁ ঠাকুরের এক যবন শিষ্য ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে মাংসাদি আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছুদিন আশ্রমেও বসবাস করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়া উঠেন। ঠাকুরের তাঁহার সহিত সুর-সংযোগে সমাধি হইয়া যাইত এবং ছোটে খাঁও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার সাধারণাতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এক সময় স্বপাক অন্নগ্রহণ করিতেন।

ঠাকুর সুরের অধিপতি ছিলেন। দুরূহ রাগ, তাল, লয়, মান বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞগণ তাহার সামনে একবার গাহিলেই ঠাকুর তাঁহাদের মুখ হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং উহা গাহিয়া সঙ্গীতজ্ঞদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহার এই অসাধারণ ঐশ্বরিক ও যৌগিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিতেন। সংগীতজ্ঞগণ সংগীত-পাগল হইয়া উঠিতেন এবং ঠাকুরের গানের ভিতর বিভূতি, জ্যোতির প্রকাশ দেখিয়া সমাহিত হইয়া পড়িতেন, অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। ঠাকুরেরও সমাধি হইয়া যাইত। মুদ্রাসহকারে নৃত্য শুরু করিয়া দিতেন। স্বয়ং নটরাজের আবির্ভাব হইত।

সকল গাইয়ে ও বাজিয়েরা যে ভক্তিভরে আসিতেন উহা মনে করিলে ভুল হইবে। কোনও বিশিষ্ট গায়ক যদি অহঙ্কার লইয়া আসিতেন, তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সংগীতের ভিতর দিয়া সমুচিত শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে স্বদলে টানিয়া লইতেন এবং ভাবের লহরী বহাইয়া দিতেন।

সংগীতের সাধকদের তিনি বুকে করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহাদের আর্থিক কষ্ট অপনোদন করিতে যত্নবান হইতেন। তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা, গরম দুধের ব্যবস্থা, থাকিবার শুইবার বিশেষ ব্যবস্থা, বস্ত্রদান ও অর্থ সাহায্য করিয়াও তাঁহাদের সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। কাহাকে দর্শন দিয়া, জ্যোতি দর্শন করাইয়া ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের চিত্তজয় করিয়া ফেলিতেন। তাঁহাদের গৃহে গৃহে স্বয়ং পদার্পণ করিয়া তাঁহাদের রোগ, শোক ও তাপ হরণ করিয়া তাঁহাদের সংগীত সাধনার পথের কাঁটা সরাইয়া ফেলিতেন। সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে সর্বশ্রী যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, ফৈয়াজ খাঁ, ছোটে খাঁ, হরিশংকর ঘোষ, শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বহু প্রথিতযশ শিল্পী

ঠাকুরকে সঙ্গীত শোনাইয়া তাঁহাকে সমাধিরাজ্যে রাখিয়া দিতেন!

হরিশংকর ঘোষ (শংকরদা) তখন সবে শিবুদার সহিত আশ্রমে আসিতে শুরু করিয়াছেন। ঐ বৎসর অন্নকূটের পরে শিবুদা ও রবিদা আশ্রমে গায়কদের এক এক করিয়া লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে সংগীত পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে আনন্দদান করিতেছেন। ঠাকুরেরও অতি মধুর কণ্ঠ তাঁহাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিত।

ইহার আগে সাধুর অন্বেষণে বহু ঘুরিয়া ভেক-সার সন্ন্যাসীদের দর্শন পাইয়া যখন শংকরদার মনে সাধুজীবন সম্বন্ধে অসারত্ব মনে দানা বাঁধিতেছিল সেই সময় আমাদের প্রাণের ঠাকুরের দর্শন পান। ঠাকুর তখন সবে অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। সকাল সন্ধ্যায় একটু করিয়া কমলা লেবুর রস পান করিতেন। এক দিবস সামান্য মুখে দিয়া ঐ লেবুর রস সমবেত গায়কদের প্রসাদ দিতে আদেশ দিলেন। অরুণদা রবিদা ও শিবুদার গালে একটু করিয়া ঢালিয়া শংকরদাকে হাঁ করিতে বলিলেন তখন শংকরদা উচ্ছিষ্ট মনে করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইলেন! শংকরদার ভাষায় "সাধুবাবা তখন রেগে বল্লেন, কি এতবড় আস্পর্দ্ধা" ইত্যাদি এই সব বলায় আমি আঙুলের ডগায় একটুখানিক রস ছুঁইয়ে ঠোটে ও মাথায় হাত বুলিয়ে নিলাম। কিছুদিন বাদে পিয়ারীর টাইফয়েড অসুখ হয়েছিল। পিয়ারী তখন পরিতোষের সঙ্গে এক ক্লাসে সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্‌ষ্টিটিউশনে পড়ে। প্রায় রোজ বিকেলে আশ্রমে এসে পরিতোষের সঙ্গে থাকে। আমি কয়দিন আশ্রমে আসতে পারিনি। কারণ রোগীর বিছানার পাশে আমাকে তখন অফিস কামাই করেও থাকতে হচ্ছে। সাধুবাবা শিবুদা ও বলাইদাকে জিগ্যেস করে জানতে পারলেন যে আমার ঘরে এতবড় অসুখ চলছে। বিকেলে একদিন সটান খড়ম পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার ছোট্ট কুটীরে এসে হাজির। বলাইদা বাড়ীর ভিতর এসে আমায় বল্লে, "দেখবে এসো,

কে এসেছে তোমার বাড়ীতে।” আমি বাইরে গিয়েই অবাক্। স্বয়ং সাধুবাবা আমার বাড়ীতে! আমায় বল্লেন, “চল, আশ্রমে পাখোয়াজ বাজাতে হবে—আমায় গান শোনাতে হবে।” আমি’ত শুনে অবাক্। বাড়ীতে আমার ১০৪।১০৫° ডিগ্রী জ্বরের রুগী আর এদিকে উনি এসে বলছেন আমাকে এখন আশ্রমে গিয়ে পাখোয়াজ ধরতে হবে। আপত্তির সুরে বল্লাম, “বাবা, বাড়ীতে আমার অসুখ।” উনি তখন, “কৈ, চল দেখি” বলে সোজা যে ঘরে পিয়ারী শুয়েছিল সেই ঘরে ঢুকে হাতে একটু গঙ্গাজল চাইলেন এবং রোগীর পাশে আসন করে দিয়ে আমাদের ঘরের বাইরে যেতে বল্লেন এবং জিগ্যেস করলেন, “কত জ্বর?” আমি থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখি ১০৫।৬° ডিগ্রী জ্বর এবং তাঁকে বলে ঘর থেকে আমরা সকলে বেরিয়ে এলাম। দেখি তিনি আসনে যোগাসনে বসে ডান হাতে পিয়ারীর বাম হাতের নাড়ি ধরে বসলেন। প্রায় ৫ মিনিট বাদে দেখি তিনি কুলকুল করে ঘামছেন। প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে আসন থেকে উঠে পিয়ারীর পেটে চরণ দিয়ে বল্লেন, “দেখ কত জ্বর নামলো।” আমি কাঠি লাগিয়ে দেখি ১০২° ডিগ্রীতে নেমে গেছে। আমাদের চোখের সামনে একি ভেল্কীবাজী! তারপর সাধুবাবা বল্লেন, “সতেরো দিনে জ্বর ছাড়বে।” আমরা জানি টাইফয়েড জ্বর ১৪ বা ২১ দিনে কি ২৮ দিনে ছাড়ে। এ আবার কি বলেন! কিন্তু তখন বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অবিশ্বাস ও প্রশ্ন সব উড়ে গেছে। তাঁর আদেশে আমি তাঁর সঙ্গে আশ্রমে এসে পাখোয়াজ ধরলাম। ঠিক সতেরো দিনের দিন আশ্চর্য্য ভাবে পিয়ারীর আর জ্বর নেই। একি মানুষে সম্ভবে? এ ভগবান ছাড়া কেউ পারে না। আঠারো দিনেও নয়, ষোল দিনেও নয়—ঠিক সতেরো দিনে জ্বর ছাড়লো।

“আর একবারের ঘটনা। ১৯৪২।৪৩ সাল হবে। হঠাৎ একদিন সকালবেলা বালির হরিহরবাবাকে নিয়ে খড়মপায়ে

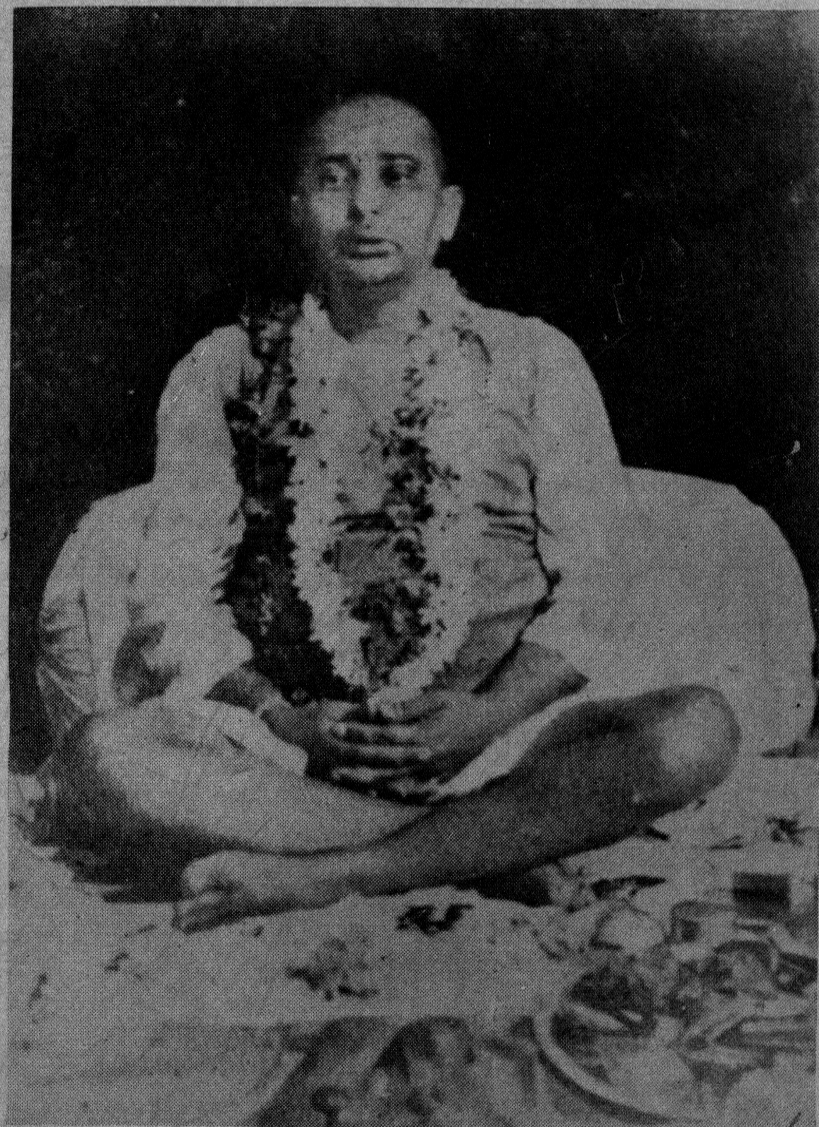
আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। তখন অবস্থা আমার খুব খারাপ। এখনত ঘর-দালান সব হয়েছে। তখন কেউ বড় হয়নি। সকলে ছোট ছোট। খুব টানাটানি অবস্থা। আগের দিন হাওড়া ষ্টেশন থেকে অফিস ফেরতা দুটো ছোট ফুলকপি নিয়ে এসেছি। বাড়ীতে এসে সাধুবাবা জিগ্যেস করলেন "ময়দা আছে?" বাড়ীতে ময়দা ছিলনা। আটা ছিল। সের দুই তিন হবে। উনি তাই মেখে ফেলতে বলে বাগানে দুই একটা বেগুন যা ছিল তাই দিয়ে আলু কপি বেগুন দিয়ে একটা তরকারী ও ডাল তৈরী করতে বল্লেন। রান্নার পর যে ঘরে রান্না রাখা হয়েছিল সেই ঘরে ঢুকে আমাদের ঘর থেকে বাইরে চলে যেতে বল্লেন এবং আমাদের ঘরে আর ঢুকতে দিলেন না। আর হরিহরবাবাকে পরিবেশন করতে বল্লেন। তারপর দেখি পিল পিল করে কোথা থেকে আমার বাড়ীতে লোক আসতে শুরু করল। যারাই সাধুবাবাকে আশ্রমে দর্শন করতে আসছিল আশ্রম থেকে প্রত্যেককে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমার বাড়ী এক উৎসব বাড়ীতে পরিণত হোল। এমন কি দেবেদের বড়বাবু আমার বাড়ীর দীন অবস্থা দেখে বল্লেন, "ঠাকুর যখন আপনাকে কৃপা করেছেন তখন আপনার এ অবস্থা আর থাকবে না। আপনার অবস্থা ফিরে যাবে।" আশ্চর্য্য হয়ে যাই সেই দিন ঐ অল্প রান্নায় কি করে ৭০।৭৫ জন লোককে খাওয়ানো হোল। দুই তিন সের আটা আর দুটো ফুলকপি দিয়ে সাধুবাবা যে লীলা সেদিন দেখালেন সেই থেকে তাঁকে কোন রকম প্রশ্ন করার আমার কোন ভাষা রইল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার বাড়ী এক পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠলো।

"পিয়ারীর মা'র দুরারোগ্য প্যারালিসিস ছিল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না কুঁক্ড়ে বসে থাকত। ঘষ্ড়ে ঘষ্ড়ে এ ঘর ও ঘর করত। সাধুবাবা চরণ দেবার পর ছয় মাস

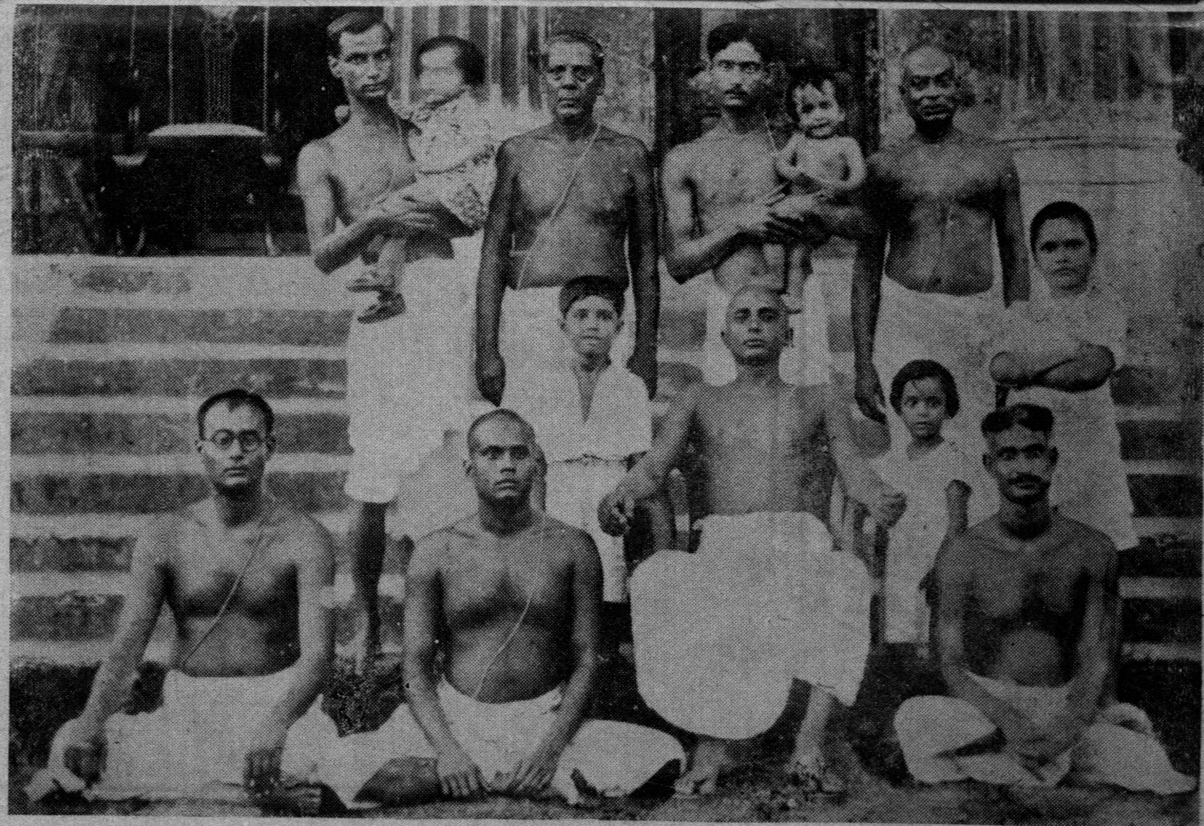
চলাফেরা করতে পারত। আবার চলাফেরা বন্ধ হয়ে যেতো। আবার তাঁর কাছে সাইকেল রিক্সা যোগে আশ্রমে কোলে করে নামিয়ে ওনার চরণ দেবার পর আবার পাঁচ ছয় মাস চলাফেরা করতে পারত। মাঝে মাঝে ওনার চরণ দিইয়ে নিয়ে যেতাম। উনি দেহরাখার পরও এখন বসে বসেই কাজ কর্ম করে। উঠতে আর পারে না। সাধুবাবাকে জিগ্যেস করাতে উনি বলেছিলেন—"জন্মান্তরের কর্মদোষের কিছুত গ্রহণ করতে হবে।"

* * * *

একদিকে কীর্ত্তনের জন্য ঠাকুর শ্রীখোল, খঞ্জনী সংগ্রহ করিতেন অন্যদিকে ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের জন্য পাখোয়াজ, তানপুরা, হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা প্রভৃতি জোগাড় করিতেন।



ভক্তগৃহে কীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ আচার্য্যদেব (১৯৪১)



১৯৩৪ সালে অন্তরঙ্গভক্তসহ শ্রীশ্রীঠাকুর বালীতে। বাম হইতে উপবিষ্ট অরুণদা, অদ্বৈতদা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শম্ভুদা। দণ্ডায়মান দাদু ও প্রমথবাবা।

নবম অধ্যায়

লীলা মাহাত্ম্য

আশ্রমে ঢুকিতেই বর্ত্তমানে যেখানে ত্রিশূলটি প্রোথিত আছে ঐখানে আশ্রমের প্রথম হোমকুণ্ড। পরে ঠাকুর সারা আশ্রম জুড়িয়া বহু হোমকুণ্ড খনন করাইয়া আমাদের দিয়া ষোল বৎসর হোম ও যজ্ঞ করাইয়াছেন। কমপক্ষে সারা আশ্রম জুড়িয়া ৫২টি হোমকুণ্ড খনন করাইয়াছিলেন। পুকুরের চারিকোণে চারিটি হোমকুণ্ড; চাঁপাতলায় পুকুরের ধারে যেখানে বর্ত্তমানে জবা গাছটি পূজার ফুল জোগাইতেছে ঐস্থানে একটি ও ঠিক তাহার অপর পাড়ে রাস্তার সামনে যেখানে নিমগাছটি ছিল ঐস্থানে অন্য একটি হোমকুণ্ড খনন করাইয়া যথাক্রমে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। দাদু দেহ রাখিবার পর চাঁপাতলার হোমকুণ্ডটি খনন করাইয়াছিলেন। যেখানে বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মায়ের প্রতিমা আছে উহারই নীচে একটি বিশাল এক মানুষ সমান হোমকুণ্ড খনন করাইয়া উহার নীচে একটি সিমেণ্টের কূর্ম তৈয়ার করাইয়াছিলেন এবং কূর্মের পিঠটি উঁচু না করিয়া খালের মত করিয়া উহাতে দিনের পর দিন হোম করাইয়াছিলেন। হোম করিয়া ঐ বিশাল হোমকুণ্ডটি (কূর্মকুণ্ড) ভরাট করাইলেন। যখন ঐ বিশাল গহ্বর ভরিতে দেরী হইতেছিল তখন এক লরি বাঁশের গোড়া আনিয়া যজ্ঞ করাইলেন এবং পরিশেষে কিছু বাঁশের তেউড় দিয়া হোমকুণ্ডটি ভরাট করিয়া সিমেণ্টের বেদী করিয়া উহার উপরই অষ্টধাতু জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ও ঘট বসাইলেন। যেখানে বর্ত্তমানে পাতকুয়াটি আছে উহাও একটি নয়মণ কাঠের হোমকুণ্ড। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে তিনি উহার নীচে সোনার ইঁট আছে বলিয়া সকল ভক্তদ্বারা কিছু কিছু মাটি কাটাইয়াছিলেন। যেখানে গণেশের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে ঐস্থানে অর্দ্ধচন্দ্র হোমকুণ্ড খনন করিয়া

উহার পিছনে পর পর তিনটি চতুষ্কোণ হোমকুণ্ড খনন করাইয়া যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। পাতকূয়ার দুই পার্শ্বে তিনটি করিয়া ছয়টি হোমকুণ্ড করাইয়াছিলেন। রান্নাঘরে ও আশ্রমবালকগণ যে ঘরে থাকে সেই ঘরে একটি করিয়া হোমকুণ্ড হইয়াছিল। যেখানে প্রথম হোমকুণ্ডটি হইয়াছিল উহার দুই পার্শ্বে পরে একটি করিয়া দুইটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হোমকুণ্ড এবং উহাদের দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে দুইটি করিয়া চারটি অষ্টকোণ চিহ্নিত হোমকুণ্ড হইয়াছিল। তাঁহার হোমকুণ্ডগুলির কোনটি চতুষ্কোণ, কোনটি ষট্‌কোণ বা কোনটি অষ্টকোণ হইত। বর্ত্তমান পূজার বেদীর দুইপার্শ্বে দুইটি হোমকুণ্ড হইয়াছিল। ঐস্থানে পূর্বে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর ছিল। আশ্রমের চারিপার্শ্বে চারিটি ছয়ফুট সমান ত্রিশূল পুঁতিয়াছিলেন এবং চারতলা সমান একটি লম্বা ত্রিশূল পুকুরের মধ্যখানে পুঁতিয়াছিলেন। ঐ লম্বা ত্রিশূলটি বর্ত্তমানে আম গাছের গায়ে লাগানো আছে।

* * * *

শ্রীপশুপতিনাথ দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুহৃৎকুমারের ধর্মপ্রাণা পত্নী শোভনামা (বড় মা) ভয়ঙ্কর অম্লশূল রোগে (Cholic pain) ভুগিতেছিলেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাঁহাকে নিরাময় করিতে পারেন নাই। উনি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন এবং সময় সময় নাড়ীও পাওয়া যাইত না। ঠাকুর তাঁহাকে চরণ দিয়াছিলেন এবং ঐ রোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নীরোগ করেন। ঠাকুরের পায়ের তলা সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়া বিরাট ফোস্কা হইয়া যায় এবং বহুদিন তাঁহাকে বিশ্রাম লইতে হয়। বড়মার কথায় "আমার জন্যও ওনাকে কষ্ট পেতে হয়েছে। আমার বার বার ত'

ব্যথা ধরত—দারুণ ধরত, যখন তখন ধরত। নাড়ী ছেড়ে যেত তারপর চরণ দেন ও বাড়ীর উঠোনে যজ্ঞ করেন।"

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুবীর কুমার দেব (ভানু) অর্থাৎ পশুপতিবাবুর জ্যেষ্ঠ নাতি ঠাকুরের প্রিয় ছিল। তাহার সেপ্‌টিক টনসিলাইটিস্‌ হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ দেখিয়া অস্ত্রোপচারের নির্দ্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী নার্সিং হোমে ভর্ত্তি হইবার ব্যবস্থা হইতেছিল। ঠাকুরকে জানাইতে তিনি গলার ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া সারাইয়া দেন ও পরে গলায় চরণ দেন। সুবীরের কথায় "আজ অবধি no Septic tonsil—আমারত operation এর কথা! একে ভগবান ছাড়া কি বলব বলুন।" দিনের পর দিন ঠাকুর তাঁহাদের অট্টালিকায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। বড়মার পূজিত বিগ্রহ মুরলীবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অষ্টধাতুর মূর্ত্তি ছিল এবং কীর্ত্তনের সময় মণিমুক্তা পরিহিত ঐ মূর্ত্তি কীর্ত্তনের জায়গায় আনা হইত। একদিন সন্ধ্যাবেলা টেবিলের উপর মূর্ত্তি দাঁড় করানো আছে ও উহার শ্রীচরণে একটি পুষ্প দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর মূর্ত্তিটির অদূরে বসিয়া হাত পাতিলেন। পায়ের পুষ্পটি প্রায় দুই হাত লাফাইয়া তাঁহার হাতে পড়িল। সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। ঠাকুর সেই সময় খুব চা পান করিতেন এবং বিগ্রহকে তদনুযায়ী অদ্যাবধি দুই বেলা চা ভোগ দেওয়া হয়। বড়মা ঠাকুরের নামানুসারে বিগ্রহের নাম 'গিরিধারী' বদলাইয়া 'গোবিন্দজী' রাখিয়াছিলেন এবং অদ্যাবধি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকেন।

দেবেদের ছাতুবাবুর বাজারে ছট্টু বলিয়া মেথরদের পাণ্ডা ছিল। হেড-মেথর। তাহার স্ত্রীর যক্ষা হইয়াছিল এবং আশ্রমে তাহাকে লইয়া গিয়া ঠাকুরের চরণস্পর্শে তাহাকে নিরাময় করিয়া লয়। মনিবের ভয়ে কলিকাতার অট্টালিকায় লইয়া যাইবার সাহস হয় নাই। তাহার বৌ সারিয়া উঠিবার পর একদিন সে আশ্রমে আসে। ঐ দিন সুহৃৎবাবু (বড়দা), বড়মা,

তাঁহাদের পুত্র সুবীর প্রভৃতি হঠাৎ আশ্রমে আসিয়া পড়ে। মনিবের সম্মুখে ইহাতে ছট্টু খুব বেকায়দায় পড়িয়া যায়। ঠাকুরের ঐ সময় সমাধি অবস্থা ছিল এবং মনিবদের সামনেই ছট্টুকে আলিঙ্গন করেন। সকলে স্তম্ভিত ও বিহ্বলিত হইয়া পড়েন। শ্রীমতী শোভনা দেব বলেন, "উনি যখন আমাদের বাড়ীতে কীর্ত্তন করে নাচতেন ঠিক গৌরাঙ্গের মত দেখাত এবং কতলোক রোজই অজ্ঞান হয়ে যেত। উনি আচণ্ডাল সকলকে গৌরভাবে মুক্ত করিতেন।"

এক পক্ষাঘাত রোগী দেখাইবার জন্য তাঁহাদের এক পরিচিতের বাড়ী ঠাকুরকে সুহৃৎবাবু (বড়দা) লইয়া যান। বড়মার কথায় "ঠাকুর রোগীর সামনে গিয়ে ধমক দিয়ে—উঠে আয়, উঠে আয় বলায় সকলে মনে করেছিল ঠাকুর বুঝি পাগলামী করছেন। কিন্তু সকলকে হতবাক্ করে সকলের সামনে বিকলাঙ্গ রোগী উঠে দাঁড়াল এবং পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরে রোগী সম্পূর্ণ সেরে যায়।" শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার শ্বশুর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীসুহৃৎ কুমার দেবের পিসতুত ভাই ছিলেন।

ঐ সময় ছোটে খাঁ, শ্রীঅনাথনাথ বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীঅনুপম ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ ঠাকুরকে দেবেদের বাড়ীতে গিয়া সংগীত পরিবেশন করিয়া সমাধিস্থ করিয়া ফেলিতেন। শ্রীসুবীর কুমার দেবের কথায় "এই সময় রঘুনাথপুরে কালীবাবু বলিয়া ঠাকুরের এক ভক্ত তাঁহাকে লইয়া রঘুনাথপুরে যান। কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ স্থানে ঠাকুরের সমাধি হইয়া যায় এবং কাঁটাগাছের উপর আছড়াইয়া পড়েন।" ঠাকুর ভক্তদের বাড়ীতে যখন থাকিতেন, সেই সময় কখন কোথায় যাইতেছেন সকল খবর সকলে সব সময় পাইতেন না। তাঁহার অনন্ত লীলার কি শেষ আছে? আর তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরই বা কে রাখে? বিশেষ করিয়া তিনি তাঁহার নিজের প্রচার কখনও পছন্দ করিতেন না এবং বারবার বারণ করিতেন।

ঠাকুর যখন শিবপুরে ডাঃ সুরেন ঘোষের বাড়ীতে ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে উপবাস ও মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন সেই সময় ভবানীপুরের নীলকুঠির শ্রীসরল কুমার ঘোষের চিকিৎসার জন্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীসুহৃৎ কুমার দেব ঠাকুরের সহিত সরলবাবুর রোগারোগ্য উপলক্ষে মিলিত হন। ঠাকুর সরলবাবুকে দেখিয়াই বলিয়া দিয়াছিলেন যে উনি বাঁচিবেন না এবং ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবার পর তিনি মারা যান। ঠাকুরের ভক্ত ও রসদ্‌দার শ্রীপশুপতিনাথ দেবও দুই বৎসর পর নভেম্বরে দেহত্যাগ করেন।

১৯৪৬ সালে পুরীতে ঠাকুর বিজয়নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মহারাণী সমভিব্যাহারে প্রায় দুই মাস দেব পরিবারের সহিত সেবাকুঞ্জ, স্বর্গদ্বারে কাটাইয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস থাকিয়া রথযাত্রার পর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পশুপতিবাবুর বিধবা পত্নী শ্রীমতী সুষমা দেব, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুহৃৎকুমার দেব, সুবীর, নীলকুঠীর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ ও শ্রীভাস্কর দেব ঠাকুরের সহিত আনন্দে কাল কাটাইয়াছেন এবং পুরীতে ঠাকুরের আগমনবার্ত্তা পাইয়া কলিকাতা হইতে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবিমলা প্রসাদ রায়, শ্রীমনোময় বাগচী, শ্রীহিরণ্ময় বাগচী প্রভৃতি পুরী গিয়া শ্রীগুরুনারায়ণের সহিত মাসাধিক কাল কাটাইয়া আসিয়াছিলেন।

নিত্য আনন্দময় যখনই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার সঙ্গে তিনি পারিষদ বর্গ লইয়া আসেন যাঁহাদের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার শক্তি, বিভূতি ও লীলা সঞ্চার করিয়া এক মানুষ ধরার ফাঁদ পাতেন। তিনিই বহু হইয়া বহুর ভিতর দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে লীলা ও রসাস্বাদন করিয়া চলিতেছেন। যাঁহারাই তাঁহার পার্ষদরূপে নির্দ্দিষ্ট হন তাঁহারা যে প্রত্যেকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়েন এমন নহে। প্রত্যেকেই

যে শৈশব অবস্থা হইতেই পরমানন্দে বিরাজ করেন এমনও নহে। সর্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন জীবের ভিতর দিয়া তাঁহার ঐশীশক্তির প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাঁহার কাজ করিয়া লইতে পারেন এবং লইতেছেন। কে তাহার খবর রাখে ? তিনি এমন নবরূপ সৃষ্টি করিতে পারেন যাহা পৃথিবীতে কল্পিত বা সৃষ্টই হয় নাই। যেমন, নৃসিংহ। কিম্ভূতকিমাকার জীব কচ্ছপ, বরাহ, মৎস ও নৃসিংহ—ইহারা যদি অবতার হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে ইচ্ছাময়ের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত সীমিত তাহা উপলব্ধি হয়। কোন শিশু যদি বিষ মিশ্রিত স্তন্যপান করিয়া রাক্ষসীর প্রাণবায়ু শোষণ করিয়া লইতে পারে, অর্জ্জুন বৃক্ষ উপড়াইয়া অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়কে শাপমুক্ত করিতে সমর্থ, অঘাসুর, বকাসুর ও হলাহলময় কালীয় সর্পকে দমন করে এবং যিনি কংসকে বধ করিয়া জরাসন্ধের মথুরা নগরী ত্যাগ করেন এবং এক পুরুষ হইয়া ষোল সহস্র গোপিনী সঙ্গে রাস করেন ও শিশুপাল বধ করিয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধোত্তর পরিশেষে নিজে বিষ-মিশ্রিত বাণে ব্যাধদ্বারা নিহত হইতে পারেন, যিনি হিরডের সকল চাতুরি ও পরাক্রম ব্যর্থ করিয়া হাজার হাজার নর-নারীকে রোগমুক্ত করিয়া সমুদ্রের উপর হাঁটিয়া ক্রুশ হইতে পুনরুত্থিত হইতে পারেন এবং সর্বজগতে পরিব্যাপ্ত হন, নিষ্ঠুর সনকে প্রেমিক পলে রূপান্তরিত করেন, মাছ ধরা জেলেদের মানুষ ধরা প্রেমিকে পরিণত করেন, যিনি নবকলেবরে রাধাভাবে রাধাপ্রেমে বিভোর হইয়া মর্ত্ত-বাসীকে কৃষ্ণভজনা শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করেন, জগাই মাধাই উদ্ধার, কাজীকে ভক্তে পরিণত ও রূপ-সনাতনকে রূপের আকর্ষণে পথের ভিখারী করেন ও যাঁহার চরণবন্দনা না করিয়া হরিদাস জলগ্রহণ করিতেন না, যাঁহার ইচ্ছায় একই বৃন্তে লাল ও শ্বেত জবা প্রস্ফুটিত হয়, যাঁহার স্পর্শে জন্ম জন্মান্তরের রুদ্ধ দ্বার মুহূর্ত্তে খুলিয়া যাইতে পারে, যিনি স্বয়ং পরমবৈষ্ণব কঠোর শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত

রামানুজাচার্য্যপন্থী হইয়া বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, যিনি কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, মস্তিষ্কবিকৃতি, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, অম্লশূল প্রভৃতি ব্যাধি স্পর্শমাত্র নিরাময় করেন, যিনি যজ্ঞের ভিতর স্বয়ং নারায়ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করান, যিনি ধমক দিয়া বৃষ্টি বন্ধ করেন, পেট্রোলের অভাবে জল দিয়া গাড়ী চালু করেন, যিনি মৃতব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেন, যিনি অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই শরীর দ্বারা চরণ স্পর্শ দিয়া রোগ নিরাময় করান, দর্শন করান, তিনিই যে মহাযোগেশ্বর হরি, ভূতভাবন ভগবান স্বয়ং ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি বারে বারে আসেন, আবার আসিবেন এবং আমাদের মধ্যেই লীলা করিয়া যাইবেন তবু তাঁহাকে আমরা ধরিতে ও বুঝিতে পারিব না যদি না তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার লীলার কারণে বুঝাইয়া দেন।

স্বয়ং গোবিন্দ যখন আবির্ভূত হন সঙ্গে আনেন নিত্যসহচর সঙ্গী, অন্তরঙ্গদের। কেহ তাঁহাদের ভিতর রসিক ভক্ত, বয়সে সমসাময়িক কেহবা তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার ধারক ও বাহক। নিত্যসহচর, সঙ্গী ও অন্তরঙ্গদের স্ব স্ব ভাব অনুযায়ী তিনি তাঁহাদের প্রস্তুত করেন ও তাঁহাদের সহিত অনন্তলীলা করিয়া চলেন। কাহাকেও যদিবা দাদা সম্বোধন, কেহ দাদামহাশয়, কেহ পুত্র, কেহ পিতা। যাঁহার যাহা আধার তাঁহার সহিত তদ্রূপ তিনি লীলা করিয়া চলেন বলিয়াই ঠাকুরকে ভক্তগণ অন্তর্যামী আখ্যা দেন।

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদির সহিত গৌরাঙ্গের যে ভাব সম্পর্ক বা তাঁহারা যে স্তরের অন্তরঙ্গ, হরিদাস, মুকুন্দ, কৃষ্ণদাস, জীব প্রভৃতি হয়ত' অন্য স্তরের। অর্জ্জুনের সহিত জনার্দনের যে সম্পর্ক রাধার সহিত হয়ত' তাহা নহে। অষ্টসখিগণের সহিত গোবিন্দের যাহা সম্পর্ক হয়ত রাধা বা যশোদা প্রভৃতির সহিত অন্য সম্পর্ক। বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি ও ভাব অনুযায়ী রাসেশ্বর রসময় মহারসিক ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সর্বমুখে, সর্বভাবে রসাস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন।

প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামগোবিন্দ যে সাড়ে চব্বিশ বৎসর লীলার কারণে প্রকট হইলেন উহাতে তিনি যাঁহাদের আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতর ঈশ্বরকোটী, জীবকোটী মুক্ত পুরুষ আমাদের সহিত স্বচ্ছন্দে লীলা করিয়া গিয়াছেন।

১৯২৭।২৮ হইতে ১৯৩২ সালের ভিতর তিনি দাদু (শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী—সন্ন্যাসী শিষ্য), শীতলদা (শ্রীশীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়), শংকরদা (শ্রীরামশংকর ভট্টাচার্য্য), অদ্বৈতদা (শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), অরুণদা (শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত)—এই পাঁচজন ত্যাগী পুরুষকে আকর্ষণ করেন। ইঁহাদের সহিত ও ইহাদের ভিতর দিয়া তিনি অলৌকিক লীলা প্রকট করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচুনিলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীপশুপতিনাথ দেব, শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুধীরকুমার বসু, শ্রীমতী সুষমা দেব, শ্রীসুহৃৎকুমার দেব, শ্রীভীষ্মদেব সাহা, ডাঃ রামা আয়েঙ্গার, বিজয়নগরের মহারাণী ও মহারাজকুমার, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ডাঃ পুলীন সিংহ, শ্রীকিরণ বসু, শ্রীকুমার মিত্র, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়, দশারী শ্রীরামলু ও শ্রীএন. ভি. সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি প্রভৃতি ১৯৩২ হইতে ১৯৩৭এর ভিতর শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শরণ লন।

১৯৩৭।৩৮ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীপরিতোষ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতুলসী চরণ চট্টোপাধ্যায়কে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার নিত্যলীলার অঙ্গীভূত করিয়া তাঁহার "ডান হাত, বাঁ হাত" নাম দিয়া লীলা পূর্ণ করিলেন। সেই সময় আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ ও তুলসীর সতেরো। প্রাণের ঠাকুর দুইজনের প্রেমদাস ও তুলসীদাস নাম রাখিলেন।

তিনি যে তাঁহার নিত্যলীলার প্রত্যেক সঙ্গীদের নিজে নামদীক্ষা দিয়াছিলেন এমন নহে। দাদু শংকরদাকে ১৯২৯।৩০ সালে সিমলা

ষ্ট্রীটে কাঁশারী পাড়ার শ্রীগোবর্দ্ধন গোঁসাইর গৃহে দীক্ষা প্রদান করেন। ঠাকুর "দাদা" কথাটি প্রচলন করেন এবং তিনি তাঁহার তৎকালীন অন্তরঙ্গগণকে ভ্রাতৃ ভাবে সম্বোধন ও ভাব বিনিময় করিতেই আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীরামশংকর ভট্টাচার্য্যের (শংকরদা) বয়স যখন আঠারো তখন তিনি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দশ বৎসর তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়াছিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবার দেড় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে আটাশ বৎসর বয়সে ঠাকুরের অনুমতি লইয়া স্ব-গৃহে গমনপূর্বক বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহবাসী হইয়াছিলেন ও যজন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহারা দুই ভাই রামশংকর ও নিতাই এবং এক বালবিধবা ভগ্নী গিরিবালা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন এবং ঠাকুরকে সাক্ষাৎ নারায়ণ-জ্ঞানে অদ্যাপি পূজা ও সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে প্রথমদর্শনেই ঠাকুর বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এই যে আমার গৌর। তোকেই ত আমি খুঁজছিলাম। এতদিনে আসতে হয়?" বলিয়া চোখে চোখ দিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শংকরদা কয়বার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হন। তাঁহার দিদি গিরিবালা একবার বেরী বেরী রোগে অন্ধ হইয়া যান। গোবিন্দ তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া তাঁহাদের আরোগ্য করেন এবং দৃষ্টি ফিরাইয়া দেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় অরুণদাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত থাকিতে হইত। সেই জন্য দাদু ও শংকরদা আশ্রমে থাকিতেন। শংকরদা তখন প্রাণের ঠাকুরকে পূজা, আরতি করিতেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে "সাক্ষাৎ শংকর" "গৌর" এইরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন।

১৯৩৭ সালে ভবানীপুরের এ্যাটর্ণী শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে আশ্রমের জন্য ঠাকুর মাসিক ১০৲ টাকা চাঁদা দিতে আদেশ করিয়া আশ্রমের প্রথম মাসিক ভিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন।

চেতলার শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় 'গৌরীবাবা' বলিয়া জনৈক চাউলের

আড়তদার ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর আশ্রমে চাউল সরবরাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। উনি সেই সময় মণ মণ চাউল দিয়া আশ্রমে সাহায্য করিয়াছিলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বে আহিরীটোলার চুনিলাল ভট্টাচার্য্যের গৃহে একদিন শংকরদা, দাতু, প্রমথবাবা ও চুনিবাবা দুপুরে আহারাদি সারিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। ঠাকুর উপরে ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ উনি নীচে কাঁদিতে কাঁদিতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিলেন, "মা আশ্রম করবার আদেশ দিলেন এবং আমার আর দাতুর চলে যাবার আদেশ দিলেন। তোদের আর সেবা করতে পারলাম না," বলিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। শংকরদার কথায় ইহাই হইল আশ্রম প্রতিষ্ঠার সূচনা। জগন্মাতা এতদিন আগে ঠাকুরকে চলিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তদনুযায়ী সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দাতুকে পূর্বাহ্নে স্ব-স্থানে পাঠাইয়া স্বয়ং গমন করিলেন।

দাতুর তিরোধানের সময় করুণাময় ঠাকুর আমার পৃথিবীকে দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী চরাচর উদ্ধার পাইতেছে। যথাস্থানে উহার উল্লেখ রাখিব। শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী (দাতু) ঠাকুরের প্রথম দর্শনেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিনের ভিতর তাঁহার ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের চাকুরি স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলি তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন।

ঠাকুর যখন প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে সন্ন্যাসীরূপে আবির্ভূত হন সেই সময় বালির সাধনমা তাঁহার সেবা ও ভোগের জন্য নিয়মিত গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। তখন ঠাকুর পঞ্চবটীতে থাকিতেন এবং পঞ্চবটীর পার্শ্বে ছোট্ট কুটীরটিতে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সেই সময় সাধুটির আবির্ভাবের বার্ত্তা চারিদিকে রটিতে লাগিল।

দাদু, শংকরদা, অদ্বৈতদা, শীতলদা ও অরুণদা। ইহাদের ভিতর ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ও অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের পথাবলম্বী ছিলেন শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত এবং বিচার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সব কিছু সমাধান করিতে উৎসাহী ও যত্নবান ছিলেন। চারজন ব্রাহ্মণ একজন কায়স্থ। ঠাকুর সনাতন প্রথা অনুযায়ী সকলকে দ্বিজ করিতেন এবং তদনুযায়ী অরুণদাকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করান। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদের তিনি হাতে বা গলায় পৈতা ধারণ করিতে উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মণ হইলেই যেমন ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয় না তদ্রূপ পৈতা ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না—এই রহস্যটি বহু ব্রাহ্মণেতর ভক্ত পৈতা ধারণ করিয়া ভুলিয়া যাইতেন। শ্রীজয়নারায়ণ সুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীসুধাংশু কুমার ঘোষ প্রমুখ প্রিয় ভক্তগণকে ঠাকুর উপবীত দিয়াছিলেন।

প্রেমের ঠাকুর ব্রহ্মচর্য্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। বলিতেন, "ঐখানে গরুর গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ। যে যাহাই করুক, যতই লম্ফ ঝম্ফ করুক চাবি যদি আলগা হইয়া যায় এক বালতি দুধে এক বিন্দু গোচনা পড়লে যেমন সব নষ্ট হইয়া যায় সেইরকম আমার কৃপা ধারণ করিবার আধারও নষ্ট হইয়া যায়।" কৃষ্ণপ্রেম ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। পেটে আড়াইসের বীর্য্য থাকিলে তবে দর্শন হয়। নির্বিকল্প, সবিকল্প সমাধি হয়।" তাঁহার লীলার কেন্দ্র 'কেদার কাননে' তিনি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, ৫১টি বালক আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন, স্বপাক অন্নগ্রহণ ও সাধনা করিবে—তদনুযায়ী তিনি একান্নটি ছোট হাঁড়ি ও হাতা রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের ভিত যদি না থাকে তাহা হইলে হাজার নাচুনি কাঁদুনি সকলই অচিরে ধ্বসিয়া যায় এবং অহঙ্কার ও গর্ব তাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়া লইয়া চলে। উহার জন্যই ঠাকুর বলিতেন, "আমিই তোদের জন্য সব করিয়া দিয়াছি। তোদের আর সাধনা করার ক্ষমতা

কতটুকু ? তোরা নেচে কেঁদে আনন্দ করে বেড়া। শুধু আমার ওপর ভরসা রাখ্। গুরু কৃপাই তোদের সম্বল।" তাহার পরেই আবার হাসিয়া বলিয়া উঠিতেন, "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

যে কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন তাঁহার প্রভাবে তাঁহারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতেন এবং হয়ত সেই গর্ব্বে গর্বিতও হইয়া পড়িতেন। ঠাকুর ভক্ত শিষ্যদের তাঁহার ইচ্ছামত হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিতেন এবং তাঁহাদের ভিতর দিয়া, তাঁহাদের দ্বারা লীলা করিয়া মহাশক্তির খেলা খেলিয়া মহারসিক গোবিন্দ তাহা স্বয়ং দেখিয়া আনন্দিত হইতেন। ইহাই যে সৃষ্টি কর্ত্তার রীতি। তিনিই সকলের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিয়া চলিতেছেন। চুনিবাবার মেয়েদের দ্বারা চরণ দেওয়াইয়া রোগ সারাইয়াছেন ; শীতলদার, অদ্বৈতদার, শম্ভুদার, শংকরদার, দাদু, অরুণদা, জয়বাবা প্রভৃতি দ্বারা স্পর্শযোগে রোগ সারাইয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও সেইসময়কার অনুভূতি প্রকাশ করিয়া এক ভক্ত লিখিতেছেন, "কিছুদিন পরে বৈকাল বেলা আমায় বাড়ী হইতে মোটরে তুলিয়া লইলেন। কলকাতা জোড়াবাগান কোর্টের পিছনে একটি গলিতে গিয়া মোটর থামিল। সাধুবাবাকে রোগীর বাড়ির লোক ডাকিতে আসিল। সাধুবাবা বলিলেন, "শম্ভুদাদা, তুমি যাও।" একটি সরুগলির ধারে একটি তিনতলা বাড়িতে ঢুকিলাম। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ভিতরে শক্তিসঞ্চার হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি। তিনতলায় উঠিয়া বুঝিলাম আমি পূর্ণশক্তি পাইয়াছি। পায়ের চাপে বুঝি দালান নেমে যাবে। ঘরের ভিতর গেলাম। রোগীর মা, বিধবা ভগ্নী, স্ত্রী ও একটি ২ বৎসরের ছেলে বিছানার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। এই রোগী সংসারে একমাত্র রোজগেরে। বাড়ীভাড়া ও সংসার খরচ চালায়। ডাক্তার এসে দিয়ে গেছে। রোগীর বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইলাম। অন্তরে বলিলাম,

একে তুমি রক্ষা কর। যদি আয়ু না থাকে তুমি আমার

আয়ু নিয়ে একে রক্ষা কর।" রোগীর মাকে বলিলাম, "মা, ভগবান ইহাকে রক্ষা করিবেন। তুমি কেঁদো না। ঘর থেকে ঔষধের শিশিপত্র সব বার করে দাও। গঙ্গাজল ও ধূপ দাও। আমি ইহার সব রোগ টানিয়া লইয়া যাইতেছি। তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও। শীঘ্র সারিয়া উঠিবে।" তিনতলা থেকে যেমন উঠানে পা দিয়াছি ভিতর ফাঁকা—শক্তি অন্তর্হিত। সাধুবাবা মোটরে বসিয়াছিলেন। কাছে গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে?" উত্তরে আমি বলিলাম, "দিয়ে নিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।"

শম্ভুবাবু ঠাকুরের সহিত কিছুদিন বেনারসে কাটাইয়াছিলেন। একদিন বিজয়নগর রাজপ্রাসাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহাকে ঠাকুর পরদিন সকালে যে বাড়ীতে চুনিবাবা মারা গিয়াছেন সেই বাটীতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার আত্মার শান্তিকামনা করাইতে বলিলেন। শম্ভুদার ভাষায় "পরদিন সকালে একথা মনে নাই। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া রাস্তা দিয়া আসিতেছি এমন সময় একটি বৃদ্ধা লাঠি হাতে আমায় বলিলেন, "বাবা, আমায় হাত ধরে আমাকে বাড়ী দিয়ে এস।" খানিক-দুর তাঁহার হাত ধরিয়া যাইবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বাড়ী কোথায়?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি বগলা ভট্টাচার্য্যের বাড়ী থাকি।" বগলাবাবু চুনিবাবার বিশেষ বন্ধু। অমনি চুনিবাবার কথা মনে পড়িল এবং ঠাকুরকে যে সকালে চুনিবাবার বাড়ী লইয়া যাইবার কথা ছিল তাহা মনে পড়িল। একদম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চুনিবাবা কি ঐ বাড়ীতে মারা গিয়াছেন?" বুড়ি উত্তর দিলেন, "চল, চুনিবাবু যেখানে মারা গেছেন, দেখিয়ে দোব। গঙ্গাজল, প্রদীপ, ধূপ, আসন দোব।" পৌঁছিয়া বাবার কাজ করিয়া মহা আনন্দে সতীশের বাড়ী (আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম) ফিরিয়া আসিলাম। বৈকালে প্যালেসে সাধুবাবার কাছে যাইবার পর আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"চুনিবাবার বাড়ী পেয়েছ?" আমার ভাষায় আর কথা রহিল না। মনে মনে বলিলাম, "হে ব্রাহ্মণ, এসব তোমাতেই সম্ভব।"

১৯৩০ সালে শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ১১নং হর ঢোল লেনে, আহিরীটোলায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় লইয়া আসেন। তাঁহার সহিত শীতলদা ও শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। সেই সময় মাঝে মাঝে শীতলদা হারমোনিয়াম বাজাইয়া দুপুরে কীর্ত্তন করেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়া সমাধিস্থ হইয়া যান এবং সমাধিভঙ্গে তাঁহাকে স্বীয় বস্ত্র দিয়া মস্তক মুণ্ডন করাইয়া 'অদ্বৈত' নাম রাখেন। ঐ বৎসর প্রাণগোবিন্দ চুনিবাবার বাড়ীতে দোল উৎসব করেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে ঠাকুর দেবেদের গৃহের বিশাল অঙ্গনে গোবিন্দজীর মণ্ডপ বানাইয়া দোল উৎসব করিয়াছিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার বৎসরে নিমু গোস্বামী লেনের শিবমন্দিরের মহেন্দ্রবাবুর সহিত দোল-উদ্‌যাপন করেন।

অরুণদাকে কয়বার নামদীক্ষা লইবার জন্য ঠাকুর নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু অরুণদা প্রতিবারই "শিক্ষাই শেষ হয় নাই, দীক্ষা কি লইব?" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। একবার বলিয়াছিলেন, "আপনি যদি আমায় কৈলাস-মানস সরোবরে লইয়া গিয়া দীক্ষা দেন তবে আমি দীক্ষা লইতে পারি।" তাঁহাদের কৈলাস-মানস সরোবরে যাওয়া হয়ে ওঠে নাই। একবার শ্রীরঙ্গম ও অন্যবার শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পর্শ ও চক্ষুদ্বারা শক্তি সঞ্চার করিতেন এবং প্রিয়জনকে আপন শক্তিতে বলীয়ান করিয়া তাহার সহিত লীলা করিতেন। নতুবা সামান্য কলিহত অন্নগত প্রাণের ক্ষমতা কি অনন্তশক্তিমানের সহিত সঙ্গ করেন? তিনি চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া স্বীয় শক্তি অন্য শরীরে সঞ্চারিত করিতেন।

১৯৩৯।৪০ সালের পর অর্থাৎ শংকরদার আশ্রম ছাড়িবার পর

প্রাণগোবিন্দকে আমি আরতি করিতাম। তাঁহার জন্মোৎসব তিন দিন ধরিয়া হইত এবং তিন চার বৎসর ব্যতীত প্রতিবৎসরই তিনি ঐ সময়ে আশ্রমে আগমন করিয়া ভক্তবৃন্দের পূজা, আরতি ও সেবা গ্রহণ করিতেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন।

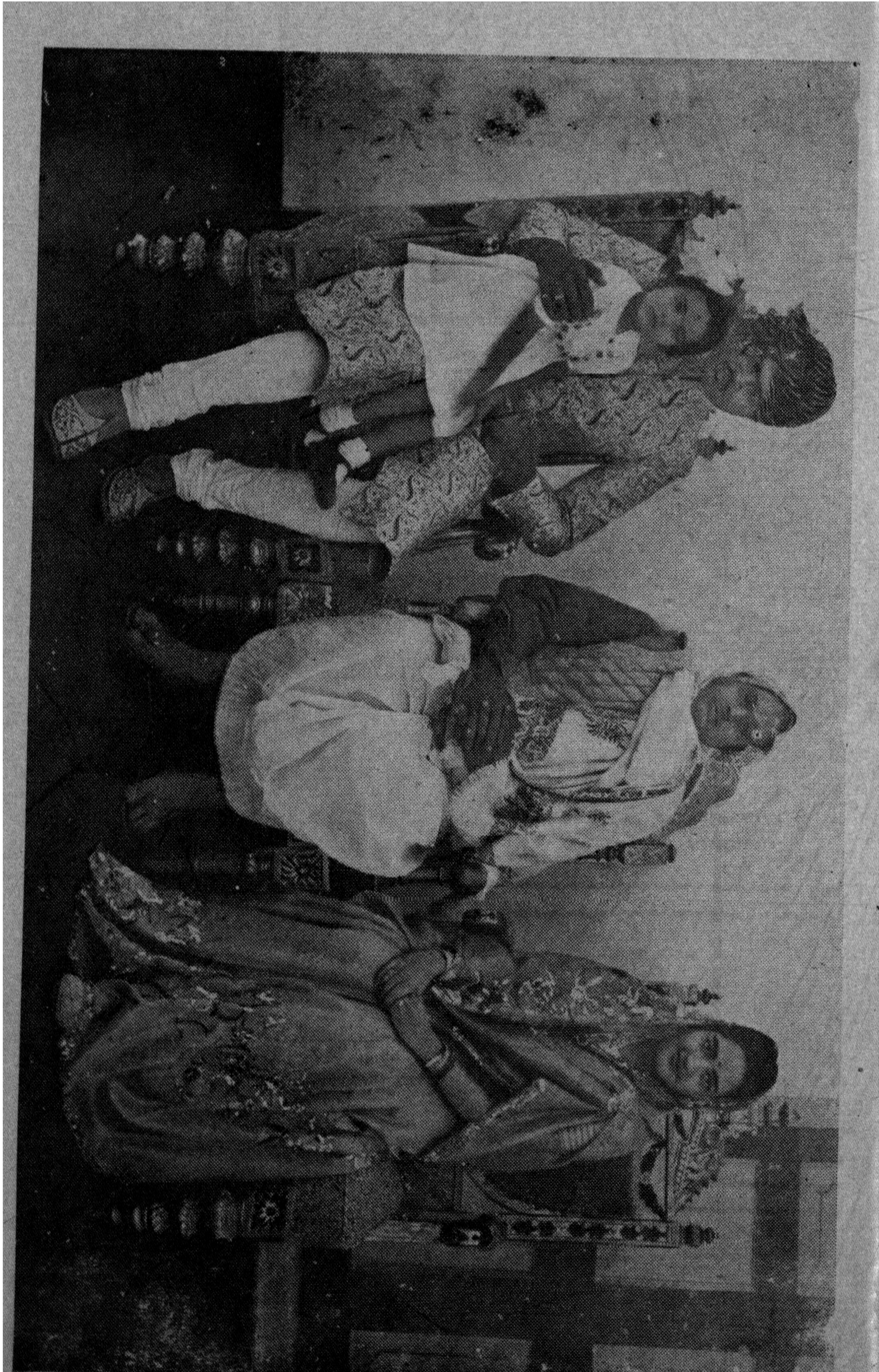
আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেন—ঠাকুরের 'নেপেন-বাবা'—গৃহী ভক্তদের ভিতর আদর্শ সেবক ছিলেন এবং বুকে করিয়া আশ্রমের দায় দায়িত্ব সামালাইতেন। ভবানীপুর নিবাসী 'নেপেনবাবা'র পুত্র শ্রীদুলালচন্দ্র সেন বিখ্যাত সরোদ-বাদক তখন উদয়শংকরের আন্তর্জাতিক নৃত্যের দলের সহিত বাজাইতেন। নৃপেনদা আশ্রমবাসী হইয়া বাক্সাড়ার ঘরে ঘরে নতুবা কলিকাতায় গিয়া ভোগের রসদ লইয়া আসিতেন। দিনের বেলায় বালতীতে রাঁধিয়া রাত্রের ভোগের জন্য পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মায়েদের দুটি মিষ্টি কথা শুনাইয়া প্রাণগোবিন্দের লীলা গল্পচ্ছলে বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা রুটী ও তরকারী করাইয়া আশ্রমে আনিয়া ভোগ দিতেন। এইভাবে প্রাণান্ত সেবা করিয়া ১৯৪১এর শেষে সামান্য কারণে "আশ্রমে আর আসিব না" বলিয়া চক্রবেড়িয়া রোডে নিজবাটীতে গিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিলেন এবং ভারী রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীসাধুবাবা সেই সময় আশ্রমে ছিলেন না। তিনি তখন রাজাপাড়ার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে থাকেন। তিনি আশ্রমে আসিয়া শুনিলেন যে নৃপেনদা রাগিয়া "আশ্রমে আর আসিব না, থাকিব না" বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দয়াল ঠাকুর ভবানীপুরে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, আশ্রমে দুই জন সখি সব সময় ঘোরা ফেরা করে। একজন শাক্ত, অন্যজন বৈষ্ণবী। কে যে কখন কাহার কোন কথাটি শুনিতেছে, তাহা বলিবার বা ধরিবার উপায় নাই। সখিরা তোমার ঐ "আশ্রমে আর আসিব না" কথাটি শুনিয়াছে এবং তুমি আর কোনও দিনই আশ্রমে যাইতে পারিবে না। তোমার ঐ কথাটি বলা ঠিক

হয় নাই” প্রভৃতি। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে গৌরীপুরের রাজকুমার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা, প্রযোজক ও নির্দেশক শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া ঠাকুরকে তাঁহার ‘গৌরীপুর প্যালেসে’ দুই মাস রাখিয়া যৎপরোনাস্তি সেবা করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মাধুরী গোবিন্দের শিষ্য ছিলেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা মাধুরী ও তাঁহার বাড়ীর অন্যান্য সকলে ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর যখন গৌরীপুরে ছিলেন নৃপেনদার বাড়াবাড়ি অসুখ হয় এবং ঠাকুরকে একাধিকবার টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার কথা জানানো হয়। কিছুদিন অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগের পর একদিন হঠাৎ নেপেনবাবা বলিলেন, “আমি বেশ ভালো আছি। কাল রাত্রে সাধুবাবা আসিয়া আমায় দর্শন দিয়াছেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন।” উহার বেশ কিছুদিন পরে ঠাকুর গৌরীপুর হইতে ফিরিয়া নৃপেনদাকে বাড়িতে দেখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, “বাবা, তোমার যেরূপ ভোগ রহিয়াছে, ইহাতে এই কর্ম ভোগ করিবার জন্য তোমাকে আবার জন্ম লইতে হইবে। এ ভগ্নশরীরে সে ভোগ শেষ হইবে না। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি আবার জন্ম লইয়া আইস। যাক্ এক কাজ করা যাউক। তোমার অবশিষ্ট কর্মভোগ এস আমরা বাপ বেটায় ভাগ করিয়া লই এবং সময়ে তোমায় ছুটি দিব।” কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন শুনিলাম যে ঠাকুরের ‘নেপেনবাবা’ আর ইহজগতে নাই। ঠাকুরের অহৈতুকী গুরুকৃপা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম। ঠাকুর তখন অগ্রদ্বীপে রহিয়াছেন। একদিন হঠাৎ উনি খাটে স্থির, শক্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরের এই ভাববৈলক্ষণ্য দেখিয়া নিকটে রহিলেন। কিছুক্ষণ পর সমাধিভঙ্গ হইয়া ঠাকুর অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, “এইমাত্র নেপেনবাবা চলিয়া গেল।” জানি না কোথাও এই ভাবে অবতার তাঁহার প্রিয়জনের কর্মভার স্বেচ্ছায় নিজস্কন্ধে উঠাইয়া মানবসন্তানদের

পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ



দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরে (১৯৪৪)



মুক্তি দিয়াছেন কিনা। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে ফিরিয়া নৃপেনদার জন্য ভাণ্ডার "নৃপেন্দ্রানন্দ স্বামীর মহোৎসব" করিয়া বালক ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গৌরীপুর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের লেখা চিঠি একটি উঠাইয়া দিলাম :—

গৌরীপুর
৩০-১-১৯৪২

প্রাণের ভাই রবিদাদা,

তোর চিঠিটা পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। মায়ের শরীর কেমন আছে জানাবি। তুই ও ভীষ্মবাবা কেমন আছিস জানাবি। নৃপেনবাবার অসুখ শুনিয়া চিন্তিত আছি। কেমন আছে চিঠি পাওয়া মাত্র জানাবি। এখানে সবাই ভালো আছে। রাজবাড়ীর সবাই ভালো আছে। বিডন ষ্ট্রীটের লালুদের খবর জানাবি—ওরা এখানে চিঠি দেয় নি। বোমা পড়িবার কোন ভয় নাই। সকলকে জানাবি। আশ্রমে খবর দিবি। তোরা আমার আশীর্ব্বাদ নিবি। বোমার বদলে বৌমা করবি—শীঘ্র বিয়ে করিবি।

মাকে আশীর্ব্বাদ জানাবি। সিংহী মায়ের খবর জানাবি।

ইতি—তোর সাধুদাদা

ঐ সময় গৌরীপুর হইতে তিনি একটি সুবৃহৎ পত্র আশ্রমে স্বহস্তে লিখিয়া পাঠান। উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

(১)

ওঁ নমঃ নারায়ণায় শ্রীমন্নারায়ণায়

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি, নাম ও প্রেম এই ছয়টি ভগবানের ঐশ্বর্য্য তোমাদের উপর ভার দিয়াছি; অরুণ কর্ম, শীতল জ্ঞান,

কৃষ্ণ বা কুতু ভক্তি, দাদু বা হরিধন মুক্তি, নাম শংকর, প্রেম ও গোপী নন্দকুমার পরে পরিতোষ, তুলসী, মাষ্টার, মটুক এবং আরও দুই জন। আরো অনেক অনেক আছে; রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই চার জন·········সিদ্ধপুরুষ বাস করিয়া আবার আবার হইয়া চলিবে।

(২)

ওঁ ওঁ শ্রীশ্রীহরি শরণং ওঁ হরিঃ তৎসৎ হরি হরি বোল হরি বল অনেকদিন হইল হরি তোমার দেখা না পাইয়া যেন পারি না, আমি কে তুমি কে কোথায় মিলন কে কোথায় ভাব ও মহাভাব কে বলিবে তাও কে কাহার সঙ্গে এই প্রমাণ কে দিবে এবং একা আমি নই, তুমিও একা নও, তোমাতে আমাতে অভিন্ন যখন চৈতন্যমার্গ, চৈতন্য প্রদেশে থাকিয়া কেন অসূয়া মনে ভজনা সাধনা করিয়া এমন করিতেছ কেন? তোমাদের জন্য আমাতে ও তোমাতে প্রেমের সম্বন্ধ হইল। সোনা হয়ে যাবে সব এই আমি কাঞ্চনে কনক পদ্ম শঙ্খ চক্র ধারণ করিয়া ধর্ম্ম সহায়েতে পরম আত্মীয় সেই একদিন যেভাবে প্রবেশ করিয়াছ সেই পরমাত্মীয় প্রদীপ জ্ঞান পাইবে। সেই ভগবান গোবিন্দ আদি পুরুষংত্বম অহং ভজামি ~~~~ পুনশ্চ রাম বা—জগৎ, ম—ঈশ্বর জ্ঞানে ~~~~~~~~~~~~~~~~

(৩)

পরমার্থ তত্ত্ব, আমরা যে বাড়ীতে, সিদ্ধিদাতা গণেশ পশ্চিম পার্শ্বে নাগেশ্বর চাঁপা পুন্নাগ মুকুল নানা বিষধর সর্প ব্যাঘ্র ও হস্তী কুলধরাজ নাই; এরা বশিষ্ঠ গোত্র সূর্য্য বংশের ক্ষত্রিয় সন্তান রাজপুত, বংশ ভাল, সাধ্য সাধন হইলেই পূর্ণ ভাবে জাগ্রত হইবেন। এইমাত্র জ্ঞানবাবুর চিঠি পেলাম, তাহাতে নেপেনবাবার খবর পাইলাম, তুমিও ছিলে সেখানে তাই আমিও সেখানে, তাহাই

অগ্রভাগে তোমায় দেখিয়া আত্মপান্ত দেখিয়া লইয়া আশ্রমবাসী হয়েছে। শীতলদা বালি বধ করে এইমাত্র হনুমান লঙ্কা লাফ দিয়া মধুবন খেয়ে লঙ্কা পুড়ায়ে সীতারাম সংবাদ হয়ে গেল, পরে সেতুবন্ধ, বিভীষণকে পদাঘাত ও রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলন এবং…………লোচন বধ দূত সংবাদ হয়ে গেল। পরে রাবণের সবংশে নিধন, তারপর সীতা উদ্ধার পরে পুষ্পক রথে অযোধ্যা যাত্রা অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি পালা হয়ে স্বর্গারোহণ। ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

পুনশ্চ—এই কর্ম্ম জ্ঞান রবাহুত সংবাদে একপ্রকার আমাদের একপ্রকার সর্ব্বখল্লু ইদং ব্রহ্ম নেহ নাশস্ত কিঞ্চন। এই মত কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি মুক্তি নাম ও প্রেম এই সকল ব্যাপকভাবে আমাদের অনালম্বন সর্ব্ববিধ সঞ্চারিত করিয়া তাহাদের এই অপ্রত্যাশিত কর্ম্মফল তাহাদের সমবায় সম্বন্ধতে আসিবে বলিয়া মনে হয়; সে যখন আপনমনে কোনও কর্ম্মফল তাহাকে আরোপ করিবে না।

(৪)

এইভাব তাহাকে দেবেন-(দাদুকে) শীতলদাকেও ভাল করিয়া জানাবেন সে যদি আনন্দের সহিত ভগবৎ কর্ম্ম করে তাহা হইলে একটির পর একটি করিয়া পুনরুদ্ধার করিতে হইবেই। ইহাতে আমাদের সংশয় নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, ভক্তি নাই কেবল ধর্ম্ম সহায়। ভগবান কর্ম্মী মানুষকেও নয় ভক্তিতে ভক্ত, প্রত্যক্ষ দর্শনে জ্ঞান, নামে নামী, প্রেমে প্রেমিক। ধ্যান ও ধারণা দ্বারা ধমনীর বুদ্ধি বৃত্তি পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হয় এই হইল সাবেধনা ভবন্ততে। এবার অমানুষিক শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। শক্তি না হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি, নাম ও প্রেম কো পি লভ্যাতে; তাই শক্তির প্রয়োজন, শক্তি পূজার প্রয়োজন। অভাবনীয় আপ্রান অবলম্বনে আমাদের আপন আপন শক্তি হয়ে মিলিত শক্তিতে যোগ দিবে। গৃহী ও সন্ন্যাসী এবং সংযমীর

প্রতিষ্ঠান কর্ম্ম আপনা আপনি চলিবে। একদিন এমন আসিবে তাহাতে কর্ম্ম করিবার ভাবনা থাকিবে না। অমনি সেই প্রত্যক্ষ করিবা, এখানেও যেমন সেখানেও তেমন। আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধ সকলের হইবে। তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই বিশ্বরূপা·········সেই করিবে। অহংদেশে অহমিকা ভাষা অনেক অভ্যাস হইয়া গেল; তাই অমনি কর্ম্মফল কর্ম্মফল করিলে চলিবে না; সেই তাহাতে কর্ম্মফল তাঁর কর্ম্ম ও তাঁর কর্ম্মী, তুমি তোমাতে যে কর্ম্ম সমস্তই তিনি করিয়ে নেবেন; তোমাকে করিতে হইবে, মন প্রাণ আমার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। সেই মন প্রাণ কি তাহার হয়, সে আর নিজের কিছু করিতে পারে না; তার কর্ম্ম তখন তাহার নয়, দেওয়া ও থাওয়া, লওয়া ও খাওয়া, কওয়া ও খাওয়া এই করিয়া এই অমূল্য সময় নষ্ট করিও না। শিবু বাবা মা দীঃ রবি বাবা ও মা দীঃ বনমালী বাবা ও মা দীঃ শ্যামকান্ত বাবা ও মা দীঃ ছুলাল বাবা ও মা কোম্পানী দীঃ কাল, ভাল, নরহরি খান্দি প্রঃ বাবা ও মা কোং দীঃ পরিতোষ মা ও ছেলেরা দীঃ, সেজ ও ন কাকা এবং কাকী, জীবন বাবা ও মা দীগর, ইন্দুর বাবা ও মা দীঃ পরেশ বাবা মা দীঃ রাধারাণী মা বাবা, সাধন বাবা ও মা, ভোলা বাবা, বিভূতি বাবা মা দীগর সান্যাল বাবা ও মা দীঃ ভট্টাচার্য্য মা বাবা কোম্পানী দীঃ সারদা দেবী আদি সমস্ত দাদা মণিদের সাদর সম্ভাষণ এবং আর আর সমস্ত বাকসাড়া, বেতড় ও জগাছা ভাইদের সাদর সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলাই শঙ্কর বাবা মা দীঃ ব্যোমকেশ আদি যখন সেখানে আছে সকলকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলিবে তাহাদের কোনও ভয় নাই।

(৫)

গৌরীপুরের উত্তরে লাওখার ও একটু দূরে হিমালয় দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বে গদাধর ও পশ্চিমে রেল লাইন। নানাবিধ বিহঙ্গমের দিবারাত্রি আর্ত্তনাদ ৬।৯।২২।৩। রাত্রি

৩টার সময় উল্লুকের মহা কর্কশ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; পাপিয়া কোকিল ও দোয়েল প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষীর আনন্দ কলরব, নানা প্রকার মানুষের হরিনাম কীর্ত্তন, মা কোম্পানীর নোটকীর্ত্তন হয়ঃ—'নোট নে গো তোরা, নোট দে নোটনে, নোট দেগো তোরা, ব্রজ হইতে হাত বাড়াইল ব্রজের মাখম চোরা, নোট নে গো তোরা'—আনন্দেই দিন কাটায়। এখানের অধিবাসীরা ভাল, তবে অন্য ভেজাল মিশে সব গুলিয়ে গেছে; মা মহামায়া এদের উপর মহারুষ্ট হয়েছিলেন; মা মাধুরীর অন্তর ক্রন্দনে মা অনেকটা প্রসন্ন হয়েছেন; **এই মাত্র মার রোদন-স্বর স্পষ্ট শুনা যায়।** এদের গুরুভার গুরুপাপ গোধন নষ্ট, বিজয়নগরের গোষ্ঠাশ্রমের মত, নারায়ণ এদের শুভমতি দিবেন। নিশ্চয় পরমানন্দধাম গৌরীপুর, মা আনন্দময়ী যেন বিরাজমান তবে অদর্শন ভাবে।

(৬)

যদি বলেন তাহা হইলে এঁকে সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যাইব; এইমাত্র তোমাদের সঙ্গের কথা মাকে বলিলাম, "তুমি ত এলে, কিন্তু তোমার এখানকার সেবার ও সেখানকার সেবার খরচা কে চালাবে? টাকা, মোহর, স্বর্ণমুদ্রা, পান্না, হীরা, জহর, মণিমাণিক্য লইয়া আইস; বেশী নয়ঃ—

মাত্র ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
২০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
৩০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
৪০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
৭০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
৯০০০০০০০০০০
৮৯৮৯৭০০০০০০০০০০০০
১০৮৯১২৩৪৫৭৮৯৮৭৬৫৭৩৮৭৯৮৭৯৮৯৮৯৮০১

এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা হইলে নিত্যপূজা ও সেবা হয় ; কি করি, মার ইচ্ছা ; তিনি যা করিবেন তাই হবে ; আশা করিনা, ভয়ও করিনা— মাও তুমি, দাদাও তুমি, যা কর তাই হবে" এই মাত্র বলিলাম মাকে।

(৭)

আবার লিখি, আর লেখে কি, আবার লেখ কি ?

অরুণদাদা—

এখান হইতে তোমাদের

কর্ম্ম করিতেছি

শ্রীমৎ অরুণানন্দ স্বামিজী সমীপেষু,

তুমি ভাই মনে কিছু করিবে না ; দাদুই আমাদের পিতামহ ভীষ্মদেবের মত ; দাদু এখন তোমায় জ্বালাতন করিয়াছে, সকলি মার ইচ্ছা। তোমার ধার আমি শুধিতে পারিব না ; তোমায় ভগবান ভাগ্যবান কুলে এবং বীরপুরুষ ভাবে জন্ম দিয়াছেন ; তাহা না হইলে এই কর্ম্ম কাহারও দ্বারা হইত না। আমি ফিরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তুমি দাদুকে ও নেপেনবাবাকে বাঁচিয়ে রেখ ; তোমার হাতে সবই রহিল। এই মাত্র তোমাদের কথা হইতেছিল। এখানে রাজসূয়যজ্ঞ ও ৺সরস্বতী পূজার দিন নেপেনবাবার অসুখের কথা শুনিলাম।

(৮)

এই মাত্র অনেক অনেক মহিম মহিমাময় আবেশ আবেশ হইয়া পূর্ণ করিবে ; তখন একদিন তাহারা শীঘ্র আসিয়া যোগ দিবে। এই মাত্র তোমাদের পত্র দিব, তাই এখানে আলম্বন, উৎপাদন,

অধিবেশন কর্ম্ম আরম্ভ হইবে; বোমা পড়িবার ভয় নাই তাহাদের বলিবে; অনেকের মনে আতঙ্ক ক্রিয়ত্তাসন লোপকারী বর যজ্ঞ করে তাহারা একাধারে মনন করিয়া আরাধনা করিবে। এবার অনেক লম্বা ট্রিপ। আমি এখন আমাতে নাই—সমষ্টি আমি এক বিভূতি ভ্রষ্ট করে, তাই এই বেলা আপন বুঝে চল না মন—মনে প্রাণে এক ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে সেই মত একটির পর একটি করিয়া যাগ যজ্ঞ, ব্রত, শস্য, বৃষ্টি, স্বর্ণ, হীরক, মতি, পান্না, মণিমাণিক্য=(অবোধ্য) পাব এবং নিবারণ জল পান আপ্রাণ ভরে ~~~~~~~~~~~ চিঠিখানা অনেক লম্বা হইবে, তাহা পাঠ করিতে তোমরা কোন ভার মনে করিবে না।। আজ ৺সরস্বতী আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মপুত্র সলিলে উঠিয়া চতুর্ভূজ মূর্ত্তিমান হয়ে বামধারে শ্রীশ্রী৺মহালক্ষ্মী, দক্ষিণে শ্রীশ্রী৺পার্ব্বতী সকলেই চতুর্ভূজ মূর্ত্তি।

(এই অবধি লিখিয়া চিঠি শেষ হইল)

শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে আগমন করিলেই নিত্য উৎসব লাগিয়া থাকিত। সকালে ১১টা হইতে দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যায় ছয় ঘটিকা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিত। উহার ভিতর হোমকুণ্ড খনন, যজ্ঞ ইত্যাদি লাগিয়াই থাকিত। কখনও রাত দুইটার সময় ঘুম হইতে উঠাইয়া পুকুরে স্নান করাইয়া যজ্ঞে বা পাঠে বসাইতেন।

ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর বিজয়নগর যাত্রা করেন। সঙ্গে থাকেন দাদু, শীতলদা ও অরুণদা। পরে রবি, অদ্বৈতদা ও মুক্তিদি যোগদান করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বরে তিনি বারাণসীতে বিজয়নগরের মহারাজার রাজপ্রাসাদে কাটান। ঐ বৎসর স্যার বিজয়

চাঁদের পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করান এবং 'ভিজি'র কালক্রমে দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে অরুণদা ও অন্যান্য ভক্ত সমভিব্যাহারে ভিজির পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করিতেছিলেন ঐ সময় আশ্রমে আমাদের প্রিয় চক্রবর্ত্তীদা দেহত্যাগ করেন। কচিদা বা চক্রবর্ত্তীদা (শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী) দেবের বিডন ষ্ট্রীটের ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিতের পুত্র ছিলেন। তিনি আকৃতিতে খুব খর্ব্বকায় ছিলেন বলিয়া সকলে 'বেঁটে চক্রবর্ত্তী' বলিয়া ডাকিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকার্য্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্রমের প্রথম অবস্থায় শংকরদা ও দাদুর পর চক্রবর্ত্তীদাই আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া দিন রাত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগাদি নিজহস্তে তৈয়ার করিয়া ভোগ দিতেন। দেখিতে খর্ব হইলে কি হইবে কার্য্যে বা পাঠে তিনি পারদর্শী ছিলেন। পুরুলিয়াতে শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নের সেবা করিয়া নিজে সেই রোগ গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তুলসী প্রথম অবস্থায় চক্রবর্ত্তীদার সহযোগী বা এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হইয়া আশ্রমে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। চক্রবর্ত্তীদার দেহ রক্ষার সময় আশ্রমে প্রবীণদের মধ্যে কেহ ছিলেন না। আমি, তুলসী, মটর, রঘুনাথ প্রভৃতি ছিলাম। তখন আমার ১৮।১৯ এবং তুলসীর ২১।২২ বৎসর বয়স হইবে। এইভাবে ঠাকুর ধীরে ধীরে আমাদের স্কন্ধে আশ্রমের গুরুদায়িত্ব চাপাইতে থাকেন। পাড়ায় সেই সময় কথা উঠে যে দুইটি নাবালক আশ্রমবাসীর উপর এত বড় রুগী ও আশ্রম চালাইবার ভার ন্যস্ত করিয়া ঠাকুর খুব অবিজ্ঞোচিত কাজ করিয়াছেন।

১৯৪১ সালে একচালা টিনের ঠাকুর ঘরের ভিতর একটি ছোট লাল বেদী ছিল। উহা এখনও প্রাচীন স্বাক্ষর বহন করিয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি দুই এক বৎসর হইল ঐ ছোট্ট লাল বেদীটিতে একটি অদৃশ্য চরণের ছাপ পড়িয়া খানিকটা গর্ত্ত

হইয়া গিয়াছে। এখনও তদ্রূপই রাখিয়া দিয়াছি। ঐ বেদীর পিছনের দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বড় ফটো ছিল এবং বেদীতে রাখা তিনটি ঘটের সহিত ঐ ফটোও পূজিত হইত। অরুণদার নির্দ্দেশ ছিল যেন কেহ ঐ ফটো অপরিস্কার না করেন অর্থাৎ চন্দনাদি না ছেটান। ভাবে ও ভক্তিতে সাধারণতঃ ভক্তগণ তাঁহাদের গৃহে ঠাকুরের ফটোতে ভক্তিচন্দন ও তুলসী অর্পণ করে।

একদিন দেখা গেল ঠাকুরের ফটোতে মাথায় কপালে চন্দন মাখানো রহিয়াছে। ইহাতে অরুণদা বিরক্ত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। দাদু, শংকরদা, চক্রবর্ত্তীদা, তুলসী, পরিতোষ প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তর না পাইয়া শেষে পাশের বাড়ী হইতে আমার মাকে অর্থাৎ আন্নারাণী দেবীকে ডাকাইলেন। পিতার দেহরক্ষার পর আমার মা প্রত্যহ সকালে বাড়ীর ঠাকুরঘরে শিবপূজা ও জপ সারিয়া আশ্রমের ঠাকুরঘরে জপে বসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তাঁহার অগাধ ভক্তিনিষ্ঠা ছিল। মায়ের প্রেরণা, আশীর্বাদে ও প্রশ্রয়ে ভাইয়েদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমি আশ্রমে আসিতাম। আমাকে মাতা-ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ ও অনুমতি দেন। তিনি ঠাকুরকে সন্তানবৎ স্নেহ করিয়া "তুমি" সম্বোধনে কথা বলিতেন। প্রাণের গোবিন্দ আশ্রমে থাকিলে প্রত্যহ শিবকে দেওয়া চন্দন তাঁহার কপালে লেপন করিয়া যাইতেন। মা আশ্রমে আসিয়া অরুণদার প্রশ্ন শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা হয়ে কি করে বেদী ছোঁব? যেখানে শালগ্রাম শীলা 'চক্রধর' নারায়ণ রয়েছে, ঘট রয়েছে, গ্রাস কেসে মা দুর্গার মূর্ত্তি রয়েছে মেয়েছেলে হয়ে কি আমি ছুঁতে পারি?" বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। অরুণদা কাহারও স্বীকারোক্তি না পাওয়াতে আশ্রমের আবহাওয়া কিছুটা অস্বস্তিপূর্ণ হইল।

ঐ দিন বৈকালে অন্তর্যামী নারায়ণ হঠাৎ কলিকাতা হইতে আশ্রমে আসিলেন। অরুণদা ঠাকুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া ঠাকুরঘরে লইয়া সমস্ত দেখাইলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া পাশের বাড়ীর আন্নারাণী মাকে ডাকিতে বলিলেন। মা আশ্রমে আসিলে তাঁহাকে পরম করুণাময় ঠাকুর বলিলেন, "মা তুই আজ সকালে ঠাকুরঘরে জপ করিবার কালে আমার কপালে চন্দন দিবার জন্য খুব ভাবাম্বিত হইয়াছিলি। তোর চোখ দিয়া খুব জল পড়িতেছিল। তুই কাঁদিতেছিলি। আমি তোর চোখের জলে ভিজানো ভক্তিচন্দন কপালে ধারণ করিয়াছি। তুই যেইরূপ মনে করিয়াছিলি ঠিক সেইভাবে চন্দন ফটোতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সব ইহারা কি করিয়া বুঝিবে মা" প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আশ্রমস্থ সকলের মন হাল্কা হইয়া গেল এবং সকলে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া রহিলেন।

ঐ দিন হইতে ঠাকুরের উপর মায়ের ভক্তিবিশ্বাস আরও বাড়িয়া গিয়াছিল এবং শ্রীপাদপদ্মেও চন্দন দিতে লাগিলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে শুরু করিলেন। ফটোতে ঐ ভক্তিচন্দন বহুদিন লাগিয়াছিল এবং পরে ঐ ফটোটি ঠাকুর দমদম নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বাবাকে দীক্ষা দিবার পর উপহার দেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরে অদ্যাপি ঐ ফটোটি শোভা পাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে বসিয়া জপ করিবার জন্য একটি ব্যাঘ্রাসন ও একটি তামার ঘট দিয়াছিলেন। মা প্রথমে ঐ ব্যাঘ্রাসন ব্যবহার করিতে ভয় পাইয়াছিলেন, পরে উহা ব্যবহার করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কত যে অলৌকিক লীলা ঘটিত তাহা যেরূপ বর্ণনাতীত সেইরূপ সংখ্যাতীত। যাঁহারা সঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারা কিছু অনুভব করিয়াছেন এবং তিনি যাঁহাকে দয়া করিয়াছেন তিনিই ধন্য হইয়াছেন। দর্শন করিয়াছেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার বৎসর হইতে পাড়ার বহুভক্তের মধ্যে এক চাষী আশ্রমে বহুরকম কায়িক সেবা করিয়া গিয়াছে। সে আশ্রমে তাহার ক্ষেতের আনাজ তরীতরকারী ও বিশেষ ঝাল লংকা দিত। ঠাকুর তাহার নাম লংকাবাবা রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণ বাকসাড়ায় তাহার ক্ষেত ছিল ও তাহার বুড়িমাও ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়ে। তাহার নাম 'ডাঁটাবুড়ি' রাখা হইয়াছিল এবং ঠাকুর তাহার সহিত খুব রঙ্গ করিতেন। ন্যুব্জদেহী বুড়িমা দূর হইতে ঠাকুরকে "গোবিন্দ" "গোবিন্দ" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সারা পাড়াকে জানাইয়া আশ্রমে আসিত। লংকাবাবা সেই সময় আশ্রমে কীর্ত্তনের সহিত শ্রীখোল বাজাইয়া সকলকে আনন্দ দিত ও সকল কাজে নির্বাক কর্মী হইয়া যোগদান করিত।

আমার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, ডাক নাম 'মটর' বা 'মটু' আশ্রমের শিল্পী ও নির্বাক কর্মী ছিল। আশ্রমের পুকুরে এক বৎসর দেখা গেল প্রতিমার একটি কাঠামো ভাসিতেছে। ঐ কাঠামোতে মাটি মাখাইয়া সরস্বতী প্রতিমা তৈয়ার হয় এবং একটি মাটির পাহাড় তৈয়ার করিয়া প্রতিমাটি তাহার উপর বসাইয়া পূজা করা হয়। সেই সময় আশ্রমের যাহা কিছু শিল্পকার্য্য সবই তাহার দ্বারা হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর অগ্রদ্বীপে আশ্রম করেন। উহা এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মটু ঐ আশ্রমের সমস্ত পূজা, পাঠ, ভোগ, রান্না প্রভৃতি কর্ম করিত। কোরকোণ্ডায় ১৯৪৪ সালে কালী প্রতিষ্ঠার পর দুর্গাপূজা ও অন্নকূটের সময় আশ্রমে উপস্থিত থাকিবার জন্য দুই তিন মাসের জন্য আমি ও তুলসী কোরকোণ্ডা হইতে চলিয়া আসিতাম। ঐ দুই তিন মাস আশ্রম হইতে সে ও শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় বা 'মাষ্টার' কোরকোণ্ডায় গিয়া পূজা পাঠে ব্রতী হইত। সে কিছুদিন বাদে আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে গিয়া বসবাস করিতে থাকে এবং অকালে রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ করে।

আমার অন্য খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীমান রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় আশ্রমের একজন নির্বাক নিরলস কর্মী ছিল। দাদুর দেওয়া নাম 'মাষ্টার' নিজেকে এমনভাবে সেবায় সমর্পণ করিয়াছিল যে নিজের খাওয়া-দাওয়া, বেশভূষার দিকে আদৌ নজর দিত না। সব সময় নিজেকে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রাখিত। কোরকোণ্ডায় তাহার ব্যবহারে সকলে আনন্দিত হইয়াছিল। সকল কার্য্যেই পারদর্শী ছিল এবং একলাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরান্না, পূজা, কীর্ত্তন, বাসন মাজা প্রভৃতি করিত। ১৯৬৩ সালে জুলাই মাসে সে আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।

১৯৪২।৪৩ সাল নাগাদ একটি ঘটনা বাকসাড়া, শিবপুর অঞ্চলে প্রচুর আলোড়ন উঠাইয়াছিল :

আশ্রমের প্রতিবেশী শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে বয়স প্রায় নয় দশ বৎসর হইবে সকালে হঠাৎ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটি পটি বাঁধা। ঠাকুর আমার সেই সময় স্নান সারিয়া ঠাকুর ঘরে পূজার আসনে কিছুক্ষণ বসিয়া বাহিরের রকে আসিয়া বসিয়াছিলেন। মেয়েটিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "তোর কি হইয়াছে? হাতে পটি বাঁধা কেন?" সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি প্রাণ হারাইয়া সপাটে মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে সব ঠাণ্ডা, প্রাণের কোন স্পন্দন নাই। ঠাকুর চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন এবং সত্বর ডাক্তার ডাকিতে বলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিৎকার শুনিয়া পাড়ার অনেকে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। পাঁচ সাত মিনিটের ভিতরে নাম করা এ্যালোপাথ ডাঃ সুশীল সান্যাল, হোমিও-প্যাথ ফেলু ডাক্তার, সামনের বাড়ীর শিবুদা ছুটিয়া আসিয়া মেয়েটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে মেয়েটি মারা গিয়াছে। ডাক্তারগণ কোনওরূপ চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন না কারণ উহাকে পুর্নজন্ম দেওয়ার বিদ্যা তাঁহাদের জানা ছিল না। সাধুবাবাকে

সকলে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন যে মেয়েটির আয়ু ফুরাইয়া গিয়াছে তাহাতে আর ওনার কি করিবার আছে। ঠাকুর কিন্তু বুঝিবার নয়।

প্রাণের ঠাকুর তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "মা কেন উহাকে আমার নিকট আনিল? আমার সামনে কেন উহার প্রাণ লইয়া যাইবে? ইহা কখনও হইতে পারে না" বলিয়া আপনার কমণ্ডলু হইতে গণ্ডূষ গণ্ডূষ জল লইয়া মেয়েটির মুদ্রিত চোখ দুইটিতে সজোরে জলের ঝাপ্টা মারিতে লাগিলেন এবং "মা" "মা" বলিয়া চিৎকার করিয়া "আমি কিছুতেই ওকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে দিব না" বলিতে লাগিলেন। সে যেন ঠাকুরের এক পাগলের অবস্থা। বিহ্বলনেত্রে তাকাইতেছেন আর জলের ঝাপ্টা মারিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সুশীল ডাক্তারকে, "দেখো" "দেখো" বলিয়া নাড়ি দেখিতে বলিতেছিলেন। হঠাৎ ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, মনে হচ্ছে নাড়ির স্পন্দন যেন পাচ্ছি।" তাহার পর ধীরে ধীরে মেয়েটির ঠাণ্ডা শরীর যেন একটু গরম হইয়া উঠিল। সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। তাহারপর মেয়েটি চোখ চাহিল, পাশ ফিরিল। এই দেখিয়া সুশীল ডাক্তার, ফেলু ডাক্তার, শিবুদা সাধুবাবার চরণে গিয়া আছড়াইয়া পড়িলেন। প্রত্যেকে বিস্ময়াভিভূত। সকলেরই চক্ষে জল। সাধুবাবাও নির্বাক হইয়া অজস্রধারায় কাঁদিতেছেন, ছল ছল নেত্রে চাহিয়া আছেন। আশ্রমে আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল। স্বয়ং জগজ্জননীর আবির্ভাবে আকাশ বাতাস প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর আমার অচল অবস্থায় বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটিকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া চরণামৃত ও গরম দুধ পান করাইয়া স্বয়ং তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। মেয়েটির বাড়ীর লোকেরা বুঝিতে বা ধারণাই করিতে পারিল না যে মরা মেয়েকে তাহারা গুরু গোবিন্দের অলৌকিক কৃপায় ফিরিয়া পাইয়াছে।

প্রাণগোবিন্দের একটি ভাব আমরা লক্ষ্য করিতাম। তিনি ধনী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া তাহাদের অর্থ দীন দুঃখীর কল্যাণে, সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাহাদের দ্বারা ব্যয় করাইতেন।

বালিতে শ্রীশম্ভুপ্রসাদ ঘোষালের বাড়ীতে ঠাকুর তাঁহার এক ভক্তকে "একটি মা আসিতেছেন। তাহাঁকে বসাইয়া রাখিবে, আমি এই আসিতেছি" বলিয়া রোগী দেখিতে শ্রীরামপুরে যাত্রা করেন। কিছুক্ষণ বাদে একটি মা গাড়ী করিয়া আসিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ঠাকুরের সন্ধান করিতে থাকেন এবং ঠাকুর যে তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছেন উহা তাঁহাকে জানানো হয়। উনি ভবানীপুর নিবাসী অ্যাটর্নী শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইন্দুমতী দেবী (সুন্দর মা)। তিন চার ঘণ্টা বাদে ঠাকুর যখন শ্রীরামপুর হইতে রোগী দেখিয়া ফিরিলেন ইন্দুমতী দেবী ঠাকুরের চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া ঐ রাত্রেই তাঁহার স্বামীর রোগমুক্তির জন্য ঠাকুরকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ঠাকুর পুনরায় ঐ রাত্রেই বালি হইতে ভবানীপুরে আগমন করিয়া বীরেশ্বরবাবুর ব্যাধিমোচন করিয়াছিলেন। ঐদিন হইতে তাঁহারা ঠাকুরের ভক্ত হইয়া উঠেন।

কত শত, সহস্র লোক কলিকাতায় ঠাকুরের কৃপাধন্য হইয়াছেন সকলের নাম, ধাম আমাদের জানা নাই। এই পুস্তক প্রকাশ হইবার পর সেই সকল ভক্তবৃন্দ ইহা পাঠ করিয়া ঠাকুরের সহিত তাঁহাদের প্রত্যেকের বিচিত্র লীলাকাহিনী স্মরণ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

হরিশ মুখার্জী রোডে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দীর্ঘাঙ্গীর বাড়ী। ডাঃ দীর্ঘাঙ্গী প্রাণ গোবিন্দের ভক্ত ছিলেন। ১৯৩০।৩১ সালে একদিন ঠাকুর কাহাকেও না বলিয়া একাকী সিমলা ষ্ট্রীটের শ্রীগোবর্দ্ধন গোঁসাইর বাড়ী হইতে সোজা ভবানীপুরে ডাঃ দীর্ঘাঙ্গীর

বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ ওনার সমাধি হইয়া যায়। ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে হৈ হৈ পড়িয়া যায়। সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। কি করণীয় বুঝিতে না পারিয়া ডাক্তার দীর্ঘাঙ্গী গাড়ী করিয়া সোজা সিমলা ষ্ট্রীটে গোঁসাইবাড়ী আসিয়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের লইয়া যান এবং তাঁহারা ডাঃ দীর্ঘাঙ্গীর বাড়ীতে গিয়া কীর্ত্তন ও আরতি করিয়া গোবিন্দের সমাধি ভঙ্গ করেন। কখন, কোথায়, কোন অবস্থায় ঠাকুরের যে সমাধি হইয়া যাইত কেহ বুঝিতে বা বলিতে পারিত না। এই সকল ঘটনা লাগিয়াই থাকিত। শ্রীদেবী, ভূ-দেবী ও নীলা দেবী তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

১৯৪২ সালে জুলাই মাসে ঠাকুর আমাদের লইয়া অগ্রদ্বীপে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সাবিত্রী আশ্রমে' লইয়া যান এবং অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করান। শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য অগ্রদ্বীপের জমিদার ও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার উদ্যোগে ঠাকুর বর্দ্ধমান জিলার ঐস্থানে বহু লীলা করিয়া গিয়াছেন। ঐ বৎসর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাস গৌরীপুরে। এপ্রিল মে মাসে ঠাকুরের সহিত বা পরে বিজয়নগরে অরুণদা, দাদু, শীতলদা, অদ্বৈতদা, মুক্তি দেবী, রবি, প্রভৃতি গিয়াছিলেন। রাঘব আচারী, ডাঃ রামা আয়েঙ্গার, রাঘব স্বামী প্রভৃতির গৃহে বাস করিয়াছিলেন। জুন জুলাই মাসে আমাদের লইয়া বর্দ্ধমান জিলার অগ্রদ্বীপে ছিলেন। শ্রীজন্মাষ্টমী পূজা, অন্নকূট কাটাইয়া ডিসেম্বর মাসে বেনারসে কিছুদিন বিজয়নগর রাজপ্রাসাদে থাকেন।

১৯৪৩ সালে আমার মাতৃবিয়োগের পর ঠাকুর আমাকে, তুলসী ও অরুণদাকে লইয়া মধুপুরে কিছুদিন কাটান। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়দিনের জন্য মধুপুরে রাখিয়া অরুণদা আমাদের মধুপুর হইতে

বৈদ্যনাথধামে লইয়া যান। মধুপুরে তুলসীর ডায়েরী হইতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি——

— মধুপুর যাত্রা —

মধুপুর যাত্রা করিবার সময় আমরা চারজন গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীসাধুবাবা, অরুণদা, তুলসী, পরিতোষ আমরা সকলে আশ্রম হইতে বুদ্ধদেব বাসে ১৩৫০ সাল ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার বৈকাল ৫।৬টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রা করি। ট্রেন ৯টার সময় ছাড়িল।………বৃহস্পতিবার ১০।।০টার সময় মধুপুরে আসিয়া সুধীরদা ও ডাক্তারবাবু ষ্টেশনে আসেন। ষ্টেশনে সাধুবাবার জন্য একখানা মোটর গাড়ি ছিল। সাধুবাবা, অরুণদা ও পরিতোষ মোটরে চড়িয়া মধুপুরে চলিয়া গেল। আমি একটি এক-এনে টমটমে চড়িয়া মালপত্র লইয়া মধুপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।………

এখানে প্রত্যহ ভোর বেলা একটি সুন্দর হাওয়া দেয়। তাহা অতি মনোরম কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মুরগীর ডাকও তেমনি কর্কশ শুনিতে লাগে। আমাদের আশ্রমে ২।৩টি সুন্দর কুকুর আছে। তাহারা সদাই ঘাড়ে পিঠে ওঠে।

সেদিন সোমবার অরুণদা কোথাও বেড়াইতে যান নাই কারণ অরুণদার টনসিল বেশ ভালোভাবে দেখা দিয়াছে। তারপর জলটল খাইয়া আমরা শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্ত্তন সারিয়া লইলাম।……
……কালিবাবু চা ও জল খাবার খাইয়া অরুণদার সহিত গল্প করিতে বসিলেন। শ্রীশ্রীসাধুবাবা গাছের তুলা তুলিয়া একটি পয়সায় ছাঁদা করিয়া একটি সরু কাঠির ভিতর দিয়া টেকো তৈয়ার করিতে ছিলেন। পরে সেই টেকোর দ্বারা সুতা করিতে লাগিলেন। তখন সকাল ৯টা বাজিয়াছে। আমি রচনা লিখিতে লিখিতে ঘড়ি দেখিলাম।……

…………অরুণদা সেদিন বেড়াইয়া তখনও আসেন নাই। শ্রীশ্রীসাধুবাবা বাড়ীর পিছনদিকে বেড়াইতেছিলেন।…… ..আমি পরিতোষ জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অরুণদা

বেড়াইয়া আসিলেন ১০॥০টার সময়। তখন আমরা দাড়ি কামাইতে ছিলাম। অরুণদা ৫ খানি চিঠি লইয়া আসিলেন—ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে ২ খানি, দেবেদের বাড়ী হইতে ১ খানি, আশ্রম হইতে দাছুর লিখিত ১ খানি, মজঃফরপুর হইতে মোহিনীদার ১ খানি। সেইদিন আমি আমার দাদাকে একখানি খামে পত্র দিলাম ১১।২০ মিনিটের সময়।······

শ্রীশ্রীসাধুবাবা একটি চৌকির উপর বসিয়া গান করিতেছিলেন। অরুণদা letter লিখিতেছিলেন। পরিতোষ আমার পাশে বসিয়াছিল। আমি রচনা লিখিতেছিলাম।·············

শনিবার—আমি ও পরিতোষ বকুল ঝর্ণা দেখিতে যাইব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। মা তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য চা, নিমকি, পাঁপড়ভাজা ও মিষ্টি আনিয়া দিলেন। আমরা আহার করিয়া সকাল ৮টার সময় বাহির হইয়া ১০॥০টার সময় ফিরিলাম। দেখিলাম একটি স্রোত আসিয়া বড় বড় পাথরের উপর দিয়া সুন্দর রূপে আরও পাথরের উপর পড়িতেছে। চারিধারে অজগর বন। আমরা সেখানে আমাদের নাম লিখিয়া আসিয়াছি। আরও অনেক নাম তথায় লেখা আছে। আমরা আসিবার সময় খুব শীঘ্রই আসিয়াছি। বড় বড় মাটির ঢিপি দিয়া আলের উপর দিয়া আসিলাম। আসিবার সময় আরও দুইটি ছোট ঝর্ণা দেখিতে পাইয়াছি ও দুইটি নদী দেখিতে পাইয়াছি। যাইবার সময় একটি নদী পার হইয়া ঝর্ণা দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। ফিরিয়া দেখিলাম অরুণদা আশ্রমে নাই। কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। শ্রীশ্রীসাধুবাবা আশ্রমে চৌকির উপর বসিয়া কুঁজা সারিতেছেন ও আমাদের সঙ্গে রঙ্গ করিতেছেন "তোমরা অতদূর যাও নাই। রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ।" কিন্তু সেখানে যাইয়া আমরা চিহ্ন আনিয়াছিলাম তাহা আমার ডাইরি বুকে আঁকা আছে। তারপর আমরা স্নান করিতে যাইলাম।

বাকসাড়ার, কমলামার, বালির কেষ্টর ও শম্ভুদার, আরও ২ খানি এখানে প্রত্যহ ৬।৭ খানি করিয়া পত্র আসিতেছে ও তাহার উত্তর অরুণদাকেও দিতে হইতেছে।............সন্ধ্যেবেলা শ্রীশ্রীসাধু বাবার সহিত কীর্ত্তন করিতে বসিলাম ও অরুণদা কীর্ত্তনের পরে ফিরিলেন।............

১টার সময় আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে করিতে মহাভারত পাঠ করিতে লাগিলাম। পরে ৩।৪ টার সময় আবার বেড়াইতে যাইলাম। আমি ও পরিতোষ বেড়াইতে বেড়াইতে মধুপুর ইষ্টিশনে প্লাটফর্মের উপর চারিধারে বেড়াইয়া সন্ধ্যা ৬।৹ টার সময় আমাদের আশ্রমে ফিরিলাম ও হাত পা ধুইয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। শ্রীশ্রীসাধুবাবা সেদিন সামনের ফুলবাগানে বেড়াইতে-ছিলেন। পরে আশ্রমের পিছনদিকে বেড়াইতে যাইবেন। তারপর "তুলসী পরিতোষ" বলিয়া ডাকিলেন। আমরা তথায় যাইলে, উনি বলিলেন, "এইখানে একটি হুমকুণ্ড করিতে হইবে। আমরা তাড়াতাড়ি লাগিয়া যাইলাম ও ১॥ ঘণ্টার মধ্যে হুমকুণ্ড প্রস্তুত করিলাম। শ্রীশ্রীসাধুবাবা তথায় বসিয়া আমাদের সহিত গল্প করিতেছিলেন। পরে কাঠ টাট আনিয়া একটি যজ্ঞ করিলেন। অরুণদা সেদিন চিঠিপত্র লিখিয়া পোঃ অফিসে ফেলিতে গিয়া-ছিলেন। সন্ধ্যা হইলে আমরা চা ও জল খাবার খাইয়া কীর্ত্তন করিতে বসিলাম। ৮টার সময় কীর্ত্তন শেষ হইল। বোমার বিষয় আলোচনা হইল।...............

...............সুধীরদা আমাদের ঘরে আসিয়া আমাদের বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তারপর সুধীরদার কীর্ত্তন ও আমরা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভোর হইয়া গেল।......

.........শ্রীশ্রীসাধুবাবা স্নান করিতেছিলেন। তারপর পরিতোষ ছেলেদের মহাভারত পড়িতে লাগিল। আমি দেয়ালে ঠেস দিয়া শুনিতে লাগিলাম। বেলা ১টার সময় আমরা স্নান ও আহারাদি

সারিলাম। সেদিন আমরা ২ জনে কোথাও বেড়াইতে যাই নাই। আশ্রমে বসিয়া আমি সুতা কাটিতেছিলাম ও পরিতোষ তুলা পিঁজিতেছিল। অরুণদা পোঃ অফিসের দিকে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা হইলে আমরা ২ জনে শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্ত্তন করিতে বসিলাম। ৮টায় কীর্ত্তন শেষ হইল।

বুধবার............অরুণদা ৬।৭ মাইল দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি ও পরিতোষ ভোর বেলা কোথাও বেড়াইতে যাই নাই। তবে জল খাবার খাইয়া বাজারে দই কিনিতে কালিবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অরুণদা ২ খানি চিঠি লইয়া ফিরিলেন। একখানা বাকসাড়া আশ্রম হইতে দাদুর দেওয়া ও অন্যখানি ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে। আমরা চিঠি শুনিলাম। পরে স্নান ও আহারাদি সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। শ্রীশ্রীসাধুবাবা তখন সুতা কাটিতেছিলেন।............অরুণদা কিছুক্ষণ চিঠিপত্র লিখিয়া বেড়াইতে যাইলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। আমরা হাত পা ধুইয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবার কীর্ত্তনে বসিলাম। অরুণদা কীর্ত্তনের পরে আসিলেন। কীর্ত্তন ৮টার সময় শেষ হইল।............গিরিজাবাবুর টেলিগ্রামের উত্তর আসিতেছে না......

বৃহস্পতিবার............আমি ও পরিতোষ ভোরে লাইন ধারে বেড়াইতে যাইলাম। মাত্র ২ খানি চিঠি আসিয়াছে—গিরিজাবাবুর একখানি ও ঘোষসাহেবের একখানি। অরুণদার হাতে দিলাম। অরুণদা পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবাকে শোনাইলেন। তখন ঘড়িতে ১১।৫ মিনিট। তার কিছুপরে আমরা স্নান করিতে যাইলাম। আমাদের আশ্রমের ডাক্তারবাবু (সুরেন ঘোষ) সেইদিন কলিকাতা হইতে ফিরিলেন ও অনেক কলিকাতায় বোমার খবর আমাদের শুনাইলেন।

শুক্রবার—১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার আমরা ৩ জনে অর্থাৎ অরুণদা, আমি ও পরিতোষ বত্তিনাথ যাত্রা করিয়াছি।............

আমরা প্রথমে ধর্ম্মশালায় গিয়া উঠি।...............ছানু অর্থাৎ ডাক্তরবাবুর ছেলে আমাদের ডাকিতে আসিল। তখন আবার বেডিং বাঁধিয়া লালকুঠির পুরণদহ পাড়ায় ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে যাইলাম...........চারিধারে গোলাপ বাগানে ভর্ত্তি ফুলের গন্ধে আমাদের খুবই আনন্দ দিতে লাগিল।............তারপর ৩টা ৪টার সময় বেড়াইতে বাহির হইলাম বৈদ্যনাথে তপোবন দেখিবার জন্য। তপোবন নয় সে একটা মস্ত উঁচু পাহাড়। সেখানে বালানন্দ স্বামীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে। ....পরদিন ১১ই ডিসেম্বর শনিবার......বেলা ১০টার সময় ত্রিকূট পাহাড় দেখিতে......টাঙ্গা করিয়া যাত্রা করি।......বেলা ১টার সময় পৌঁছিয়াছি। তারপর একজন পাহাড়িয়া (বিসুয়া) লইয়া ত্রিকূটে চড়িয়াছি......ত্রিকুটের মাথায় উঠিয়াছি......একটি ছোট মাঠের মতন আছে......তবে জলের বড় কষ্ট......পাহাড়ের মাঝখানে অরুণাচল মিশন আছে। সে আশ্রম একটি গহ্বরের ভিতর। তাহার পাশেই ব্যোম ব্যোম বাবাজীর একটি আশ্রম আছে। পাশে ছোট ধর্ম্মশালা আছে। পাহাড় হইতে নামিয়া ব্যোম্ ব্যোম্ বাবাজীর আশ্রমে বসিয়া জলখাবার খাইয়া লইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। আমরা বিসুয়া পাহাড়িয়াকে ১৲ টাকা বক্‌সীস করিয়া টাঙায় আসিয়া চড়িলাম।......

......যসিডি হইয়া আমরা ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার মধুপুরে ফিরিলাম। ৯টার সময় আমরা মধুপুর আশ্রমে আসিয়াই দেখি শ্রীশ্রীসাধুবাবার সমাধি হইয়াছে ও ডাক্তারবাবুর মেয়ে লক্ষ্মী দিদি বই পড়িতেছে।......এমন সময় সাধুবাবার সমাধি ভঙ্গ হইল। পরে আমরা প্রণাম করিলাম ও বৈদ্যনাথের কাহিনী বলিলাম।......

পরদিন বুধবার ১৫ই ডিসেম্বর......এমন সময় সাধুবাবা আমাদের ডাকিলেন ও বলিলেন আশ্রমের সামনের দিকে একটি হোমকুণ্ড করিতে

হইবে। আমরাও লাগিয়া যাইলাম। এমন সময় অরুণদা বেড়াইয়া ফিরিলেন ২।৩ খানি চিঠি লইয়া।······

বৃহস্পতিবার ১৬ই ডিসেম্বর··· ··শ্রীশ্রীসাধুবাবা গান করিতে-ছিলেন······সন্ধ্যার সময় ফিরিলাম ও শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্ত্তন সারিলাম।······পরদিন শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর······এমন সময় দ্বারকালজ হইতে ভোবো আমাদের আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছে। ঘড়ি দেখিলাম সকাল ৮টা হইয়াছে। সেইদিন সকালে ৯টার সময় অরুণদা, তুলসী, ভোবো আবার বকুলীয়া ঝর্ণা দেখিয়া ঠিক ১২টার সময় আমাদের আশ্রমে ফিরিয়াছে। পরিতোষ পোঃ অফিসে চিঠি আনিবার জন্য গিয়াছিল।·········সেদিন রাত্রি ৮টার সময় দ্বারকালজে মেজদা বাকৃসাড়া হইতে মধুপুরে আসিয়াছে। আনিতে গিয়াছিলেন খাঁদুদা ও বড়দা। বেড়াইয়া আসিয়া আমরা শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্ত্তন সারিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিয়া রাত্রির আহার করিলাম ও পরে বিশ্রাম করিলাম। সেইদিন রাত্রে ১০টা হইতে ১২॥০টা পর্য্যন্ত ভয়ানক সমাধি হইয়াছিলেন। শেষে পরিতোষকে জড়াইয়া জড়ামড়ি করিয়া প্রচণ্ড সমাধি অবস্থা হইয়াছিল। তাহার পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার সুধীরদা মধুপুর হইতে হাওড়ায় রওনা হইলেন·········শ্রীশ্রীসাধুবাবা তখন ফুলবাগানের মাঝখানে একটি চেয়ার লইয়া বসিয়াছিলেন ও বাজারওয়ালীদের লইয়া রঙ্গ করিতেছিলেন।···············পরদিন সোমবার ২০শে ডিসেম্বর বাজারে হাট ছিল।···········আমি এখানে প্রত্যহ প্রায় সুতা কাটিতাম। সেদিন সুতা কাটিতে কাটিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে আমরা হাত ও মুখ ধুইয়া কীর্ত্তন সারিয়া বিছানায় বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় অরুণদা দ্বারকালজ হইতে রাত্রি ৮টার সময় বেড়াইয়া আসিলেন।

······সেই দিন রাত্রে সুধীরদার শাশুড়ির মৃত্যুর টাল ২।৩ বার গিয়াছে। শ্রীশ্রীসাধুবাবা চরণ দিয়া বালতি বালতি জল পাতকুয়া

হইতে আমি উঠাইয়া দিলে তাঁহার নাকে ও মুখে ঢালিয়া বাঁচাইলেন। পরদিন মঙ্গলবার ২১শে সকাল বেলা ৬টার সময় শীতলদার দিদি আমাদের আশ্রমে অর্থাৎ মধুপুরে আসিয়াছেন।......বাকসাড়ার খাঁদুদা সেদিন হাওড়ায় রওনা হইয়াছেন। রাত্রি ৮টায় ডেরাডুন এক্‌সপ্রেসে শীতলদার দিদি বৈদ্যনাথ চলিয়া গিয়াছেন।.. ...২৩শে ডিসেম্বর ৭ই পৌষ......শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্ত্তন সারিলাম। ......পরদিন শুক্রবার ২৪শে ডিসেম্বর বাজারে হাট ছিল......প্রায় ৬৲ টাকার বাজার করিয়া ১২৷৷০টার সময় ফিরিলাম। পরে স্নান করিয়া ১টার সময় আহার করিলাম।

......তাহার পরদিন রবিবার ২৬শে ডিসেম্বর সকাল বেলা অরুণদা বেড়াইতে গিয়াছিলেন......আমরা পোঃ অফিসে letter আনিতে যাইলাম ও ৬ খানি letter আনিলাম। তাহাতে রবির মার, বালির সতুদার, দেবেদের, শীতলদার দিদির ও মার ২ খানি এই ছয়খানি। তারপর আমরা বৈকালবেলা আমি ও পরিতোষ দ্বারকালজে বেড়াইতে যাইয়াছি। তথায় একটি ছোট খাটো tea party হইয়াছে। আমরা রাস্তায় আসিতেছি এমন সময় অরুণদা বেড়াইতে যাইতেছেন। আমরা আশ্রমে আসিলাম ও চা-টা খাইলাম। সেদিন শ্রীশ্রীসাধুবাবার কীর্ত্তন হইল না কারণ ভীষ্ম-বাবার বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পাইয়া। দুপুরবেলা অরুণদা গীতাপাঠ করিয়াছিলেন।

......পরদিন সোমবার অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর সকাল হইতে হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আশ্রমেই ছিলাম। সেদিন আমি সুতা কাটিয়াছি। পরিতোষ তুলা পিঁজিয়াছে। ....শ্রীশ্রীসাধুবাবা সেদিন সমাধি ছিলেন। সমাধি ভাঙ্গিল সন্ধ্যার পর। আমাদের কীর্ত্তন সেদিন হয় নাই। .....পরদিন ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার...... আমি সুতা কাটিতেছিলাম, পরিতোষ তুলা পিঁজিতেছিল। অরুণদা আমাদের কলিকাতায় রওনার জন্য letter লিখিতেছিলেন।......

আমরা বেড়াইয়া ফিরিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত কীর্ত্তন সারিলাম। তখন রাত্রি ৮টা। বড়দা সকাল বেলা আমাদের আশ্রমে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। পরদিন ২৯শে ডিসেম্বর বুধবার আমরা যাত্রা করি সন্ধ্যা ৭।৪৯ ট্রেনে মোঘলসরাই করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

*　　*　　*　　*

ঠাকুর যখন আশ্রমে থাকিতেন সাধারণতঃ বেশীর ভাগ সময় আশ্রমের পিছনে আমার কাকা শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী 'রাধাকুঞ্জে' রাত্রের মত চলিয়া যাইতেন। তাঁহাকে ঠাকুর 'ছোট গোঁসাইজী' বলিয়া ডাকিতেন। আমি ও তুলসী রাত্রে আশ্রম হইতে তাঁহার সহিত গিয়া তাঁহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিতাম। আশ্রম হইতে ৭০।৮০ গজের ব্যবধান হইবে। তখন কাঁচা রাস্তা ছিল ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন যাহার উপর দিয়া আমরা কাকার বাড়ী যাইতাম। বর্ষাকালে রাস্তায় খুব কাদা হইত। কাঁচামাটির কাদা। তিনি রোজই হাঁটিয়া যান। একদিন লীলাময় প্রভু কি মনে করিয়া বলিলেন, "আমায় কাঁধে করিয়া কে লইয়া যাইতে পারিবে?" আমরা সকলেই ভাবিতেছি, ওরে বাবা ঠাকুরকে কাঁধে করিয়া কে লইয়া যাইবে, ঠাকুর যা ভারী, চেহারাটাও ত বড় কম নয়, অতবড় শরীরটা কাঁধে করিয়া লওয়া কি সহজ কথা? এমন সময় ঠাকুর আমার বলিয়া উঠিলেন, "কি ভাবছ? আমি খুব ভারী? আচ্ছা তোমরা একবার দেখই না ভারী কি হাল্কা" বলিতে বলিতে গেটের কাছে গিয়া আমার ও তুলসীর কাঁধে ভর দিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন। আহা! কি অদ্ভুত ব্যাপার। ঠাকুর আমার কি হাল্কা হইয়া গিয়াছেন। মনে হইতেছিল যে ঠাকুর যদি এত হাল্কা হন তাহা হইলে আমরা অনায়াসে তাঁহাকে এক মাইল পথ লইয়া যাইতে পারিব। গোঁসাই বাড়ীর নিকট গিয়া লীলাময় করিলেন, "কি, কিরূপ লাগছে? কোনওরূপ কষ্ট

হইতেছে না ত ?" পরক্ষণেই ঠাকুর আমার এত ভারী হইয়া গেলেন যে আমরা আর এক পাও ঠাকুরকে লইয়া আগাইতে পারিলাম না। হাত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম। তাহার পর যাহা হইবার তাহাই হইল। আমরা তিনজনেই কাদায় বসিয়া পড়িলাম। সর্ব অঙ্গে কাদামাখামাখি হইয়া গেল! ঠাকুর আমার উঠিয়া পড়িয়া হাসিতে হাসিতে ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন। কাকার বাড়ী গিয়া হাত পা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "ইহাদের এমন ক্ষমতা নাই আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসে। গোঁসাইজী, তোমার বাড়ীর মাঝ রাস্তায় আনিয়া আমায় ফেলিয়া দিয়াছে।" গোঁসাইজী ও গোঁসাইমা (কাকীমা) ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন শ্রীগোবিন্দ আশ্রমে লীলা করিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, কালীপূজার পরে প্রতিপদে শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসব ও পৌষ সংক্রান্তিতে তাঁহার শুভজন্মোৎসব এই চারটি উৎসব পালিত হইত। বর্তমানে তাঁহার মহাসমাধির দিবস উপলক্ষ্যে তিরোধান স্মরণোৎসব জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি হইতে দিবসত্রয় উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী হইতে রাস পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সংকল্পে দুর্গাপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে প্রাণগোবিন্দের শুভজন্মোৎসব পালিত হয়। ইহা ব্যতীত শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা, মহালক্ষ্মীপূজা, রাধা অষ্টমী, তুলসীর বিবাহ, অক্ষয় তৃতীয়া, গুরুপূর্ণিমা ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি ও উৎসাহে উদযাপিত হয়। বারো মাসে তেরো পার্বণ চলিতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যাঁহারা সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহারাই বস্তু পাইয়াছেন। কেহ ধারণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন কেহ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দয়াল ঠাকুর কিন্তু বলিতেন, "একবার যে আমার কাছে আসিবে তাহাকে এই জন্মে না

হয় তিন জন্মের ভিতর পার করিয়া দিতে হইবে।" ভক্তদের তিনি এমন আধ্যাত্মিক করিয়া দিতেন যে তাঁহারা ভাবাবিষ্ট, প্রেমিক, পাগলপ্রায় হইয়া পড়িতেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহারা তাঁহার দর্শনের জন্য আকুলি বিকুলি করিতেন এবং তাঁহার সন্ধানে দেশময় তোলপাড় করিয়া ফেলিতেন। তাঁহাদের অবস্থা গোপ গোপীদের ন্যায় হইয়া পড়িত এবং তাঁহারা রামগোবিন্দকে সাক্ষাৎ গোবিন্দজ্ঞানে ধ্যান ও পূজা করিতেন। বস্তুবাদী, বিষয়চিন্তাশীল পার্থিব মানুষকে তিনি অবাঙ্মানসগোচরের ও আনন্দের ছিটা ফোঁটার আস্বাদন করাইয়া অমৃতের সন্ধানে ব্রতী করিয়া তুলিতেন। সাধনায় টানিয়া আনিতেন। তাঁহার নবকলেবরে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য "এইবার অন্নগতপ্রাণ কলিহতজীবকে নামপ্রেমে, অন্নসেবা করিয়া ভাসাইয়া দাও।" সংগীতের ভিতর দিয়া তিনি সাধনা ও দর্শনের উপর জোর দিতেন। জীবকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিবার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বলিতেন, "সংগীতের ভিতর দিয়া তাঁহাকে যত সহজে পাওয়া যায় অন্য কোন সাধনায় এত সহজে পাওয়া যায় না। সুরই ব্রহ্ম। দম্‌সে খাও আর দম্‌সে কীর্ত্তন কর। জয় রাধে গোবিন্দ পেট ভরলে আনন্দ।" তাই বুঝি তাঁহার আর এক নাম গীতগোবিন্দ।

তাঁহার ভক্তদের মধ্যে কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইত তাহার উদাহরণ আমরা পুরুলিয়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট শ্রীহরিবিলাস মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। শ্রীহরিবিলাস, ব্রজবিলাস, প্রভৃতি শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ পুত্র প্রত্যেকেই পুরুলিয়ার স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে দিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"শ্রীশ্রীগুরু আমাকে লেখনীতে, স্মৃতিতে, ভাষায় ও ঘটনার পরিবেশনে সাহায্য করিবেন এই ভরসায় আমার মত অস্থিরচিত্ত

ব্যক্তি নুনের পুতুল হইয়া সমুদ্রের মত অপার অনন্ত শ্রীমন্নারায়ণস্বরূপম্ অস্মদাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিতে বসা ধৃষ্টতামাত্র। ভরসা তাঁহার কৃপা হইলে পঙ্গুও পাহাড় লংঘন করে, মূকও বাচাল হয়।

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী শতদলবাসিনীর হাওড়ার রামকৃষ্ণ-পুরে বিবাহ হয়। তার একটি মাত্র পুত্র অজিতের জন্ম হইতে ভগিনী চিররুগ্না হইয়া পড়েন। আমার ভগিনী আমার পিতার বড় প্রিয় ছিল। পিতা তাঁহার চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। ডাক্তারী, কবিরাজী, দৈব, হাতুড়ে বহু অর্থব্যয়ে কিছুতেই তাহাকে সুস্থ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৯৩০ সালে আমি পিতাকে সংবাদ দিই দিদির মৃত্যু আসন্ন। রাখে হরি ত' মারে কে? আমার দিদি কোন সূত্রে শ্রীশ্রীসাধুবাবার সন্ধান পেয়ে বাবার চরণে ১৯৩২ সালে নিজেকে সমর্পণ করিলেন। দিদির কাছে জানিয়াছিলাম যে সাধুবাবা ভবানীপুরে আমার জ্যাঠামহাশয়ের ভাড়া বাড়ির ছাদে এক হোমযজ্ঞ করেন। তাহার শিখা এত উচ্চে উঠে যে লোকে অগ্নিকাণ্ড ভাবিয়া দমকল ডাকিতে উদ্যত হয়। সাধুবাবা জ্যাঠা-মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনার ছাদের যদি একটি ইঁট নষ্ট হয় তবে সোনার ইঁট করাইয়া দিব।"

১৯৩৭। অনেক দিন পরে কলিকাতায় জুলাই মাসে মোকর্দ্দমা উপলক্ষে গিয়া দিদিকে দেখি। মৃত্যুপথযাত্রী দিদিকে স্বাস্থ্যবতী দেখিয়া সবিস্ময়ে দিদির জীবনদাতার সন্ধান ও দর্শনাভিলাষী হইলাম। দিদির মোটরে ভাগ্নে অজিতের পরিচালনায় আহিরীটোলায় চুনিলাল ভট্টাচার্য্যের বাড়ি যাই সাধুবাবার সন্ধানে। তথায় তাঁহাকে না পাইয়া ভবানীপুরে সুন্দর মায়ের (এ্যাটর্ণী বীরেশ্বর চট্টোপ্যাধ্যায়ের) বাড়ী যাই। জানিলাম বাবা চেতলাতে শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ীতে আছেন। আমরা সেখানে গিয়াও বাবাকে না পাইয়া ভগ্নোৎসাহে ফিরি। রাত্রের ট্রেনে পুরুলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি। পরদিবস প্রাতেই সাধুবাবা শিবপুরের হোমিও ডাক্তার শ্রীসুরেন

ঘোষ সহ রামকৃষ্ণপুরে দিদির কাছে গিয়ে বলেন, "তোরা ভাই বোনে ঘুরে ঘুরে আমাকে খুঁজিতেছিলি আর আমি শিবপুরে ডাক্তার দাদার বাড়ীতে ছিলাম।"

অন্তর্যামী ভক্তের হৃদয় বুঝিয়া দয়ার্দ্র হইয়া নিজেই পুরুলিয়ায় দিদি ও ডাক্তার সুরেন ঘোষকে নিয়ে বুধবার প্রাতে আমাদের অবাক লাগাইয়া গাড়িতে আসিয়া আমাদের বাড়িতে চরণ ধূলি দেন। আমার পিতা শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় সাধুবাবার প্রথম দর্শনে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপাতপূর্বক অভিবাদন করিলেন। আমি সাধুবাবার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা ও কেবলমাত্র অন্তর্বাস ও বহির্বাস ও ক্ষীণদেহ দেখিয়া নির্নিমেষ ও অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁর শ্রীচরণে পড়ি। তিনি প্রথমেই আমার মধ্যম পুত্রের শিশির কুমারের মুখে হাত দিয়া তাহার খারাপ অসুখ হইবার উপক্রম হইতেছিল তাহা সারাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বেতার বার্ত্তার ন্যায় আমাদের বাড়ীতে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা সহরের দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে বহু-পূর্বপরিচিত ভক্ত, শিষ্য, শিষ্যা আসিতে লাগিলেন। তৎসময়ে বাবার উপবাস চলিতেছিল। কেবলমাত্র চা পান করিতেন। বৈকালে বাবা, ডাক্তার দাদা, শতদল দিদি, আমিও পিতাসহ ধানবাদের দিগওয়াড়ী কয়লাখনির ম্যানেজার শ্রীভুবন মিত্র মহাশয়ের বাটী আমাদের মোটরযোগে গিয়া পৌঁছাই। তখন দেখি অরুণদাদা কলসীতে করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নদী হইতে বাবার জন্য পানীয় জল লইয়া পথে আসিতেছেন। অরুণদাকে দেখিয়া বাবা আনন্দে অধীর হইলেন। ভুবনবাবুর কোয়ার্টারে চা পান করিয়া সেই মোটরেই রাত্রি ১০টায় আমাদের বাড়ী পুরুলিয়ায় ফিরিয়া আসেন।

সেই দিন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাবাকে দর্শনার্থী ও রোগীদিগকে দর্শন দিতে হয়। পরদিবস অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বাবা শহরের মস্তিষ্ক বিকৃত ভদ্রসন্তানদের দর্শন দেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীবিমলাকান্ত সরকার আসিয়া দর্শন করেন ও আরোগ্য লাভ করিয়া

চলিয়া যান। মধ্যাহ্নে সাধুবাবার আদেশে ললিতবাবুর কমলা কুঠিতে সাধুবাবার আগমনবার্ত্তা আমি জানাইতে গিয়া তথায় ফ্রিজের শীতল পানীয় জল পান করিলে আমার গা খুব গরম হয়। শরীরের উত্তাপ ও অসুস্থতা খুবই বৃদ্ধি পায়। বাবার তখন উপবাস। উপরন্তু বৃহস্পতিবার তিনি চরণ দেন না। হাঁপানী রোগ থাকায় আমার হৃদয়ের ও বক্ষের যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি যেন জোর করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ নিজ বক্ষের উপর ধারণ করিলাম। পাড়ার বহুদর্শক মণ্ডলী তখন সাধুবাবার নিকট নীচের ঘরে বসিয়াছিলেন। আমি যেন ভাবগ্রস্থের ন্যায় আচরণ করিলাম।

অধিক রাত্রে দোতলায় আমি সাধুবাবা যে ঘরে ছিলেন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া (মনসা) ট্রান্সে বলিলাম, "আপনি যদি ভগবান, তবে আমার স্বর্গতা মাতাকে দেখাইতে পারেন ?" তিনি যেন আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন তাঁর শ্রীচরণ দুটি ধরিতে ও সেইখানে যেন আমি আমার মাকে খুঁজি। অনুভব করিলাম অমসৃণ দুইটি চরণ মাত্র। তাহার পর ডাক্তার দাদা, অরুণদাদার সাক্ষাতে সাধুবাবার সহিত আমার মল্লযুদ্ধ চলিতে লাগিল। সাধুবাবা আমাকে ঘরের মেঝেতে ফেলিয়া তাঁহার শ্রীচরণ আমার বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন। আমার ভগিনী ও স্ত্রী নীরব দর্শক। সাধুবাবার শ্রীচরণ পাইয়া মনে হইল যেন আমার সত্ত্বা কোন এক ভিন্ন রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা অসাধ্য। পরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন যে উহা আমার ভাগ্যে জ্যোতিদর্শন ঘটাইয়াছিল।

তৎপরদিনই সকালে বাবা, অরুণদা ও ডাক্তারদাদা মোটরে ধানবাদ চলিয়া যান। আমি তাঁহাদের সঙ্গে সহগমন করিতে উদ্যত হইলে বাবা আমাকে ফটকের বাইরে যাইতে নিষেধ করিয়া যাত্রা করিলেন। বাবার অবস্থানের জন্য নিজের ঘরে যে বিছানা পাতা হইয়াছিল উহা হইতে এক অপূর্ব ঘ্রাণ পাইতে থাকি ও আমি ঐ একভাবেই রাখি। তাঁহার চলিয়া যাওয়া ও বিরহ আমাকে

উন্মাদপ্রায় করিয়াছিল। আমি তখন কোর্টে বাহির হইতাম ও কাজের খুবই চাপ। অনবরত বিরহানলে ক্রন্দনরত ও যেন কিছুই ভালো লাগিতেছে না। রাত্রিতে নিদ্রা গেলে একদিন এমন ভাব হইয়াছিল যে আমি ভগবানপ্রাপ্ত হইয়াছি ও আনন্দে আকুলিতে তেতলাছাদ হইতে ঝম্পপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। স্ত্রীকে চোখের বিষ মনে হইত। কেবলমাত্র জ্যাঠাইমার কথা শুনিতাম। সপ্তাহকাল বাদে শ্বশুর মহাশয়কে সংবাদ দিয়া বর্ধমান হইতে আনানো হইল। তিনি বর্ধমানে আমাকে, স্ত্রী ও এক বৎসরের শিশুকন্যা সহ লইয়া গেলেন ও ১৫।২০ দিন বর্ধমানে থাকিয়া কথঞ্চিত স্থির হইলে পুরুলিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া ওকালতিতে যোগ দিই।

বাবা অবস্থানকালে আমি তৎকালিন আমাদের পরিবারবর্গের সহিত বাবার একটি ফটো গ্রহণ করিয়া রাখি। ফটোটি যখন বাঁধানো হইয়া আসিল আমি সাধুবাবার বক্ষের ভিতর "ওঁ মা" এই অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে দেখিয়াছিলাম। তাহাতে আমার পরিবারবর্গ মস্তিষ্কের অসুস্থতা সন্দেহে ফটোটি তৎক্ষণাৎ লুকাইয়া রাখে ও আমাকে দেখিতে দেয় নাই। এখনও সেই ফটোর একটি কপি আছে। অরুণদাদার নিকট পরে শুনিয়াছিলাম যে বাবা বিজয়নগর মহারাণীর কোন জরুরী কাজের জন্য বিজয়নগর যাইতেছিলেন কিন্তু আমার উন্মাদ অবস্থা জানিতে পারিয়া তাহা স্থগিত রাখিয়া শিবপুরে রহিয়া যান।

১৯৩৭ সালে জুন মাসে বাবা যেদিন আমাকে অমোঘ ঔষধ লুকান চরণযুগল এমন কি ভবরোগের আর্ত্তি ঔষধ ছিল যেই চরণে—শ্রীচরণ দিয়া পরদিন আমাদের গৃহ হইতে গড়জয়পুরের রাজজামাতা শ্রীব্রজরাজকুমারের মোটরে ধানবাদ চলিয়া যান, সেইদিন আমি আমার জীবনের আয় ব্যয়ের হিসাবের খাতায় যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা তুলিয়া দিলাম—"মনুষ্যরূপ ভগবান আমাকে চরণ দিয়া জীবন

ধন্য করিয়া আমাকে বিরহবেদনাতে কাঁদাইয়া ধানবাদ চলিয়া গেলেন।" দিন যত যাইতে লাগিল তাঁহারই কৃপায় বাবার ভগবানত্বে মনে অবিশ্বাস হতে ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত হইল এবং একদিন তাহা খাতায় কালি দিয়া কাটিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা না হইলে আমাকে হয়ত গৃহত্যাগী হইয়া পড়িতে হইত। এইভাবে ১৯৪০ পর্য্যন্ত চলিতেছিল।

১৯৪০ ডিসেম্বর আমার মায়ের বড় মামার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীইন্দ্র-নারায়ণ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রস্রাব রোগের মুক্তির জন্য বাবাকে আশ্রম হইতে অরুণদাদা সহ পুরুলিয়াতে তাদের নিজেদের পৈতৃক বাটীতে আনে। আমি বাবার পুরুলিয়াতে আগমন বার্ত্তা পাইয়া খুবই আনন্দ ও ভয় মিশ্রিত মনে সত্বর তাঁর শ্রীচরণে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আত্মনিবেদন করিতে গেলাম। দর্শনমাত্র তিনি বলিলেন, "পাগলামী করবিনি ত' আর? যাও তোমার বাবার ঘরে আসন পাতিয়া রাখ। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।" রাত্রিতে বাবা আমাদের ঘরে পাতা আসনে নীচের কোষ্ঠে অরুণদাদা সহ আসিয়া মহানন্দে করতাল সহ শ্রীশ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'আবির্ভাব' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ইংরাজীতে Reminiscences of Sree Sree Sadhu Baba লিপিবদ্ধ করি। বাবার আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যবহার ও গলার স্বর আমার নিকট যেন প্রতীয়মান হইল ১৯৩৭ সালের বাবা ১৯৪০ সালে এক মোহন্তমহারাজে রূপান্তরিত হইয়াছেন। এইবার আমাদের বাড়ীতে তিনি প্রথম কীর্ত্তন গাহিলেন। এখনও যেন আমার কর্ণকুহরে লাগিয়া আছে এবং আজও আমাকে মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল করে। ১৯৪০ নভেম্বরের ১৫ দিন আমাদের ও মামার বাড়ীতে অবস্থান কালে দৈনিক এক হাজার হইতে আড়াই হাজার রোগী রাস্তায় ভীড় করিয়া থাকিত। সময় সময় ভীড় উহাও ছাপাইয়া যাইত এবং পুলিশকে আসিয়া রাস্তায় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ

করিতে হইত। এই সব রোগীদের মধ্যে বলা বাহুল্য পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার যত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তরাই আসিত। কুষ্ঠ, পারা, পাগল, শিরদাঁড়ায় টি. বি., ইত্যাদি। বহু গোয়েন্দা রাজপুরুষ, মন্দলোকও আমাদের বাড়ীতে বাবাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। বাবা অন্তর্যামী। সবই বুঝিতেন বা জানিতেন।

আমার পিতা নিজ কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। তবু সহরের বিশিষ্ট মহোদয় মহোদয়া গৃহে পদার্পণ করিলে তিনিও তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বাবাকে জানাইতেন।

স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী বি. ডি. সিং নিজ গোপন অসুখ লইয়া সস্ত্রীক বহুদিবস দুবেলা আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার তর্জনীটি অসাড় ছিল পরে জানিয়াছিলাম। সুতরাং সই-সাবুদ, লেখা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হইতেছিল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে হয়ত চাকুরিতেও অসুবিধা হইতে পারিত। একদিবস তাঁর মোটরে বাবাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পুরুলিয়া হইতে ৭ মাইল দূরে বেড়াইতে বেড়াইতে অনুভব করেন যে তাঁহার ডান হাতের অসাড় তর্জনী অঙ্গুলীটি হঠাৎ সচল হইয়া উঠিয়াছে। সুস্থ হইয়া গিয়াছে। আমরা আনন্দের কারণ উপলব্ধি করিবার পূর্বেই দেখি তিনি বাবার চরণ ধরিয়া ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুহূর্তের জন্যও বাবার সঙ্গত্যাগ করিতে চান না। অবশিষ্ট যে কয়দিন বাবা ছিলেন দুইবেলা শ্রীসিং প্রণাম করিতে আসিতেন ও নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই সময় বাবা প্রত্যেক স্থানেই শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার দোঁহার মিলিত না। তিনি একাই সকলকে কীর্ত্তনানন্দে মাতাইয়া রাখিতেন।

ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণীর দর্শন

একদিন ঝরিয়া হইতে মোলকেরা কলিয়ারীর ধনী ত্রিগুণাইতদের মধ্যে এক ত্রিগুণাইত বাবাকে সেবা করিবেন বলিয়া লইয়া গেলেন।

তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ছিল, ভক্তির লেশ নাই। বাবা, তাঁর ভগ্নিপতি শ্রীনিবাসবাবু, ইন্দ্রনারায়ণ, আমি, অরুণদাদা ও ত্রিগুণাইতদের দুই যুবক ও ড্রাইভার নেপালবাবার জামাতার কলিয়ারীর ম্যানেজারের বাড়ীতে রাত্রি ১১টা নাগাদ পেট ভরিয়া আহারাদি করিয়া পুরুলিয়ায় ১টায় আসিয়া পেঁাছাই।

রাত্রি ১টায় বাবা বেড়োতে তাঁহার আরাধ্য মাতৃদেবীকে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গৃহত্যাগ করিবার পর ইহাই প্রথম মাতৃদর্শন। আমি বেড়ো যাইবার জন্য স্লিপ কাটিয়া মোটরে তৈল ভরিলাম। গাড়ীতে বাবা, অরুণদা, শ্রীনিবাসবাবু, ইন্দ্রমামা, আমি ও মোলকেরা ত্রিগুণাইতদের দুই যুবক ও মহম্মদ ড্রাইভার। জায়গার অভাবের দরুন আমি সন্ত্রস্ত হইয়া জড়সড় হইয়া পায়ের কাছে বসিয়াছিলাম। বাবা মধ্যে মধ্যে আমাকে তাঁহার বলিষ্ঠ ক্রোড়ে বসাইয়া লইতেছিলেন।

পথে পুরুলিয়ার ডি, এস, পি, মিঃ চ্যাটার্জী মোটর আটকাইলেন। রাত্রি তখন দেড়টা হবে। শুনিলাম সম্প্রতি ঐ রাস্তায় কোথায় ডাকাতি হইয়াছে। তার জন্য এত কড়াকড়ি। যাই হোক্ আমাদের মোটর দাঁড় করাইয়া আমাদের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া মোটর নম্বর দেখিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। আমরা রাত্রি ৩।৪৫ মিঃ বেড়োতে আসিয়া পৌছাইবামাত্র গাড়ীর সামনের চাকা সশব্দে পাংচার হইয়া যায়।

আমরা শ্রীনিবাসবাবুর দ্বিতল বাটীতে উঠিলাম। বাবা সরাসরি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। পরে আমাদের ডাক পড়িল। কুঁড়ে ঘরে গিয়া তাঁহার বৃদ্ধা গর্ভজননী মাতৃদেবীকে দর্শন করি ও প্রণাম করি। আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সাধনা সার্থক হয়। তাঁহার ভগ্নি আক্কা অতি বৃদ্ধা বিধবা। পিসীমাকেও দেখি। তিনি অতি বৃদ্ধা হইলেও অতরাত্রেও সজাগ হইয়া আমাদের অনেক আলাপ পরিচয়ে বিশেষ করিয়া রামগোবিন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। জানিলাম পিসীমার বয়স ১০৮ হইবে।

বাবা ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলে আমি আমার জানু পাতিয়া দিলাম। বালিশের অপেক্ষা না করিয়া ঠাকুর আমার এই অধমের জানুতে মস্তকটি রাখিলেন। বাটীস্থ সকলের বালিশ আনিয়া বাবার সুনিদ্রা ও তাঁহাকে পরদিবস রাখিবার চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। বালিশ দিতে গেলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তেই তিনি বেড়ো ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। আমাদের প্রত্যেককে জলযোগ করাইবার জন্য শ্রীনিবাসবাবুর উপর আদেশ হইল। আমরাও তৎক্ষণাৎ দ্বিতল বাড়িতে গিয়া চা ও সুজি ভোগ গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

পূব দিকে তখনও ঠিক আলো হয় নাই। আলোর আভাষ মাত্র। এমন সময় যখন মোটর স্টার্ট দিল বাবার মাতা ঠাকুরাণী অকস্মাৎ পিছন হইতে এসে অতি কাতর অনুনয় করিয়া বাবাকে বলিলেন, "গোবিন্দরে, আমায় নিয়ে যাবিনা বাবা?" অচল, অটল, ঠাকুর আমায় তৎক্ষণাৎ মোটরে বেগ দিতে বলিলেন এবং বলিলেন, "কে! মা আমার মাথার মণি! তোমায় অরুণদাদা নিয়ে যাবে।" জানালার ধারে অরুণদার ক্রোড়ে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীর ঘট ছিল। সেই মুহূর্তে একটি লক্ষ্মীপেঁচা সেই ঘটের উপর ছোঁ মারিল—যেন ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইতে চায়। সে বিদায় দৃশ্য কি হৃদয় বিদারক। আমি ও ইন্দ্রমামা দুইজনেই অল্প বয়সেই মাতৃহারা। একযুগ পরে মহাপুরুষ পুত্রকে গৃহে পাইয়া মা কি ছাড়িতে পারে? আমরা দুজনেই অশ্রুজলে নিজ নিজ বক্ষ ভাসাইয়া বাবার গায়ে পড়িতেছিলাম। আর বাবা নিশ্চল, অচল, অটল, পাহাড়ের ন্যায় দুই হস্ত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া আমাদের চোখ মুছাইয়া দেন ও কত স্তোকবাক্য ও মধুর বচনে আমাদের শোক লাঘব করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য আজও মনে হইলে আপনা আপনি অশ্রু বিগলিত হয়। গাড়ী ছুটিতে লাগিল। বাবা বেড়োতে পাহাড় দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে জগন্মাতার দর্শন পেয়েছিলাম।"

পুরুলিয়া আসিতে মাত্র ৭ মাইল বাকি। গাড়ী ৪০ মাইল বেগে চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা গেল গাড়ী দাঁড়াইয়া পড়িল। ড্রাইভার থর থর কম্পমান। দেখিলাম সামনের চাকার tyre বাহির হইয়া গড়গড় করিয়া আপনবেগে মাঠের দিকে গড়াইতে গড়াইতে চলিতেছে। বাবা গাড়ী হতে নামিয়া সম্মুখে পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। যেন কিছুই হয় নাই। এমন সময় ইন্দ্রমামা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপনার বিপদ!" বাবা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, "মা, ও তুমি। আমার আবার বিপদ, আমি বিপদের মাথায় মারি বাড়ি।" গান ধরিলেন উদাত্তকণ্ঠে, "আগু পিছু দুখ চলে মা আমি বসাই সুখের হাট।" এমন সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় সাধারণতঃ যাত্রীরা রক্ষা পায় না। কিন্তু যে গাড়ীতে রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং বসে আছেন তার রথের চাকা কি মাটিতে বসিতে পারে ?

পথে যখন গাড়ী সারানো হইতেছিল তখন পিল পিল করিয়া যাত্রী—স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে রাস্তার দুধারে পুরুলিয়া অভিমুখে আসিতেছে দেখিলাম। গাড়ী কিছুক্ষণ বাদে ছাড়িল। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ী থামাইয়া একে' অন্তর্যামী তায় আবার রসিক ঠাকুর যাত্রীদের জিগ্যেস করিলেন, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" তাহারা জবাব দিল, "পুরুলিয়া জগদীশের ঘরে এক সাধু এসেছে। যার চোখ নাই তার চোখ হইবে, যার পুত্রসন্তান হয় নাই তার সন্তান হইবে, রোগীর রোগ ভালো হইবে। সেই সাধুকে দেখিতে যাইতেছি।" আমি বাবাকে অনুরোধ করিলাম যে এইখানে তাহাদের চরণ স্পর্শ করাইয়া দেন। বাবা তাহার উত্তরে বলিলেন, "সে স্থান মাহাত্ম্য। এখানে বিশ্বাস হইবে না।" বাবাও তাদের সুরে সুর মিশাইয়া বলিলেন, "চল, আমিও সেই সাধুটাকে জগদীশের ঘরে দেখিতে যাচ্ছি।"

বাবা পুরুলিয়ায় বাড়ীতে পৌছাইয়া স্নান, তিলকাদি ও

বাল্যভোগ করিয়া বাহির হইতেই সেই যাত্রীদল ইতোমধ্যে আমাদের ঘরে পৌঁছিয়া দেখিবামাত্র নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিল, "সেই সাধুটারে! যে সাধুটা রাস্তায় দেখিয়াছি।"

বাবা এখানে প্রত্যহই প্রাতে ৮টা হইতে বেলা একটা দুটা পর্য্যন্ত অগণিত রোগীর দেহে চরণ দিতে লাগিলেন। অরুণদাদা তাঁর খাতায় তাদের নাম, ধাম, বয়স লিখিতেছিলেন। একদিন ভীড়ের এমন চাপ সৃষ্টি হইয়াছিল যে স্বয়ং অরুণদাদাই ফটকের পিলারের ও জনতার মধ্যে চাপে পড়িয়া মারা যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। কোন মতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। না দেখিলে পাঠকেরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এইভাবে নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত রোগীর দর্শন, স্পর্শন চলিতে লাগিল। রাত্রে সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক রুগী ও ভক্তসহ কীর্ত্তনানন্দে আমার পিতার ঘরখানি শ্রীক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। জগন্নাথ যেখানেই যান উহাই শ্রীক্ষেত্র বটে। আমি বাবার রোগীর ভীড় শেষ হইলে তাঁহার চরণযুগল ভালো করিয়া সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া দুপুরে যথারীতি কাছারী যাইয়া দৈনিক উপার্জনে বাহির হইতাম। দেরীতে যাওয়াতে রোজগার যে কিছুমাত্র বাধা পাইত তাহা নহে।

একদিনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য মনে করি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার দেখাইয়া দিলেন যে গোবিন্দের কৃপায় "হাকিম নড়ে ত' হুকুম নড়ে না" এই প্রবাদবাক্য উল্টাইয়া যায়। হুকুমই নড়িল। এক শনিবার হাকিম মুনসিফ আমাকে হারাইয়া রায় দেন। পর সোমবার বাবাকে প্রণাম করিয়া আদালতে যাইবা-মাত্র পেশকার আমাকে বলে, "হাকিম বলিলেন হরিবিলাসবাবু গত শনিবারে রায় দেখে আমার ভুল বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। আমি রাগ করিয়া তাহাকে জজের নিকট আপীল করিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিলাম তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

আমার ভুল উপর হইতে সংশোধন হওয়া অপেক্ষা নিজেই গতরায় ছিঁড়িয়া দিয়া প্রকৃত বিচারে রায় দিয়াছি। আজ সর্বাগ্রেই আপনাকে দেখাইতে বলায় আমি আপনাকে নূতন রায়টি দেখিয়া নিজনাম সহি দিতে অনুরোধ করি।" অপর পক্ষ যশোদা বাবু। প্রতিবেশী। আমার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি এখনও এ ঘটনা জানেন না। আমি তখন কি ইহার গূঢ় রহস্য জানিয়াছিলাম বা জানিবার সামর্থ্য পেয়েছিলাম? ইহা যে স্বয়ং শ্রীশ্রীগোবিন্দের ইচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে তখন বুঝে কার সাধ্য?

এইভাবে ১৫ দিন বাবা অরুণদাদা সহ আনন্দসাগরে থাকিবার সময় যে দিন বাবাকে পাতকুম ষ্টেটের মোটরে করিয়া আমি, শচীন্দ্র মামা তাঁদের লইয়া বৈকালে ধানবাদ যাইতে উদ্যত হই এমন সময় আমার সমবয়সী উকীল শ্রীহরিদাস মিত্র—শ্রীললিতকিশোর মিত্রের পুত্র—মোটরে আমার পিতার নিকট কার্য্যোপলক্ষ্যে আসে। আমরা বাবার লাটবহর মোটরে লইয়া দ্রুতবেগে ৭ মাইল গিয়াছি তখন বাবা বলিলেন যে আমাদের পিছনে একটি মোটর এখনই আসিবে। বলিতে বলিতে দেখি হরিদাসের মোটরে আমার ডাক্তার ভাই কান্তি এতবেগে আমাদের পশ্চাৎ নিয়েছে যে আমাদের গাড়ীর অনেক এগিয়ে গিয়ে তার মোটর থামিল। সে বাবার সুটকেশের চাবির থোকাটি যাহা আমরা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম তাহা অরুণদাদাকে দিয়া পুরুলিয়া ফিরিয়া গেল। বাবা আসিবার সময় দর্শনার্থী আসিলে তাদের চরণামৃত—আমাদের কূপের জল—ছিটাইয়া দিতে আদেশ দিয়া গেলেন। পর পর অনেকদিন দর্শনার্থীর ভিড় হয়। বেশ কিছুদিন তাদের ধারণা থাকে যে বাবাকে আমরা বাড়ীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৪০। তখন পুরুলিয়ার পাটনা হাই-

কোর্ট। সাধুবাবার বিরহে দিন গণনা করিতেছিলাম। শুনিয়াছিলাম যে তিনি পাটনা গিয়াছেন। কবে পাটনা হইতে তাঁর টেলিগ্রাম পাইব তথায় যাইবার জন্য। বড়দিনের ছুটি পড়িতেছে। তাঁর শীতল শ্রীচরণযুগল পরশ করিয়া বিরহানল শান্ত করিব। তাঁহার পদ্মপলাশলোচন অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আত্মহারা হইব। এমন সময়ে জনৈক মণ্ডল—আমার মক্কেল—আপীল দায়ের করিবার জন্য পাটনায় লইয়া গেল। আমি উঠিলাম হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট আমার মামা শ্রীরাধাশ্যাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। তাঁর নিজবাটী রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডে। তাঁর সহিত হাইকোর্টে গিয়া মামলার বিষয় পরামর্শ করিয়াই বাবার খোঁজের জন্য গুরুভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের পাটনাস্থ বাড়িতে চিড়িয়াডাঙ্গায় গিয়া জানিলাম যে বাবা শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখিতে মধুপুরে তাঁহার বাটীতে গিয়াছেন। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। ২।১ দিন বাদে পুনরায় তাঁর খোঁজ লইতে গিয়া দেখি তিনি ভক্তসমভিব্যাহারে বিরাজমান জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে। সঙ্গে অরুণদাদা। দেখামাত্র বাবা তাঁহার চিরমধুর সুরে গাঢ় আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা এক্ষুণি গয়া রওনা হইতেছেন এবং আমিও যেন তাঁহাদের সঙ্গেই চলি। তাহাই হইল।

শীতকাল। বিশেষ গয়ার ঠাণ্ডা। ডিসেম্বর জানুয়ারীতে পরিধানে মাত্র বস্ত্রটি, গায়ে গরম পাঞ্জাবী ও শাল মাত্র সার করিয়া করিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত ১২টায় পাটনা-গয়া ট্রেনে রওনা হইলাম। অরুণদাদার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও আমায় লইয়া গেলেন। শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে বার্মা শেলে কাজ করিতেছিলেন। পূর্ব কথামত আমাদের জন্য গয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রেলওয়ে কলোনীতে ভবদার বাসা। তথায় বাবার লীলা ১০ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রত্যহই রোগীর ও দর্শনার্থীর প্রচুর ভীড়।

বাবা ও আমরা (অরুণদা ও আমি) ভবদার গৃহে দুপুরে ভোজন করিতাম। যে কদিন আমরা তথায় ছিলাম আমরা যেন বাহির হইতে কীর্ত্তনদল আসিয়াছি। সমস্ত দিবস রোগী দেখা চলিত। তার মধ্যে গল্প, গান, হাসি, ঠাট্টাতে ঘর মুখরিত থাকিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিমন্ত্রিত ঘরে গিয়া নাম কীর্ত্তন করিয়া বাবার প্রসাদ পাইয়া ভবদার ঘরে ফিরিতে কোন কোন দিন অধিক রাত্রিও হইয়া যাইত। রোগীদের মধ্যে রাজকর্মচারী শ্রীফেলু চট্টোপাধ্যায় ও অনেকের সহিত আলাপ জমিয়াছিল।

গয়ার সদরস্থানে Sanctum বাড়ী নামী ঘর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার প্রাসাদসম বাড়ীতে নাম কীর্ত্তনের জন্য বাবাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। Sanctumএ প্রতি সন্ধ্যায় ৪০ বৎসর ধরিয়া নিয়মিত নাম কীর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে। মোটর বিভ্রাটের দরুন বাবা সেদিন তাদের ঘরে দেরীতে আসিয়া কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে এমন মধুর কীর্ত্তন ধরিলেন যে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। অধিকরাত্রে তথায় প্রসাদ পাইয়া ফিরি।

গয়াধামে ভূতপ্রেত পিশাচদ্বারা আক্রান্ত রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব। সেই সব রোগী ভবদার ঘরে আসিত। কেহ কেহ অলৌকীক দেব-দেবীরও দর্শন পান। ৩০শে ডিসেম্বর গয়া হইতে পাটনা সদলে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ৩১শে ডিসেম্বর আমি ও জ্ঞানবাবু নিজকার্য্যে যোগদিতে পুরুলিয়া ও কলিকাতায় আসিতে উদ্যত হই। অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ বাবা বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম যে রাত্রি ৭টার ট্রেনে পুরুলিয়া অভিমুখে পাটনা হইতে রওনা দিব।

বাবা তার পূর্ব্বেই ২টি মোটর নিয়ে আমার বাটীতে আসিয়া আমায় তাঁর মোটরে তুলিয়া লইলেন। ২টি মোটরে ১১জন যাত্রী। কোথায় যাব, কি রাস্তা—আমরা কিছুই জানি না। গাড়ীতে, সকলেই নিজ নিজ ভাব লইয়া বাবার সঙ্গে আলাপ আমোদে প্রবৃত্ত। পুরুলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আমি মুহ্যমান হইয়া

বসিয়াছিলাম। জ্ঞানবাবুর পিণ্টু হোটেল হইতে কফি, লুচি, তরকারী ও মিষ্টি লওয়া হইয়াছিল। গাড়ী দুইটি কোন দুর্গম পথে পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতেছিল। ভিতর হইতে বুঝা না গেলেও অন্ধকার পরিবেশ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে আমরা যে পথে চলিতেছিলাম তাহা কোন সরকারী পীচ অথবা মেটাল রোড নহে। পথে গভীর রাত্রিতে আমরা কোথাও অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইলাম। কিন্তু তখনও জানিনা কোথায় আমাদের গন্তব্যস্থল।

ব্রাহ্মমুহূর্তে আমাদের গাড়ী দুটি রাজগীরে গিয়ে পৌঁছাইল। বাবা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া "কুণ্ডতে আমাদের কে শীতকালের ভোরে স্নান করিবে" বলিয়া কুণ্ড (Hot spring) অভিমুখে খড়ম পায়ে দ্রুত চলিয়া গেলেন। নিমেষে অদৃশ্য হইলেন। রাস্তা, পথ, মাঠ যেন তাঁর কত পূর্বপরিচিত। ঐদিন ১লা জানুয়ারী ১৯৪১। স্নান সারিয়া আবার রওনা করিয়া পুনরায় গয়াধামে পৌঁছাইলাম।

একটি গাড়ীতে অরুণদাদা ও অপরাপর ভবদার ঘরে গিয়ে হাজির হইয়া বাবার পুনরায় গয়া আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। বাবার গাড়ীতে আমি ছিলাম। বাবা গতবারে গয়া অবস্থানকালে ফেলুদার বাটী কখনও আসেন নাই। বাবা ফেলুদার বাটীর দরজায় "দিদিমা, দিদিমা, মা, মা, যমুনাদাসী" নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। যমুনা ও ফেলুদার কন্যা দুইজনা বাবাকে দেখিয়া হতবাক হইল। শেষে বলিল, "দিদিমার হাঁপানি বৃদ্ধি পাইয়া কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছেন। বাবা ও মা (অর্থাৎ ফেলুদা ও তাঁর স্ত্রী) আপনাকে পাটনা হইতে আনিতে রাত্রে ট্রেনে রওনা হয়ে গেছেন।" শ্রীশ্রীসাধুবাবা কোন কথা না বলিয়া দিদিমার (ফেলুদার শাশুড়ি) শয্যায় গিয়া দেখেন যে বৃদ্ধার চোখের জলে বালিশ বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে ও বাবাকে

দেখিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "গতরাতে আমি গোবিন্দ, রামগোবিন্দ, রামগোবিন্দ বলিয়া কেঁদে কেঁদে ডেকেছি, চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে।" বাবা বৃদ্ধার তখন শ্বাসকষ্ট দেখিয়া হস্ত দিয়া বৃদ্ধার বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতে শ্বাসের হ্রাসবৃদ্ধি বুকের উঠানামা কমিল না। বাবা তখন দাঁড়াইয়া নিজ চরণ দিয়া বৃদ্ধার বক্ষে দাঁড়াইলেন। বাম পা মাটিতে, দক্ষিণপদ বৃদ্ধার বক্ষে। কে যেন দপ করিয়া আগুন নিভাইয়া দিল। ঠিক এমনভাবে বৃদ্ধার বুকে শ্বাসকষ্টের উঠানামা যেন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। আমি নিজে হাঁপানী রোগী। আমি স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এ ঘটনা দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ যাদু না আমার চোখের ভ্রম। আমারও এই দেখিয়া মস্তিষ্কে চাঞ্চল্য আসিল। দেখিলাম, বৃদ্ধা উঠিয়া নিজে স্নান করিয়া সুচীবস্ত্র পরিধান করিয়া বাবার চরণযুগল কোলে লইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। আর বাবাও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আমিও অর্দ্ধেক সাধু হইয়া গেছি মনে করিয়া বাবার পাশেই শুইয়া পড়িলাম। সেই অভূতপূর্ব ও ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনা ও দৃশ্য এখন মনে পড়িলে মনে হয় স্বর্গের শান্তি যেন তখন পৃথিবীর ঐখানটিতেই বিরাজ করিতেছিল।

এদিকে ভবদা ও তাঁর ভাই বটু শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝ সহ ফেলুদার বাড়ি হইতে নিজবাটীতে লইয়া যাইবার জন্য নীচে বাবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। অধিক বেলায় বাবা ও আমি ভবদার বাড়ী গেলাম। তথায় ভবদার মাতার পরিচর্যায় আমরা ১১ জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আবার রওনা দিলাম। আমরা পথে বৈকালে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মায়ের নিকট পায়েস প্রসাদ পাইলাম। বাবার সহিত বৃদ্ধার ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ঠাকুরের যে কাহার সহিত আলাপ পরিচয় ছিল না তাহা আমরা জানিতাম না। বিশ্বশুদ্ধ সকলেই যেন তাঁহার পরিচিত। সূর্য্যাস্তের পূর্বে

বাবা রাজগীরে আবার গরমজলে স্নান করিবেন বলিয়া চালকের উপর জোরে গাড়ী চালাইবার আদেশ দিলেন। সন্ধ্যার সূর্য্য ডুবু ডুবু—এমন সময়ে রাজগীরে গরম কুণ্ডে সাধুবাবা আবার স্নান করিলেন। এদিকে গাড়ীর চাকা ছেঁদা হইয়া গিয়াছে। তাহা মেরামত করিয়া রওনা হইতে বিলম্ব হইল। ২রা জানুয়ারী আদালত খুলিবে। অনেক কাজ। যোগ না দিলে আর্থিক লোকসান,—নানারকম দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া মনে মনে বাবাকে দোষ দিলাম। তাহার উপর আমার বাম চক্ষু ইতিমধ্যেই লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রণাও করিতেছে। জ্ঞানবাবুর মানসিক অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁহারও অফিস কামাই হইবে। বাবা আমার চোখের যন্ত্রণা কমাইবার জন্য হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। কিন্তু উপসম হইল না। আমরা ৭টায় পাঞ্জাব মেল ধরিতে পারিব না। সকলেই হাল ছাড়িয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছি গাড়ীতে। পাটনা ষ্টেশনে যখন আমাদের মোটর ঢুকিল তখনও পাঞ্জাব মেল আসে নাই। পাঞ্জাব মেল দুই ঘণ্টা লেট।

তখন বাবার লীলা বুঝিবার বুদ্ধি বা সাধ্য আমার নাই। ধন্য আমার সুকৃতি। তিনি নিজ গুণে কৃপা করিয়া আমাকে গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে লইয়া গিয়া তাঁর যে লীলা দেখিবার সুযোগ দিয়াছিলেন তাহাতে আমি কৃতকৃতার্থ। তাহা আমি আমার অন্তরের মণিকোঠায় সযত্নে তুলিয়া রাখি ও উহা হইতে অদ্যাপি প্রেরণা লাভ করি। তাঁহার রাতুল চরণে আমার অনন্ত প্রণতি, যেন জন্মান্তরে আবার তাঁহার কুসুমতুল্য নরম শ্রীচরণেরই পরশ পাই।"

* * * *

আমার মাতাঠাকুরাণী ৯ই ভাদ্র ১৩৫০ সন (ইং ২৬শে অগাষ্ট

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার সকাল দশ ঘটিকায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ রাখিবার তিন দিন পূর্বে প্রাণপ্রিয় ঠাকুর রাত্রি ১১টার সময় আমাকে ডাকিয়া পাশের বাড়ীর দোতলায় লইয়া গেলেন। তখন আমার বয়স ২০ বৎসর। আমার মা শ্রীমতী আন্নারাণী দেবী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা—পেটের রোগে ভুগিতেছিলেন। ঠাকুর আমাকে মায়ের বামপার্শ্বে বসিতে বলিয়া স্বয়ং দক্ষিণপার্শ্বে বসিলেন এবং মায়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোর কি চাই বল? এই বেলা বল্ মা।" মাতাঠাকুরাণী আমসত্ব খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি চাস্ মা, তুই বল।" তখন মাতাঠাকুরাণীর চক্ষু দুইটি ছল-ছল করিয়া উঠিল এবং অতিকষ্টে ধীরে ধীরে ঠাকুরের ডান হাতখানি নিজের বুকের উপর লইয়া আমার একখানি হাত ঠাকুরের হাতের উপর রাখিয়া ধীর ও ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, আজ হইতে পরিতোষ তোমার। তুমি উহাকে দেখিও। তোমার চরণতলে উহাকে একটু ঠাঁই দিও। পরিতোষ যদি বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে উহার বিবাহ দিও। পরিতোষ একটু আলু খাইতে ভালোবাসে। উহাকে একটু আলু খাইতে দিও।" ঠাকুর তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নিজের জন্য কিছু চা। নিজের জন্য কিছু চাইবি না মা?" তখন মা বলিলেন, "বাবা গোবিন্দ, তুমি ত আমায় তোমার চরণতলে ঠাঁই দিয়াছ। তাহা না হইলে তোমার মাকে তুমি দেখিতে আসিবে কেন? আমার পরিতোষের জন্য বড় ভাবনা হইতেছিল। এখন আমি নিশ্চিন্তে তোমার নাম লইতে লইতে মরিতে পারিব।" সেই রাত্রেই ঠাকুর আমার শিবপুর বাজার হইতে আমসত্ব আনিয়া মায়ের মুখে দিয়াছিলেন। তিনদিন বাদে আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ও নাম শুনাইতে শুনাইতে মাকে নারায়ণের চরণামৃত পান করাইলাম। মা চিরতরে চক্ষু বুজিলেন।

তুলসীর, আমার ও ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী এগারো মাসের ভিতর

দেহ রাখেন। আমার মাতৃবিয়োগ হয় ৯ই ভাদ্র ১৩৫০। তুলসীর মাতৃবিয়োগ হয় ১৪ই কার্ত্তিক ১৩৫০, অর্থাৎ দুই মাস পাঁচ দিন পরে এবং গুরুনারায়ণের মাতাঠাকুরাণী বৈকুণ্ঠে গমন করেন ৩০শে আষাঢ় ১৩৫১ (ইং ১৪ই জুলাই ১৯৪৪)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক লীলার শেষ নাই। যিনি নিত্যলীলা করেন তাঁহার লীলার অন্ত নাই। অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যয়। যিনি অজর, অমর, অক্ষর তাঁহার কথা স্মরণ করিলেই গঙ্গাস্নান। তাঁহার জীবনীই ভাগবত। তাঁহার কাহিনীই মহাভারত। তিনি সকলকেই নিজের মত করিয়া লইতেন এবং যে কেহ তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন প্রত্যেকেই মনে করিয়াছে "ঠাকুর আমাকে যত ভালোবাসেন এমনটি উনি আর কারুকে ভালোবাসেন না।" যিনি সর্ব্বব্যাপ্ত তাঁহাকেই আমরা ভুল করিয়া মনে করি তিনি বুঝি বৃন্দাবনে আছেন, হরিদ্বারে আছেন, কৈলাসে আছেন—আমাদের হইতে বহুদূরে আছেন। আমরা সাধারণ মানুষ অসাধারণকে সাধারণের মাপকাঠিতে মাপিতে যাই এবং বার বার ভুল করিয়া ফেলি। কোন ফর্মূলাতে তাঁহাকে বাঁধা বা বোঝা যায়না। প্রাণগোবিন্দ যেখানেই থাকিতেন উহাই হইত বৃন্দাবন, কৈলাস-মানস সরোবর বা হরিদ্বার।

যখন আমরা শ্রীনাথকে বিজয়নগরে মহাকালী প্রতিষ্ঠারত দেখি তখন মনে হয় দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী বুঝি এইবার দেখা দিলেন দাক্ষিণাত্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বিজয়নগর রাজপ্রাসাদে কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণীরূপে। মহাবৈষ্ণব, আয়েঙ্গার মহাবিষ্ণু আজ্ঞা প্রবর্ত্তমানস্থ ব্রাহ্মণবলঃ ধর্ম্মশক্তিরক্ষণার্থং, ক্ষত্রিয়বলঃ রাজশক্তিরক্ষণার্থং বৈশ্যবলঃ ধনশক্তিরক্ষণার্থং, শূদ্রবলঃ শ্রমশক্তি-রক্ষণার্থং দাক্ষিণাত্যে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণব ও শৈবক্ষেত্রে মহাশক্তির সংযোগ ঘটাইয়া ভবিষ্যতের কি বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করিবে। বাংলার শাক্ত ধর্ম্ম দক্ষিণের বৈষ্ণবের সহিত মিলিয়া অসাধ্যসাধন করিবে।

জগজ্জননী বিজয়নগরের মহারাণী ললিতাদেবীকে জগদ্‌গুরু রাম-গোবিন্দ দ্বারা বিজয়নগর রাজ্যে রাজপ্রাসাদে মহাকালী প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দিলেন। মহারাণীর বাসনা ছিল বারাণসীতে মহাকালী প্রতিষ্ঠা করিয়া সাড়ম্বরে পূজা, ভোগ রাগাদির ব্যবস্থা করিবেন। সনাতন ধর্মের ইতিহাসে বিজয়নগর রাজের অবদান ও কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। হিন্দু সমাজ ও শাশ্বত সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্ত্তা স্তম্ভস্বরূপ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের দান ও পৃষ্ঠপোষকতা এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্মকে বাঁচাইয়া, সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। ধনী রাজাদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া তাঁহারা ভারতের ইতিহাসে কীর্ত্তিত।

বিজয়নগর রাজবংশ জয়পুর, মহীশূর, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজবংশের ন্যায় ভক্তি ও শক্তিতে অতি পরাক্রমশালী ছিলেন এবং আন্তঃরাজ্য বিবাহবন্ধনে হিন্দু সমাজের আদি ভাব ও ধারা রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। বহুবার তাঁহাদের বাহুশক্তির জোরে দিল্লীর মসনদ পর্য্যন্ত টলাইয়া দিয়াছিলেন। সেই রাজবংশের গুরু বিংশ শতাব্দীর অবতার পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামী। তাঁহাকে সনাতন ধর্মরক্ষক ও সংস্থাপনার্থক শ্রীশ্রীমহাবিষ্ণুআজ্ঞাপ্রবর্ত্তমানস্থ-পূর্ণঅবতাররূপে রাজবংশীয়গণ ধ্যান করিতেন। সাড়ম্বরে তাঁহারা এই মাটির মানুষ রামগোবিন্দকে 'জগদ্‌গুরু' পূর্ণাবতার আখ্যায় বরণ করিয়া লইলেন।

নিস্তারিণী মা কালীর আদেশানুসারে রাজমহিষী ললিতা দেবী বারাণসী হইতে কষ্টি পাথরের অপরূপ কালীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বিজয়নগর রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

রাজপরিবারের বিলাত ফেরৎ ডাক্তার জি, রামা আয়েঙ্গার ঠাকুরের মহাভক্ত ছিলেন। স্যার বিজয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেটার ও ক্রিকেট জগতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রসিক-ধারা বিবরণকারী বলিয়া সর্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত। তিনি একজন

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিকারীরূপে স্বীকৃত। পদ্মভূষণধারী রাজ্যসভার সদস্য স্যার বিজয় ছিলেন ঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত।

স্যার বিজয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজের মৃত্যুতে মহারাণী মাতা যখন শোক-বিহ্বলিতা সেই সময় প্রাণগোবিন্দ মহারাণীর আকুল হৃদয়ের আকর্ষণে বিজয়নগর রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে "মা" "মা" বলিয়া আবির্ভূত হইয়া সমাধিস্থ হইয়া যান এবং আশীর্বাদ করেন। তাঁহাকে স্পর্শ দেন। পরে মহারাণীমার মুখে শুনিয়াছি, "আমি মনে মনে যাহা আশা করিয়াছিলাম বাবাজী আমায় সেইরূপ দর্শন করাইয়াছেন। আমার আর শোক-তাপ কিছুই নাই। চিরদিনের জন্য বাবাজীর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি।"

মহারাণী ললিতা দেবী রাজকুমারীর সহিত কয়বার আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রমে রাত্রিবাস, পুকুরে স্নান, প্রসাদ গ্রহণ, ভক্তদের উচ্ছিষ্ট পাতা পরিষ্কার করিয়া কত আনন্দ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্ত্তনের সময় দুপুরে কখনও তিনি ভিতরে বসিতেন না। দাক্ষিণাত্যের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আদর্শস্থানীয়। করজোড়ে ভক্তবৃন্দ যেখানে জুতা রাখিতেন তিনি সেইস্থানে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেন এবং আত্মহারা হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে শ্রীগোবিন্দের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন॥ মহারাণীমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিলে তখন পাথরও গলিয়া যাইত। মহামান্যা ললিতাদেবী যেন সাক্ষাৎ ললিতা সখীই ছিলেন। তিনি ঠাকুরের একজন প্রধানা রসদ্দার ছিলেন। ভিজি বা স্যার বিজয়ও মাঝে মাঝে গুরুদর্শন করিতে আশ্রমে আসিতেন।

একবার স্যার বিজয় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদন করিলেন যে তিনি অপুত্রক যদিও তাঁহার তিনটি কন্যারত্ন আছে। তিনি জানাইলেন, "আচার্য্যদেব, আমার একটি পুত্র সন্তানের বড় বাসনা হইয়াছে।" তিনি সব শুনিয়া ভিজিকে বলিলেন, "কাশীতে

তোমার প্যালেসে আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিব। উহাতে তোমার দুইটি পুত্র সন্তান হইবে।”

মহারাণীমা ও ভিজি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশী গিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞের রাজসমারোহে সকল ব্যবস্থা করিলেন। ভিজি ঠাকুরকে প্লেনে করিয়া বারাণসী লইয়া গিয়াছিলেন ও গোবিন্দ ভেলুপুরার রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রিয়শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। অচিরেই তাঁহার বাক্যানুসারে ভিজির পর পর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহারা এখনো সুস্থ শরীরেই আছে।

আমরা পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে মহা মহা ঋষিমুণির কথা পড়ি ও শুনি। যাজ্ঞবল্ক্য, ভরদ্বাজ, ভৃগু, কশ্যপ, কপিল, ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ব্যাস, বাল্মীকির কথা আমরা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী বিস্ময়করভাবে তাঁহাদেরই সমতুল। তাঁহার কথাই ছিল বেদ। দেবতাদেরও ক্ষমতা ছিল না যে তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী পাল্টায়। দেবতাদের তিনি তাঁহার আদেশের আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার স্বরচিত কবিতা—

“গোবিন্দ নাম, ধাম সার সারাৎসার
পরিপূর্ণতম, গীতগোবিন্দ বৈরাগ্য নাম
রামগোবিন্দ ধরি নাম, ধাম সেই নিত্য বৃন্দাবন।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরা ধরাধর
সুধারায় পূর্ণ করেন মন, অনন্তও পায় না অন্ত
শান্ত সাধুর আকার প্রকৃতির পরপারে রন।”

তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহাকে জানিলে সম্যক উপলব্ধি হয় কেন স্বয়ং নারায়ণ ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণশক্তির পূর্ণবিকাশ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

বিজয়নগরের রাজমহিষীর আন্তরিক ইচ্ছা অনুসারে ১লা

মার্চ ১৯৪৪ খ্রীঃ ১৬।১৭ ফাল্গুন ঠিক দোল পূর্ণিমার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া অর্থাৎ অরুণদা, শীতলদা, শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, অদ্বৈতদা, তুলসীদাস ও আমাকে লইয়া বিজয় নগর যাত্রা করিয়াছিলেন। পরে মোহিনীমিলের শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী লীলাময়ীদেবী গিয়াছিলেন। প্রথমে রাজবৈদ্য ডাঃ জি, রামা আয়েঙ্গারের বাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিজয়নগর আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল। আনন্দময় যেখানেই যান সেখানেই শ্রীবৃন্দাবন। সেইখানেই নিত্য লীলা চলিতে থাকে।

গোবিন্দের আগমনবার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৈকাল হইতে না হইতেই ভক্ত ও শিষ্যদের ভীড় জমিতে লাগিল। আম্মা ও বাবারা তাঁহাদের হারানিধি যেন পাইয়াছেন। তাঁহারা গোবিন্দনামে প্রচুর গান, স্তোত্র, ভজন, ১০৮ গোবিন্দস্তোত্রমালা ও গোবিন্দমাহাত্ম্য ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণাধিককে পাইয়া সমস্ত উজাড় করিয়া দিলেন। দোল পূর্ণিমার উৎসব আনন্দ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল।

ডাক্তার বাবার গৃহের উঠানে সাড়ে চার ফিট উঁচু ২৮ কোণ বিশিষ্ট পদ্মফুল আকারের বিরাট যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ার করিয়া শুক্রবার দোল পূর্ণিমার দিন সকাল হইতে যজ্ঞ শুরু হইয়াছিল। প্রথমে পঞ্চশস্য, গব্যঘৃত, মাখন, সমিধ প্রভৃতি ও পরে পরমান্নের আহুতি হইবে। যজ্ঞবেদী কলাগাছ, বনমালা, ফুল দিয়া সাজানো হইল। আম্মারা চারিদিকে সুন্দর আলপনা দিয়া প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন।

পরদিন শুক্রবার দোল পূর্ণিমা। ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকে স্নান করাইবার জন্য ভোর হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি সকালে নানারূপ গন্ধ তৈল, সাবান, মশলা দিয়া স্নানে বসিলেন। ঠাকুর স্নান সারিয়া নূতন গরদ পরিয়া তিলকাদি সেবা করিয়া

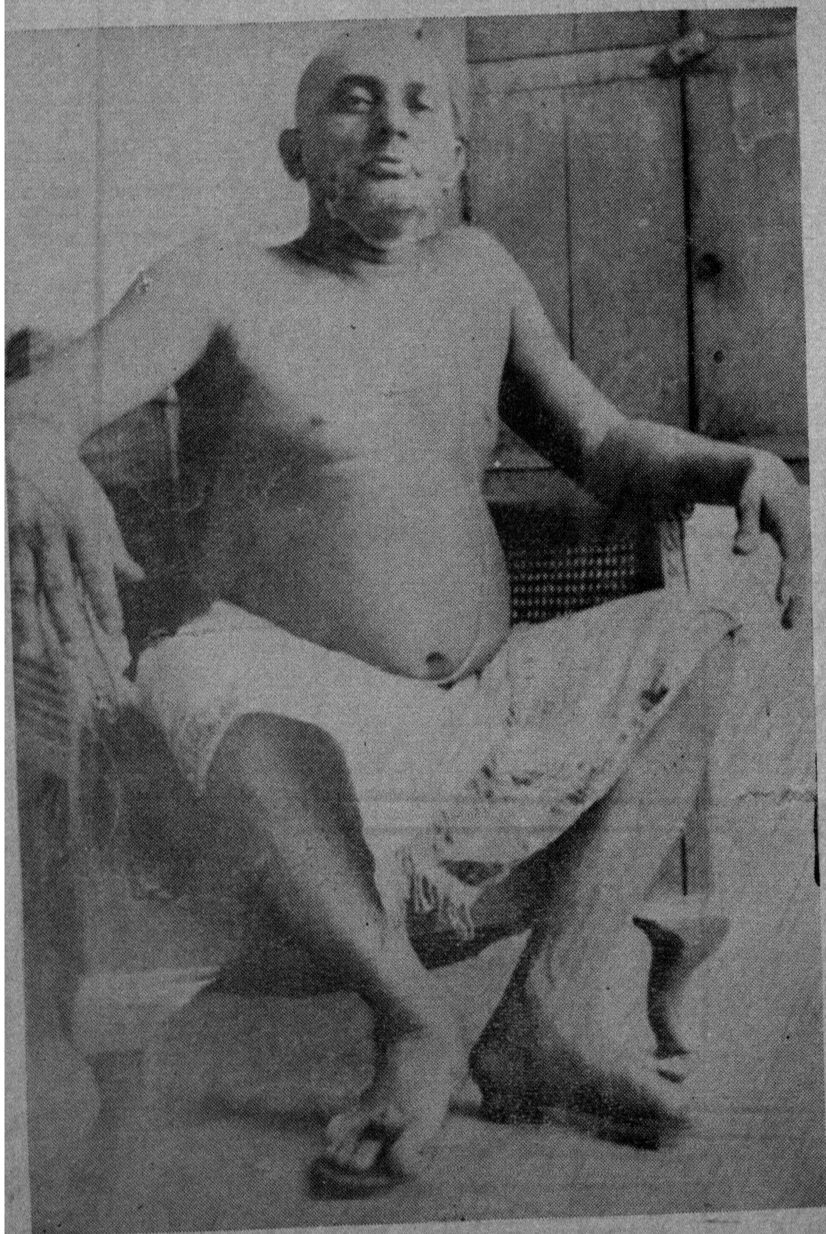
যজ্ঞবেদীতে আসন গ্রহণ করিলেন ; তাহার পর বেলা নয়টা নাগাদ যজ্ঞ শুরু হইল। সেই যজ্ঞ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই কিছুটা অনুভব করিয়াছেন। লেখনীতে ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না। আকাশ ছোঁয়া যেমন অগ্নিশিক্ষা উঠিতেছে তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ নিঃসৃত মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। যে যে দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হইতেছে সেই সেই দেবতা আসিয়া সেই আহুতি গ্রহণ করিতেছেন। অবশ্য ইহার আগে ও পরে আমরা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু শিষ্যভক্ত তাঁহার প্রাণবন্ত মন্ত্রের যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যে সব সময় জীবন্ত দেবদেবী লইয়া খেলা করিতেন তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বেলা ১১টা নাগাদ ঘৃত আহুতির পর পরমান্ন আহুতি শুরু হইল। একমনে একপ্রাণে এইরূপ যজ্ঞ চলিতে থাকাকালীন হঠাৎ দেখা গেল ঐ বিরাট অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নির ভিতর মস্তকে কীরিটধারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেন সিংহাসনে বসিয়া আছেন—চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। হাজার হাজার ভক্তশিষ্য বিগলিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। পরমান্ন আহুতি বন্ধ হইল। ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাকাইয়া আছেন। সকলে ফটো তুলিবার জন্য ঠাকুরের শ্রীচরণে কাতর আবেদন নিবেদন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে আনন্দাশ্রু বহিয়া যাইতেছে—সে যে কী দৃশ্য, কী রূপ, কী লীলামাধুর্য্য লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। ইহারই ভিতর ঠাকুর হটাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যাও, এক ঘণ্টা থাকিবে ফটো তুলিতে হয় তুলিয়া লও।" ফটোগ্রাফার আসিয়া ফটো লইয়া গেল। ঠাকুরের আসনে প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। যজ্ঞকুণ্ড একঘণ্টার জন্য স্পর্শ করা বারণ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঠাকুর আমার নিত্যলীলায় ফিরিয়া আসিয়া রূপার ঘড়া করিয়া দুগ্ধ ও দধি ঢালিতে লাগিলেন—তাহার পর সেই মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। অগ্নি শান্ত

কলিযুগাচার্য্য শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ



আচার্য্য শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ পরমহংস



ভক্তগৃহে প্রাণগোবিন্দ

হইল। তাহার পর যজ্ঞকুণ্ড ঘেরিয়া রাধেগোবিন্দ কীর্ত্তন এবং ভজনের পর ভোজন লইল। সে যে কী আনন্দ—"যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে।" এইরূপ বহু বহু লীলা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই শ্রীগোবিন্দ আশ্রমেও তিনি করিয়াছেন।

এদিকে যখন আনন্দ উৎসব চলিতেছিল তখন অন্যদিকে কোরকোণ্ডা রাজপ্রাসাদে মহাকালী প্রতিষ্ঠার বিপুল যোগাড় ও আয়োজন রাজ-আড়ম্বরে চলিতেছিল। সপ্তাহান্তে সকলে মিলিয়া কালী প্রতিষ্ঠার জন্য কোরকোণ্ডা প্রাসাদে যাত্রা করিলাম।

বিরাট রাজপ্রাসাদ ও বাগানবাড়ি। প্রাসাদের সীমানা পাঁচিলের চারি কোণে চারিটি নহবৎখানা সাক্ষী দিতেছে বিজয়-নগরের রাজার প্রতিপত্তি ও শ্রী। তাহারই একটি নহবৎখানার সামনে মাঝারী ধরনের একটি মন্দির তৈয়ার করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পুর্ণ তন্ত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শুরু করিলেন। তন্ত্রানুসারে ৫২টি যন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করাইলেন। রাজার বিরাট বাহিনী সেই সব খনন কার্যো নিযুক্ত হইল এবং সপ্তনদী হইতে অভিষেকাদির জন্য বারি আনয়ন করাইলেন।

প্রতিষ্ঠার দিন ভোরে ঠাকুর তাঁহার প্রিয় ভক্তকে আদেশ করিলেন, "প্রাসাদের ঠাকুর ঘর হইতে কালী বিগ্রহ লইয়া আইস।" আর তুলসীদাসকে বলিলেন, "তুমি আগে আগে জলের ঝারা দিতে দিতে আসিবে।" "কষ্টিপাথরের কালী-বিগ্রহ উচ্চতায় একহাত পরিমাণ হইবে। আমি ও তুলসীবিগ্রহ আনিতে গেলাম। প্রাসাদের ঠাকুর ঘর হইতে কোলে করিয়া ঠাকুর লইলাম। শিবের উপর মায়ের মূর্ত্তিটি একটু নড়িতেছিল বলিয়া আমার মনপ্রাণ পুরোপুরি মূর্ত্তিটির উপরই ছিল কারণ যদি অসাবধানতা হেতু হাত হইতে ফসকাইয়া পড়িয়া যায়।

প্রাসাদ হইতে মন্দিরে আসিবার কালে পথে দেখা গেল একটি সোনার বর্ম উড়িয়া আসিয়া আমার কোলের ভিতর মায়ের

পায়ে বসিল এবং ভোঁ ভোঁ করিয়া পায়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। ঐ সোনার কূর্ম হইতে কি তেজঃ বাহির হইতেছে, চোখ যেন ঝলসাইয়া যাইতে লাগিল। মন্দিরের কাছাকাছি যখন পৌঁছিয়াছি তখন উপস্থিত সমাগত ভক্তবৃন্দ বলিয়া উঠিল, "বাবা, বাবা, পরিতোষের চরণে সোনালী রংয়ের কি একটা দারুণ জ্বলিতেছে এবং ঘুরিতেছে।" সাধুবাবা মন্দির হইতে উঠিয়া আসিয়া বিগ্রহের দিকে দেখিলেন এবং আমাকে অতি সন্তর্পণে মন্দিরের ভিতর লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর ধীরে ও সন্তর্পণে বেদীর উপর রাখিলাম। কিছুক্ষণ বাদে যখন সোনার কূর্মের কথা মনে পড়িল তখন আর সোনার কূর্ম দেখা গেল না। কোথায় যে মিলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

তারপর প্রত্যহ সকাল ৬টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ১৫ দিন ধরিয়া পুরা তন্ত্রসার লইয়া ঠাকুর প্রতিষ্ঠা-কার্য্য চালাইলেন। মহারাণীমা'র কালী প্রতিষ্ঠা বেশ রাজকীয়ভাবে চলিতে লাগিল। সকালে পূজা ও প্রতিষ্ঠা-কার্য্য এবং বিকালে এক একটি যজ্ঞকুণ্ডে বিরাট যজ্ঞ চলিতে লাগিল।

পূজায় বসিয়া একদিন ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে নিজেকে আগে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।" আমি মন্দিরের ঠাকুর ঘরের সামনে অর্থাৎ বিগ্রহের সামনে পূজায় বসিয়াছি, আর তুলসী সামনে নাট মন্দিরের তলায় বেদীতে স্থাপিত ঘটের সামনে পূজায় বসিয়াছে। আমি বলিলাম, "আত্মসমর্পণ কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহা করিতে হয়?" আমার প্রাণাধিক ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া একটু বিরক্তি স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আত্মসমর্পণ কাহাকে বলে জানো না? আঃ! তোমাদের নিয়া আর পারি না। যাও, আমিই তোমাদের হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়া দিতেছি।" দয়াল কৃপালু পূর্ণ অবতার ঠাকুর এই কথা বলিয়া একটু চাদর দিয়া

কপাল পর্য্যন্ত মাথাটি ঢাকিয়া যোগাসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ভক্তবৃন্দের ভিতর হৈ হৈ পড়িয়া গেল। ভক্তবৃন্দের ভিতর মহারাণী মাতারও কুটুম্ব আত্মীয় অনেকে ছিলেন। সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "একি দেখছি, একি দেখছি! এ যে স্বয়ং কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণী কালীমাতা বসিয়া আছে!" সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি অবিকল কোরকুণ্ডেশ্বরী কালীমাতার ন্যায় দেখাইতেছিল। ঐরূপ দেখিয়া আপামর সকলে বলিয়া উঠিলেন, "মা মন্দিরের ভিতর আর নাই, বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণী কালীমাতা জাগ্রত হইয়াছেন" প্রভৃতি। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইল। ঠাকুর চোখ মেলিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, "যাও, আমি তোমাদের হইয়া ৺মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছি, এবার পূজা শুরু কর।"

আমরা একটি লীলা বরাবরই লক্ষ্য করিতাম যে ঠাকুর যজ্ঞ আরম্ভ করিলে যেমন একদিকে দেবতাগণের আবির্ভাব হইত, প্রত্যক্ষ হইত, তেমনই যজ্ঞাগ্নি নিভাইবার জন্য বরুণও বৃষ্টিবর্ষণ করিতে ছাড়িত না। বরুণদেবের সহিত প্রাণগোবিন্দের ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত। প্রায় সময় বৃষ্টি হইবেই। কোরকুণ্ডায় উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বৈকালের দিকে যজ্ঞ হইত আর অগ্নিনির্বাপণের জন্য বৃষ্টিও হাজির হইত। প্রাণের ঠাকুর মেঘের দিকে তাকাইয়া এমন ধমক লাগাইতেন যে মেঘ উড়িয়া পলাইত। ঠাকুরের ধমক লাগাইবার সেই উগ্রমূর্ত্তি না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। এক একদিন ভক্তবৃন্দ যজ্ঞ দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, "বাবা কি দেখিতেছি কি দেখিতেছি" বলিয়া লুটাইয়া পড়িতেন। প্রাসাদের রকে ও চতুঃপার্শ্বে ভক্তবৃন্দ বসিয়া বিরাট যজ্ঞে আহুতি দেখিয়া ধন্য হইতেন। বহুব্যক্তি অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন।

যজ্ঞে দেবগণের আবির্ভাব শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন ছেলেখেলার ন্যায় ছিল। এত সাধারণভাবে পূর্ণব্রহ্ম রামগোবিন্দ দেবতাদের

লইয়া খেলিতেন যে এখন মনে হইলে বিস্ময় জাগে। এমন সাধারণভাবেই অবতার আসিয়া চলিয়া যান যে আমরা ধরিয়াও ধরিতে পারি না, বুঝিয়াও বুঝি না। শ্রীকৃষ্ণ যাহা লীলা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন উহার প্রতিটি সত্য ও বাস্তব। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভেজালে উহা সকল আমাদের অবিশ্বাস করিতে মাত্র শিখাইয়া আমাদের স্বধর্ম সম্বন্ধে অনাস্থা সৃষ্টি করিতেছে ও সন্দিহান করিয়া তুলিয়া আমাদের দুর্বল করিতেছে।

এইরূপে পনের দিন ধরিয়া নিস্তারিণী কালীমাতার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রাণগোবিন্দ তুলসী ও পরিতোষকে মাতৃ-মন্দিরে রাখিয়া অন্যান্য সকলকে লইয়া শ্রীকূর্ম, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি অভিমুখে রবিবার ২৫শে মার্চ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা করিলেন।

নিস্তারিণী কালীমাতার প্রতিষ্ঠার সময় সোনার কূর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কূর্মপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি শুক্রবার পরমান্ন হোমের ব্যবস্থার আদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিয়া শ্রীগুরুনারায়ণ তুলসী ও পরিতোষকে যে পত্র দিয়াছিলেন উহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম——

তৎসৎ

মন্ত্র ও তন্ত্র স্বরবর্ণ সকল তিনি। এই হইল ত্যাগ, তিনি করেন তিনি ভাবেন আমিও তিনি আমায় তিনি হইলেই ভক্ত ও ভগবান মিলন এক অভিনব ভাব সেইরূপ জ্ঞান করিতে হইলে অর্থবাদ থাকে না শান্তি অনির্ব্বচনিয় সর্ব্বারাধ্য হে দেব দেব সাধ্যা ভাবাধীকায় নয় সেই পরম-পুরুষ মহাত্যাগীকে আমরা বুঝিতে না পারায় অমঙ্গলের সান্নিধ্যে পতিত আছি একাই সে কতক ব্যাপারে সর্ব্বারাধনায় মনোবাগময় জ্যোতিতে সকল একাংশি করিয়া উত্তম শ্লোক একা আনন্দে আনন্দিত পূর্ণ তাহাকে পূর্ণ করে অন্যকেও করে যতদূর পর্য্যন্ত সে যাইতে পারে সে ততদূর পর্য্যন্ত

যায় ও আসে কে আনে না তিনি আসেন আমি ও আমি যেমন একটি বীজে অন্য বীজ আসে সে এবং পরগাছাও আসে আসুক আমিও যাইব সেও আসিবে। মা নিস্তারিণী কোরকুণ্ডেশ্বরী এবার তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম আয়েঙ্গার ভবনে পরের দিন চলিলাম ৪॥০ টাব সময় শ্রীকূর্ম্ম আমি গিরিজাবাবু মা ও আয়েঙ্গার মা ছোটমা আম্বাজিম্মা শ্রীকূর্ম্ম দরশনে আর আর রহিল ভবনে আসে নাই কেন তারা মটরের তেল নাই বলে আমরা জ্বলে জ্বলে চলিয়া গেলাম শ্রীকূর্ম্মে কত আনন্দে বালক-বালিকা মেলে আইলাম নাচিতে গাহিতে হরিণাম গুণধাম মহানন্দে জনে জনে ভরি গেল শ্রীকূর্ম্ম কত আনন্দ একাই একাই অনেক্ষণ হয়ে গেল ভজনে খোল করতাল লয়ে আইল ভকত মেলে গৌর গোবিন্দ কীর্ত্তনে নাচিয়া গাইয়া উন্মত্ত হইয়া মাতোয়ারা হয়ে গেলাম সকলে তাহারা আসো বলি আয়েঙ্গার মা অস্তব্যস্ত উঠিলেন সবে। মটব গাড়ীতে দেখিলাম শ্রীকূর্ম্ম আকাশে উঠিয়া চন্দ্রমার সনে খেলা করেন যতনে আনন্দে মাতিয়া সবে ভাবভক্তি সবাই উড়ে গেল। সবাকার নদীতে জল বাড়িয়াছে—কী ভয়ে ভয়ে আসিলাম নদীর নিকটে তাই নামিলাম গাড়ী হইতে কত যে আনন্দ সেই জল নাই নদী তাই নদীপারে হৈ চৈ তাই পার হয়ে আসিলাম পারে গাড়ীতে চলিয়া আসিল পর বিজয়নগর। পরে একা দেখিলাম যবে মিলি আছে পথ পানে চেয়ে দেখিলাম এক অভিনব ভাব খাইয়া শুইয়া পরে শ্রীরঙ্গনাথ দুই করে টেনে লইলেন এক অনন্ত আকাশে আসিলাম শ্রীরঙ্গম পরে মহা মহেশ্বর একাধারে দ্বাদশ দিন ধরে কত রকম উৎস তার ঠিকানা নাই অনন্তকাল ধরে মহামহোৎসব এই হইল অমোঘ আমাদের ব্রাহ্মাস্ত্র প্রয়োগ পরব্রহ্মা পরাৎপর। অনন্ত বৈভব বিস্তর রাম শ্রীমৎ আনন্দ বর্দ্ধক বিশাল সপ্ত প্রাকার মধ্যে আশ্রিত জন পরিপালক রাম শ্রীমন্নারায়ণায় পরমার্থ তত্ত্ব বিংস্বরূপ যখন নিরামক

রামচন্দ্রকুলে ঈশ্বরকৃষ্ণ কমল নয়ন পার্থসার সময় গোপনে কৃষ্ণসনে মিলিয়া জ্ঞান উপদেশ দেন।

তোমাদের মহাসাধনার সময় তাই তোমাদের লইয়া গেলাম না। সিদ্ধ হও পরে লইয়া যাব। এই হইল ঈশ্বর সম্বন্ধের মহা পরিক্ষা এক মহানন্দে থেকে সেখানে ভুত ভাব ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আশ্চর্য্যকে একাই প্রভূত পরমানন্দ ধাম লাভ করে। সত্যসত্যই মহাপ্রভু এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে লালিত পালিত হয় অনন্তকাল এইরূপ জীবের সনে আনন্দ করে থাকেন তিনি ও আমি কবে হব যখন শান্ত প্রশান্তময় দাষ্য দাষ্যময়, সখা সখ্যময়, বাৎসল্যময় মধুর মধুরময় পরকীয় পরাৎপরময় হইয়া যাবে তারপর অনেকদিন সঙ্গছাড়া হবে না তখন তিনি আমি এক সকল জীবের এইরূপ অনুমিতে হেতুক্তজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধ জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়ক অপ্রাকৃত মদনমোহন সকল প্রকার জ্ঞান নিনাদই সমুক্ষ্য জ্যোতির্ম্ময় এক পরমা প্রকৃতীয় ভাব মহাভাব একিকরণ।

ঐ সময় বিজয়নগর হইতে অরুণদার লিখিত একটি পত্রের কিয়দংশ উঠাইয়া দিলাম—

C/o Dr. G. Rama Iyenger
Vizianagram
Wednesday 29-3-44

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রিয় ঘোষ সাহেব,

তোমার লিখিত ২১. ৩. 44 তারিখে পত্র আমরা যথাসময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু এতদিনে আমরা কোরকুণ্ডায় ৺কালীমাতার প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম; মাত্র গত রবিবার সন্ধ্যার সময় আমরা কোরকুণ্ডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

পুনরায় ডাঃ আয়েঙ্গারের বাটীতে অবস্থান করিতেছি। গিরিজাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী গত ২১শে তারিখে এখানে আসিয়া পৌঁছান; তাঁহাদের সহিত একটি চাকর ও একটি পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। গিরিজাবাবুরাও ভিজিয়ানাগ্রাম ষ্টেশন হইতে সটান কোরকুণ্ডা রাজপ্রাসাদে যাত্রা করেন; তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য মিঃ রঙ্গনাথম ও আমি রাজবাটীর দুইখানি মোটর লইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং তাঁহারা ষ্টেশনে পৌঁছাইলেই তাঁহাদের লইয়া কোরকুণ্ডা রাজপ্রাসাদে যাত্রা করিলাম।

আমরা এস্থানে গত ২রা মার্চ তারিখে পৌঁছাই এবং ডাঃ আয়েঙ্গারের বাটীতে আসিয়া উঠি; ১০ই মার্চ রাত্রি ১০টার সময় আমরা সকলে এবং ডাঃ আয়েঙ্গার ও মিঃ রঙ্গনাথমের পরিবারবর্গ কোরকুণ্ডা যাত্রা করিয়াছিলাম এবং গত রবিবার ২৬শে তারিখে সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করি। গত ১২ই মার্চ রবিবার সকাল ৯-৫৫ মিনিটে ৺কালীমাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। সাধুবাবা, রাজা, তুলসী ও পরিতোষকে লইয়া যখন মন্দিরের গর্ভগৃহে মূর্ত্তিটি স্থাপন করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মায়ের মূর্ত্তির দক্ষিণ চরণতল হইতে এবং শায়িত শিবের নাভিস্থল হইতে একটি খাঁটি সোনার রঙয়ের ছোট পোকা নির্গত হইয়া শিবের বক্ষস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। এই প্রাণীটি আকারে ঠিক কচ্ছপের মত এবং চারি পা যুক্ত; যখন চলিতেছিল তখন ইহাকে ঠিক কচ্ছপের মত দেখাইতেছিল। এই কূর্মাকৃতি প্রাণীটিকে ডাঃ আয়েঙ্গার প্রভৃতি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই একবাক্যে কূর্ম অবতার দর্শন হইল বলিয়া যেমনই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন তেমনই মোহিতও হইলেন এবং মহারাণী মাতা যদি ঐ দৃশ্য দেখিতেন তাহা হইলে তিনিই সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন। রাজবাটীর কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সেইহেতু তাঁহাদের কাহারও ভাগ্যে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিবার সুযোগ হইল না

যাহা হউক উক্ত কূর্ম অবতার ১৫ মিনিট মাত্র কাল শিবের বক্ষে বিচরণ করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর হইতেই এখানে খুব হৈ চৈ পড়িয়া এবং একজন সিদ্ধ পুরুষের দ্বারা এই ৺কালীমাতা প্রতিষ্ঠিতা হইলেন বলিয়া সকলেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

"বৃহৎতন্ত্রসার" অনুযায়ী নিম্নলিখিত যজ্ঞকুণ্ডগুলি নির্মিত হইল এবং ১৪ দিন ধরিয়া তন্ত্রোক্ত যজ্ঞসমুদয় সম্পন্ন হইল; এই কালী মাতার নাম হইল ৺কোরকুণ্ডেশ্বরী নিস্তারিণী কালিকাদেবী এবং দেবীর ক্ষেত্রকে শুদ্ধ ও অন্যান্য উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যে সকল যজ্ঞ হইল তাহা দেখিবার জিনিস; নিম্নে যজ্ঞকুণ্ডগুলির নাম দিলাম :—

(১) মহাচীনাচর ক্রমঃ (অথবা তারা যন্ত্রং) (২) শ্যামা যন্ত্রং (৩) প্রচণ্ড চণ্ডিকা যন্ত্রং (৪) অকডম চক্রং (৫) বরাহ যন্ত্রং……… ……৩৩টি যন্ত্র।

এইরূপ বৃহৎ ব্যাপার আমি আর কভু দেখি নাই এবং আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে কেহই কখনও দেখে নাই। যাহা হউক সমস্ত ব্যাপারটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে এবং কোনও রূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই।………কি হইবে না হইবে, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে; তবে ভবিষ্যতে ইহা এক বৃহৎ ব্যাপারে দাঁড়াইবে বলিয়াই আমার ও আরও অনেকের মনে হইতেছে।

…………এখানে আসিয়া আমাদের রাজার (প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়) খুব উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার রক্ত আমাশয় বন্ধ হইয়াছে।………আমরা আর সকলে শারীরিক কুশলে আছি। অদ্বৈতদা এইবার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।………

ইতি—শ্রীঅরুণ।

এইরূপে কত অলৌকিক কাহিনী নিত্য নিয়ত হইত তাহার সীমা নাই। তিনি যেখানেই যখন থাকিতেন অরূপ আসিয়া ওনার চারিপাশে রূপময় হইয়া নিরন্তর ফুটিয়া উঠিত। না দেখিলে বিশ্বাস করা ভার!

বিজয়নগরে শ্রীশ্রীনিস্তারিণী কোরকুণ্ডেশ্বরী কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠা হইবার পর স্যার ভিজি একটি পাথরে নিম্নলিখিত কথাগুলি ইংরাজীতে খোদাই করাইয়া স্থাপনা করান—

The Temple of
Sri Korukondeswari Nistarini Kalika Devi
Was established by
Maharajkumar Dr. Sir Vijayananda, Kt., LL.D., M.L.A. (Centre)
And the Sacred Pratishtha Ceremony
Was performed by
His Holiness Sri Govinda Narayana Baba
of Calcutta on 11th March, 1944
at 8 A.M. as a token of
Sir Vijaya's humble devotion to the
Mother Goddess.

১৯৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭ এই চার বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কোরকুণ্ডায় বৎসরের ছয় সাত মাস কাটাইতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং আমরা জন্মাষ্টমী বা রাধাষ্টমী নাগাদ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুর্গাপূজা, অন্নকূট, রাস ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব কাটাইয়া পুনরায় দক্ষিণে চলিয়া যাইতাম।

ইতোমধ্যে অরুণদা আশ্রম হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আশ্রম পরিচালনার দায়িত্বভার ধীরে ধীরে আমাদের স্কন্ধে অর্পিত হইতে লাগিল। দাদু (শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী) ও শীতলদা কিছুদিন চালাইয়াছিলেন এবং ১৯৪৮ সাল হইতে ঠাকুর উহা পুরাপুরি আমাদের দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি নিজস্ব আয়-ব্যয়ের খাতা ছিল এবং উনি মাঝে মাঝে উহাতে কি লিখিতেন। আমরা সেই খাতা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উহা হইতে কিছু কিছু উঠাইয়া দিলাম। পূর্ব্বে ইহার কিছু উল্লেখ রাখিয়াছি। উহার প্রথম পাতায় লেখা আছে:—

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং
ওঁ নমঃ নারায়ণায়
সন ১৩৪৮ সাল ৯ই আশ্বীন
আয় করি নাম সম্বৎসর॥
(ইহার পর ইংরাজীতে কি দুর্বোধ্য লেখা আছে)
মা আদ্যাঃশক্তির পূজা
উপলক্ষ্যে বিল্লীবরণ
ওঁ মা মহাসপ্তিঃ
মহা মহা পূজা শ্রীশ্রীওঁস্বঃ
ব্রত উৎসৰ শ্রীশ্রীহরিস্বর চিঞিঃ পূর্ণ মা দায়
শ্রীশ্রীদাষনুদষ শ্রীল শ্রীযুক্ত অরুণানন্দ স্বামী
বাকসাডা ও বালি ও বেহালা ও বালিগঞ্জ ও বিডন ষ্ট্রীট

উহার পর পৃষ্ঠায়

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং
সন ১৩৪৮ সাল ১২ই আশ্বিন

জমা—	খরচ—
বৃন্দা দেবীর বর—১০২৲	দধী—৩৩৲
কমলা দেবী—৫১৲	দুগ্ধ—১৮৵০
মহারাণী—১০০৮৲	কাপড়—৩৮৶/০
	পুজার সরঞ্জাম—১৫৩৷০
	সন্ধিপূজা—১১৬৲

অন্য এক পৃষ্ঠায়

৺শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

সন ১৩৪৮ সাল

২৭ বাঙ্গালা ৯৲—২৮০৲

গীরীধারী পূজা ৩৮৯৷৷৶০

অন্য এক পৃষ্ঠায়

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

জগদ্ধাত্রী পূজা

মহামায়া

১০৮৲ ৷৷৶০ ১৫

অরুণদাদাকে দেওয়া ৭২৲

অন্য এক পৃষ্ঠায়

৺শ্রীশ্রীরাস

মহারাস

১০০০০০৲

(কি সব হিজিবিজি সই—ইংরাজীর ন্যায়)

অন্য এক পৃষ্ঠায়

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

হরি ওঁ তৎসৎ

মহারাস যাত্রার খরচ—

জমা—৪,০০০০০০০৲

খরচ—১,০০০০০৲

(ইহার পর সব হিজিবিজি দুর্বোধ্য ইংরাজীর ন্যায় সই)

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

ওঁ তৎসৎ

রাস অন্তের যাত্রা

কলিকাতা টু পুরুলিয়া

সৎসঙ্গে আনুসঙ্গিৎ সরলিপি

খরচ—৫৫০৲ জমা—২০৷৷০

(ইংরাজীতে হিজিবিজি)

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

পুরুলিয়া টু কলিকাতা=২৮০০০

(হিজিবিজি লেখা)

পর পৃষ্ঠায়

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

কলিঙ্গ মহারাজার

১ প্রথম নবরত্ন বণিক

(ইংরাজী হিজিবিজি)

রাজধানি

ভীজয় নগরং

বীজয় নগর

বণিকমণ্ডলী

২০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা

দুইজন গোবিন্দ দাষ অর্জ্জুন দাষ

অন্য এক পৃষ্ঠায়

বসন্ত উৎসব বাবং

২০৮৲

বাসন্তী মহালক্ষ্মী পূজা বাব

১০৮৲

(হিজিবিজি লেখা)

পর পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

৺শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা

দরুণ ১০৮৲ টাকা

পর পৃষ্ঠায়

৺৭শ্রীশ্রীহরি শরণং ওঁ নমঃ নারায়ণায়

শ্রীমন্নারায়ণায় চরণৌস্মরণমহং প্রপদ্যে

শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ

জমা— খরচ—

নোটাপদ আহারো—

২৮২০০০

১০০০০০০০

২৮০০০০০০

তাঁহার হিসাবের খাতায় আরও কত কি ভাবের কথা লেখা আছে পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দ আনন্দসাগরে ভাসিবেন। আমরা মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

এক পৃষ্ঠায় পেন্সিলে লেখা আছে

আষাঢ়

মাঘ—মায়ের

জমা— খরচ—

১৮০০০০৲ ১৬৭৯৮৲

দধি ও মধু

আম সন্দেশ

২৮০৮

পর পৃষ্ঠায় কালিতে লেখা আছে

৮৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

কলিকাতা—কলিরকাতা

ও বাকসারা কেদার কানন হইতে মুজঃফরপুর ও পাটনা হইতে বেনারস ও কাশি হইতে কেদার কানন পর্য্যন্ত

জমা—	খরচ—
৩০৲	১০৮৲
২৫৲	২০০৮৲
৩০৲	৭০৩৲
৪০৲	

জমা হইতে খরচ বড়

কে কে কার পেষণ করিবে

(হিজিবিজি লেখা)

অন্য এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে

শ্রীচক্রবর্ত্তিদাদার তিরোভাব উৎসব বাবদ

আশুতোষ মন্দির

জমা—	খরচ—
১৲	৩১৬
৫৲	কাপড়
২৲	খাট
২০৲	পালঙ্ক

এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

সন ১৩৫০ সাল

২২শে ইংরাজি

বাংলা ৫ই আশ্বীন

জমাও নাই খরচও নাই

কেবল জমা

৩৩৩০০০০০০০০

আমেরীকার সাহাজ্য

দুর্গাপূজা বাবৎ

(উহার ভিতর বহু হিজিবিজি সই)

অন্য এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

কোরকুণ্ডা মহাকালি ও নবদুর্গা পূজ ও প্রতিষ্ঠা

জমা	খরচ
৩৬৫ কোটী ডলার	ঐ খরচ

২৬শে

এইরূপ কত রকমের লেখা আমরা উদ্ধার করিয়াছি

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

বেনিয়া—দিক

বাসন্তিকালিন উৎ

জমা	খরচ
১০১৬৲	২২৮৯৮০
	২৮৯৮৭৩

পূর্ণতর পূর্ণতম পরিপূর্ণতর পরিপূর্ণতম

পূজা দর্শন

১১১১১১১২৮৩৲

২৮০০০০০০

এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

ওঁ নমঃ রঙ্গনাথায়

ওঁ হ্বং নমঃ ওঁ ক্লীং নমঃ

ওঁ শ্লীং নমঃ ওঁ হুম্ নমঃ

ওঁ নমঃ রঙ্গনাথায় বিদ্মহে

ওঁ নমঃ রামগোবিন্দ ধীমহে

তন্নো রঙ্গনায়িকীবল্লভ প্রচোদয়াং (হিজিবিজি ইংরাজী)

জমা	খরচ
১১১৬	২৮০৮
৩০০	২৮৯৮০
	রেল খরচ ১২০০৲

অন্য এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

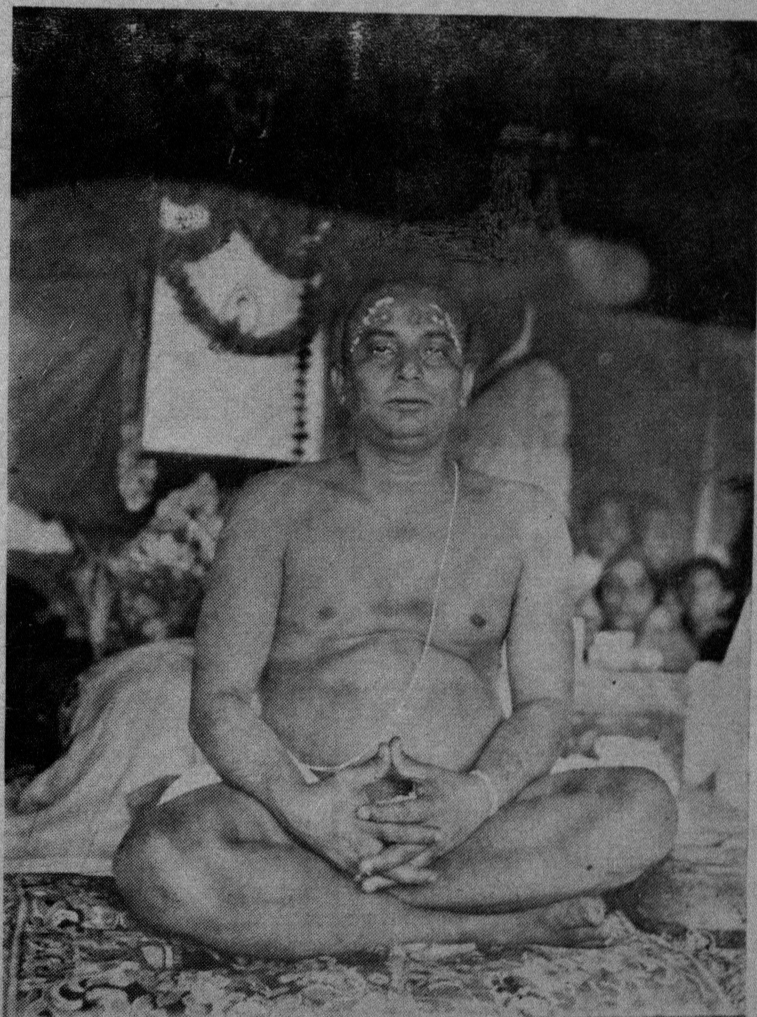
গুরু পুর্ণিমার সমাসীতভায় না নাম সম্বৎসর

জমা উৎসব ২২২২২০০০৲

২৮৯০৲

শ্রীরঙ্গম ও ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, মহিসোর, বেজবাড়া, অনকাপলি তুনি বিজয়ানগরম, বিশাখাপেট, বহরমপুর, কটক, পুরী, কলিকাতা

আনন্দময় শ্রীগোবিন্দ



১৯৪৯ আশ্রমে

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামীদেব



আশ্রমে দাদুর সহিত ঠাকুর (১৯৪১)

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং ওঁ নমঃ নারায়ণায় ওঁ নমঃ নারায়ণায়

পরম গুরুর মহোৎসব

দিবারাধনা

১৩৫২ X ১৩২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।
৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬১।
৬২।৬৩।৬৪।৬৫।। (হিজিবিজি ইংরাজীর ন্যায়)

জমা	খরচ
১	৩১১২৮৯৮৭৯৮৭

(ইংরাজী হিজিবিজি)

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম

গোবিন্দ পরিপূর্ণতম
একাই অনন্তকোটী ব্যাপক
সর্ব্ব শক্তিমান সর্বাধারাতে
নমো নমঃ ॥ (ইংরাজীতে হিজিবিজি)

প্রাণগোবিন্দের লেখাগুলি পড়িলে তাঁহার দর্শনজগতের অসীমতা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলো পাই মাত্র। তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত কিছু পত্র পাঠ করিলে তাঁহার জগৎ সম্বন্ধে আমরা আভাষ পাই। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৬ খ্রীঃ ঘোষ সাহেবকে লেখা চিঠি আমরা আন্না মার নিকট হইতে উদ্ধার করি। নিম্নে উহার উদ্ধৃতি করিলাম—

৺৭শ্রীশ্রীহরি স্মরণং

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

পরম শুভাশীর্ব্বাদ ঘোষ সাহেব তোমাদের সকল প্রকার শুভ খবর দিও এখান খবর সব মঙ্গল সেখানের প্রসাদ (ইংরাজী হিজিবিজি)

ঘোষ সাহেব এণ্ড কোম্পানী তোমার শ্রীবলদেব চিঠি পাইলাম ও সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া জানাইতেছি শ্রীকৃষ্ণ পরম পদবী লাভ করিয়া পরম পূণ্য শ্লোক শ্রীনিত্যবৃন্দাবনে গীয়াছে তাই আমার মত হতভাগ্যের আর কি কথা মতুরা ও বৃন্দাবন জিবন ও জীবনধারণ পরীপূর্ণতর জীব ও ঈশ্বর জড় ও চৈতন্য একভাবে বর্ত্তমান নিশিকান্ত চিঠিতে পূর্ণ সর্ববিশয় জিজ্ঞাষা পাইলাম পরীপূর্ণ কবে হইবে আমার চিন্তার জাগরণ ও কারণ কর্মই তাহার উপাধী নাম ও নামীর অনন্য কারণ।

তোমার

প্রাণগোবীন্দ

তাঁহার এই চিঠির সহিত এক তেলেগু ভক্তের ইংরাজীতে চিঠি লেখা ছিল। উহা উঠাইয়া দিলাম—

Dear Sirs,

Baba arrived safely to Bizianagar on 21st March 46. He is residing in the house of Dr. G. Rama Iyenger (Retd. Medical Officer). Babaji started to Tirupati on 27th of March by Mail and was met by his disciple Narasimha Rao, nephew of Rao Baba (T.X.R.) (Santragachi). He visited the holy Tirupati and safely returned back to Bizianagar with Aravind Baba by 31st Calcutta Mail. Mr. Narasimha Rao met Baba at Samalkot. By the next Mail he took his family and arrived Bizianagar. We spent most of his time in the humble and spiritual presence of Babaji.

Now Baba is residing here. Baba is performing the "Annapurna Pujas" here. As I was ordered by Baba to express his opinions, I am writing this letter. All are safe here and Baba wishes to know

the welfare of you all early. Baba's blessings to you and your family.

Yours sincerely,

Bizianagar Y Sree Rama Subramanyam
4. 4. 46. 4. 4. 46.

ইহার পর পৃষ্ঠায় আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত পত্র ক্রমশঃ চলিতে লাগিল——

"সমান ভাব ভাষায় কোন রকম পূর্ণীমায় আমরা এখানেও যেমন সেখানেও তেমন হইল সার সংগ্রহ ধূমকেতু সম দম জ্ঞান গম্য পদার্থ তৎসাম্যভাব ও ভাষয় প্রকট সত্যকার মানুষ কে একাই আমী ও তুমি একাধীপত্যতা প্রতিপন্ন স্বভাব একনিত্ব বস্তুতে পরমানন্দ লাভ করীয়া জায় না হে মহান উদার স্বভাব আনন্দময় প্রভু তুমি ও আমি এক সাধুবাবার সমান আনন্দে থাকীবেই অন্যায় ন্যায় করীয়া সর্বতোভাবে মহাভাব পূর্ণ করীল হে আনন্দময় বিরাট ও স্বরাটপূর্ণ সাক্ষাৎ মদনমোহন আনন্দময় পুরুষ প্রকারভেদ করীল কেন আমার সমবায় সম্বন্ধ পদার্থ বিজ্ঞান সমন্বয় বীভূতী-পতীর সমাধীকরণ অনন্তময় যথার্থ গোবীন্দ বনমালি হইল ভাই ও বোন সমাধীগত পুরুষ ও প্রকৃতির পর অপরা বিদ্যায় শাস্তিবিধান নিজেও পরে আপরীমিত বিশক্তিময় সাধারণ অসাধারণ মানুষ কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না এবং পার না এক সাধ্যবস্তুর অসাধ্যসাধন পূর্ণতম মা আনন্দময়িকে পূর্ণতম করীতে পূর্ণতর পূর্ণতমভাব ও মহাভাব চিৎ ও অচিৎস্বরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানতর পরমানন্দ ধাম জলধী জলশূন্য জ্ঞান হইতে পারে না এক নিত্যানন্দ সাধ্যময় সমীরীধন মানুষ একক একটী পর একটী স্বগৃহ করে সাধুর সমান সহবাস নাই কোন কালে গান ও গম্য পদার্থবিৎ এক মরম নিধান সত্যকার ধারণা আচার্য্যময় স্বরূপ সমাধী।

মা আমার আশিশ নিও।"

"সাধারণ অসাধারণ মানুষ কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না"—যিনি অবাঙ্‌মানসগোচর, যিনি অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যয়, যিনি অজর, অমর, অক্ষর, "যিনি প্রকৃতির পরপারে রন," যিনি অপৌরুষেয়, অনুচ্ছিষ্ট তাঁহাকে বোঝার ক্ষমতা নিবীর্য্য অন্নকোষময় মানুষের ক্ষমতা কোথায় যদি তিনি এসে স্বেচ্ছায় না ধরা দেন তাঁহার কারণে। তাই ঠাকুর বলিতেন, "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।"

তাঁহার লেখার নিজস্বতা বজায় রাখিবার জন্য ব্যাকরণগত অশুদ্ধি ঠিক করি নাই। যেমন পাইয়াছি ঐরূপই রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উচ্চ-নীচে সমদৃষ্টি ভক্তদের জীবনে আদর্শ হইয়া হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকে সদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন যদি তাঁহাদের ব্যবহারে ও আচারে কোন ত্রুটি থাকিয়া যায়। কারুর হুকুম ছিল না—আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যান। সে ভিখারীই হউক আর রাজাই হউক। সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহার সমভাব আমরা ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ পরিতোষ, আশ্রমের পুকুরে যে মাটি কাটিতেছে, ঘাটে যে বাসন মাজিতেছে, চারিধারে যে ঝাড়ু লাগাইতেছে আর যে পায়খানার মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে সেও মায়েরই পূজা করিতেছে। তুমি মনে করিও না যে তুমি ঠাকুর ঘরে পূজা করিতেছ বলিয়া তুমিই একমাত্র পূজা করিতেছ।" কতকগুলি সাঁওতালকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐযে পুকুর পাড়ে যারা মাটি কাটিতেছে তাহারাও তোমারই মত মায়ের পূজা করিতেছে।"

শ্রীরামগোবিন্দের অনন্ত ভাব বুঝিবার সাধ্য কি করে মানুষে সম্ভব? তারিখটি ১২ই অক্টোবর ১৯৫১। প্রাণগোবিন্দ সকাল হইতেই সকলকে খুব ধমকাইতেছেন, খুব রাগ-রাগ ভাব, উচ্চৈস্বরে সকলকে "এইটি কর, ঐটি কর" বলিতেছেন। আমরাও বরাবর

লক্ষ্য করিয়াছি আচার্য্যদেব যখনই এইভাব দেখান তখনই বুঝি আমাদের কিছু increment হইবে বা তিনি কিছু লীলা প্রকট করিবেন। উহা ওনার একপ্রকার সমাধির অবস্থা। তাঁহার সঙ্গে ঘর করিতে করিতে আমাদের কতকগুলি অভিজ্ঞতা বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। দুইদিন বাদে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। চারিধারে বনমালা দিয়া সাজানো হইয়াছে। পূজা, আরতি, প্রসাদ বিতরণ, প্রসাদ ভক্ষণ সবই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত চলিল। সন্ধ্যাও গড়াইয়া রাত্রে পৌছাইল। সকল বহিরাগত শিষ্যভক্তগণ যে যাহার স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। আমরাও শুইবার ব্যবস্থা করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

গভীর নিশুতি রাত্রে হঠাৎ শুনিলাম রান্নাঘরে ঢাকনা খোলার বা টিনের কৌটা নাড়িবার আওয়াজ। মশারী হইতে বাহির না হইয়া আমি (তুলসী) বীরাসনে বসিয়া কুঁজা হইয়া দেখিতে লাগিলাম শ্রীরামগোবিন্দ রান্নাঘরে টিনের কৌটাগুলি নাড়ানাড়ি করিতেছেন। ঠাকুর আমার একটি কৌটা খুলিয়া তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া কি পরীক্ষা করিলেন এবং হাতের মুঠায় করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং আসিয়া গণেশের সামনে বেদীর উপর উহা ছড়াইয়া দিলেন। বুঝিলাম ঐগুলি চিড়া। তারপর শ্রীগোবিন্দ মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন। সমস্ত নাটমন্দিরে গড়াগড়ি খাইলেন। গড়াইতে গড়াইতে যেইখানে ত্রিশূলটি প্রোথিত আছে উহার গোড়ায় গিয়া প্রথমে পদ্মাসনে বসিলে। ধ্যানমগ্ন মহাদেব যেন। তারপর শবাসনে শুইয়া পড়িলেন, যেন ত্রিশূলের পাশে শিব। ত্রিশূলের কাছে দুইটি বাছুর বাঁধা ছিল। উহাদের পাশে বসিয়া কিছুক্ষণ আদরের মত করিলেন। তারপর বীরাসন হইয়া বসিলেন। পুনরায় গড়াইতে গড়াইতে বেদীর নিকট যাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বেদীর উপর উঠিয়া আসনে গিয়া বসিলেন। এখানে ওখানে যা পুষ্প পড়িয়াছিল তাহা উঠাইয়া নিজ মস্তকোপরি

রাখিলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর গোপাল যেমন হাঁটুর উপর ভর দিয়া হাঁটেন ঐরূপ ভাবে হামাগুড়ি দিয়া বেদীর উপর ছড়ানো চিড়াগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিলেন। আহা! সে যে কি অপরূপ দৃশ্য হইল সেই নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে তাহা লেখনীতে ধরিয়া রাখা যায় না। রাত্রি দুইটার সময় দ্বাপরেশ্বর গোবিন্দ আবির্ভূত হইয়াছেন কেদার-কাননে শ্রীগোবিন্দ আশ্রমে। অন্ধকার রাত্রে আলো-আঁধারের সৃষ্টি করিয়াছে প্রজ্বলিত প্রদীপ। সেই আলোতে বিগ্রহাদির সম্মুখে গুরুনারায়ণ স্বয়ং গোবিন্দ আবির্ভূত। রামগোবিন্দ, গীতগোবিন্দ, গোবিন্দ। ঠাকুরকে তাঁহার অতি প্রিয়জনেরা "গোবিন্দ" বলিয়াই ডাকিতেন। ঠাকুর সেই নাম বড় ভালো-বাসিতেন। যদি কেহ একবার "গোবিন্দ" বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছেন তিনি যেন তখনি তাঁহার কতকালের আপনজন হইয়া যাইতেন, তাহার কতকালের যেন ঘরের ছেলে হইয়া যাইতেন। তাহার সকল দুখের বোঝা নিজের মাথায় উঠাইয়া লইতেন।

হামাগুড়ি দিয়া গোবিন্দ এমনই নিঃশব্দে তাঁহার গোপাল লীলা প্রকট করিলেন যে তাহা কেহ জানিল না। সনাতনধর্ম-রক্ষাকর্ত্তা শ্রীসীতুনন্দন গোবিন্দ প্রকট করিলেন তাঁহার স্ব-প্রকৃতি, বিভূতি ও ভাব।

দুইদিন বাদে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন তিনি তাঁহার প্রিয়ভক্ত তুলসী ও পরিতোষকে সকালে ভিক্ষায় বাহির হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের ডাকিয়া তিনি স্বহস্তে সগুলিখিত একটি কবিতা তাঁহাদের হাতে দিলেন। নিম্নে কবিতাটি প্রকাশ করিলাম—

মহালক্ষ্মী আরাধনে

ওরে ভিখারী রাজায় তফাৎ অনেক
মহালক্ষ্মী আরাধনে,
ভিখারী আসন,

পরিপূর্ণতম গোবিন্দ দরশনে।
রাজা প্রজার ঘরে ঘরে
ভিক্ষা করে কত প্রকারে।
প্রেমের ভিক্ষা পায়না সবাই মিলে
হাহাকার করে জনে জনে॥
ভিখারীর মত ভিখারী যারা
তারাই পারের তরী
ত্বরিতে তরীতে চলি
কত পাপীতাপী সন্তাপী জনে।
কুচিন্তাতে সুচিন্তাতে তফাৎ যতরে
রাজাতে আর ভিখারিতে ততই তফাৎরে।
শান্তিময়ীর শান্তিধামে পরমানন্দে নৃত্যলীলা
করনা তোরা কূর্মাসনে
বড়ই ছোট, ছোট বড়
বড় ছোটর ভেদ চলে যায়।
লুক্কায়িত অহঙ্কারে অন্তরে গোপনে
গীতগোবিন্দ পায়না অন্ত, শান্ত তাই, দাস্য তাই সখাভাবে
তাই ধরেছি তোদের বাৎসল্যরসে গোপনে
মহালক্ষ্মী প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ হবে,
দেখবি তোরা নয়নে॥

শ্রীরামগোবিন্দ বলিতেন "জয় রাধে গোবিন্দ পেট ভরলেই আনন্দ" এবং হো হো করিয়া মধুর হাসি হাসিতেন। সেই হাসির ছটায় অতি বিষণ্ণহৃদয়ও পুলকিত হইয়া উঠিত। হৃদয়ভার মুহূর্ত্তে লাঘব হইয়া যাইত। সকলে আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকিতেন। কখনও কখনও বলিতেন "That is the question" সেইসঙ্গে প্রাণ মাতানো হা হা হাসি। এবং বলিতেন, "That is the point of relieving" ও সেই সঙ্গে হাসি। তিনি

কোথাও কিছু গোলমাল হইলে বলিতেন "Consult করে insult করেছে" এবং হাসিতেন। ওঁনার খাতায় যা ইংরাজী লিখিতেন সে লেখা দেখিলে অতিবড় পণ্ডিতও তলাইয়া যাইবে। উনি যা আশ্রমের দৈনন্দিন হিসাব রাখিতেন তাহা অতিবড় ধুরন্ধর অডিটর জেনারেলকেও হারাইয়া দিবে। কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। বিশ্বাস রাখি রসিক ও ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণ উহা পাঠ করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিবেন ও তত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন।

লীলাময় হরি যিনি মহাশূন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার কাছে মহাশূন্য বিচরণকারী মানুষ সে নিজেকে যতই বৃহৎ ভাবুক প্রকৃতপক্ষে ক্রীড়নক ছাড়া কিছুই নহে। মানুষের কাছে শত, সহস্র, লক্ষ, অযুত, নিযুত, কোটীর পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু সর্বব্যাপ্ত অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম্ অনন্তবাহুশশীসূর্য্যনেত্রম্ এর কাছে সংখ্যা গোষ্পদে বিশ্বকে ধারণ করিবারই মত। যিনি যোগাতীত, গুণাতীত তিনিই বিয়োগাতীত। তিনি অজর, অমর, অক্ষর। তাঁহার নিকট টাকা, পাউণ্ড, ডলার কি? যাঁহার জন্য ভূত-প্রেত যক্ষ, গন্ধর্ব্বগণ স্বর্ণমুদ্রা বহন করিতে সতত উদগ্রীব, যাঁহার অধীনে অষ্ট সিদ্ধি মাথা নোয়াইয়া স্থির হইয়া বসিয়া তাঁহার পূজা, কীর্ত্তন করিতেছে তাঁহার বর্ণনা এই ক্ষুদ্র সীমিত পুস্তকে কতটুকু সম্ভব?

যিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া সতত আমাদের অতীতে বিরাজ করিতেন তিনি যাহাই করিবেন তাহা যে লোকাতীত হইবে, অলৌকিক হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একদিন শ্রীরামগোবিন্দ বলিলেন, "ভোগের বড় বড় পিতলের থালা তিনটি আমার সামনে লইয়া আইস।" তুলসীদাস ভোগের বড় বড় তিনটি থালা পুকুরে ধুইয়া তাঁহার সামনে রাখিলেন। তাহার পর আদেশ দিলেন, "রান্নাঘরে যাহা যাহা ভোগ রান্না হইয়াছে সব এই থালা তিনটিতে সাজাইয়া দাও।" তুলসীদাস ও আমি রান্নাঘর হইতে সত্তপক্ক অন্ন, ডাল, ভাজা, তরকারী, পরমান্ন সব থালা তিনটিতে

সাজাইয়া দিলাম। ঠাকুর তখন আশ্রমে সমবেত সব ভক্তদের, মায়েদের ও বালক-বালিকাদের ও তাঁহাদের পিতাদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা আয়, আসিয়া মায়েরা এই থালায়, বাবারা এই থালায় আর বালকেরা এই থালায় সব একসাথে খাইতে বস—একসাথে প্রসাদ খা।" সকলেরই একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। ঠাকুর একি আদেশ করিতেছেন! পরম বৈষ্ণব ও অতি নিষ্ঠা ও আচারসম্পন্ন গদীবেড়োর আচারী বংশের সাধক একি আদেশ দিতেছেন! লজ্জা, মান ও ভয় তিনই সমবেত সকলকেই পাইয়া বসিল। পরম রসিক ও দয়াল ঠাকুর তখন বলিলেন যে এক সাথে বসিয়া যাহারাই খাইবে তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া টাকা দিবেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল হুড়মুড় করিয়া থালার চারিপাশে বসিয়া পড়িল। ঐ দেখিয়া বালক-বালিকাদের মায়েরা দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। তথাপি মায়েদের স্বামীদের দিকে মায়েরা তাকাইতেছিল। তাঁহাদের মনের ভাব ছিল তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামীর মতামত পাইলেই হয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের কি বুঝিতে বাকি থাকে? উনি তখনই বলিলেন, "যে যে মায়েরা একসাথে খাইতে বসিবে তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া লাল পেড়ে মায়ের প্রসাদী কাপড় দিব।" ব্যস্! মায়েরা গোবিন্দের এই দয়াল আহ্বান আর কি ছাড়িতে পারেন? তখনই তাঁহারা হাসিতে হাসিতে সকলে একসাথে তাঁহাদের থালার চারিপাশে বসিয়া পড়িলেন। একদিকে বালক-বালিকারা, অপরদিকে স্ত্রীগণ একসাথে প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে দেখিয়া বাবারা অর্থাৎ শিষ্যগণের আপত্তির বাঁধ ভাঙিয়া গেল। তাঁহারা তখন হাসিতে হাসিতে হৈ হৈ করিতে করিতে একই থালায় সকলে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীসাধু-বাবার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুজগন্নাথ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন আর বলিলেন, "আজ হইতে এই ধাম জগন্নাথ-ধাম হইয়া গেল, শ্রীক্ষেত্র হইয়া গেল, আশ্রমে আজ হইতে যাহাই

রান্না হইবে সঙ্গে সঙ্গে উহা ভোগ হইয়া যাইবে। ইহার অন্ন আজ হইতে শ্রীক্ষেত্রের অন্ন হইয়া গেল।" গুরুনারায়ণের অপূর্বলীলা কথনে ও শ্রবণে যে অপার আনন্দ এমনটি বুঝি আর কিছুতেই নাই। আমাদের লেখনীর মধ্যে যাহা প্রকাশ করিতেছি তাহা বর্ণনার লক্ষভাগের একভাগ হইবে কিনা সন্দেহ। কতই বাদ পড়িয়া যাইতেছে।

১৯৪৭।১৯৪৮ হইবে। অন্নকূট উৎসব। যে অন্নকূট ১৯৩৭ সালে আশ্রমপ্রাঙ্গণে শুরু হইয়াছিল তিন ভক্তের বাড়ীর অন্ন ভিক্ষালব্ধ অন্নতে, যে অন্নকূটে আমাদের গুরুগোবিন্দ গিরিগোবর্দ্ধনধারী রামগোবিন্দ তাঁহার অনশনভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই অন্নকূট দশ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে বিশাল অন্নকূটের রূপ ধারণ করে। ২৭ মণ চাউলের অন্নকূটে বহু দূর দেশ হইতে আগত ভক্তবৃন্দ যোগদান করিয়া ধন্য হইতেন। "জয়রাধে গোবিন্দ পেট ভরলেই আনন্দ। দম্‌সে খাও আর দম্‌সে কীর্ত্তন কর" এই তাঁহার শ্রীমুখের কথা ছিল।

আশ্রমের চারিধার সুসজ্জিত করা হইয়াছে বনমালায় ও গাঁদা ফুলে। দেবদারু গাছের গেট হইয়াছে। চারিদিকে এক অতি অনির্ব্বচনীয় শ্রী ও সৌরভ মাতিয়া আছে। পর্ণকুটীরটি যেন এক অপরূপস্থলে রূপান্তরিত হইয়াছে। কোলে বাজার হইতে লরী করিয়া বাজার আনা হইয়াছে। সেই আনাজে অন্নকূটের আগের দিন আশ্রমের নাটমন্দির ভরিয়া গিয়াছে। আলু, কাঁচাকলা, ফুলকপি, কড়াইশুটি, বাঁধাকপি, কুমড়া, বরবটি, সীম, পালংশাক, কাটোয়াডাঁটা, কল্মীশাক, লাউশাক, কুমড়াশাক, লাউ, কুমড়া, ছাঁচীকুমড়া, নারিকেল, তেঁতুল, রাঙা-আলু, বেগুন, কাঁচালঙ্কা, অসময়ের এঁচোড়, পেঁপে, কচু, মূলা, পাতিলেবু, ঢেঁড়স, ঝিঙা, একটি ক্ষুদ্র হাটের রূপ দিতেছে। মায়েরা প্রায় ৫০জন হইবে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বিরামহীনভাবে কুট্‌না কুটিয়া গিয়াছেন।

অন্নকূটের দিন সকাল হইতেই ভক্তের সমাগম শুরু হইয়াছে। এক মানুষ সমান উচ্চ অন্নের পাহাড় উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্ত্তন করিতেছেন। বেদীতে সারি সারি বিরাট গামলায় রকমারি তরকারী সাজানো হইয়াছে। বিরাট হাঁড়িতে—ছোলার ডাল, মুগের ডাল, বিউলি ডাল, অড়হর ডাল। আলুর দম, আলু-কুমড়ার ছক্কা, পেঁপের ডালনা, প্রসিদ্ধ চচ্চরী, ফুলকপির ডালনা, বাঁধাকপির তরকারী, ছানার ডালনা, ঝিঙার তরকারী, শাক ঘণ্ট, বারো রকমের ভাজা, সীম-পালঙের তরকারী, এঁচোড়ের ডালনা, ঘি-ভাত, পরমান্ন, বোঁদে, চাটনি, সন্দেশ, রসগোল্লা, দই, ইত্যাদি সব বেদীতে উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য থরে থরে সাজানো হইয়াছে। বেলা দুইটার সময় ঠাকুরের প্রিয় ভক্তগণ আরতি সারিলেন। তাহার পর সেই ব্যঞ্জনাদি সহ অন্ন আবালবৃদ্ধবণিতা আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে বিতরণ করা হইবে। প্রায় হাজার পাঁচেক লোক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ—কেহই যেন অভুক্ত হইয়া না চলিয়া যান। কখন যে মহাদেব আসিয়া অন্ন গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাইবেন এই ভয়। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় "অন্ন দাও মা, অন্নদা" এই গানের কলিটি গাহিতেন। ঠাকুরও তাই কীর্ত্তন করিতে করিতে কখন উঠিয়া পড়িয়াছেন সরেজমিনে দেখিবার জন্য কেমন পরিবেশন হইতেছে। হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ এই অন্নকূট মহোৎসবে যোগদান করিতে দূর-দূরান্ত দেশ হইতে আশ্রমে সমাগত। সকলে মা অন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রীসাধুবাবার জয়ধ্বনি দিতেছেন। ভক্তগণ সারিবদ্ধভাবে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন। এক এক খেপে প্রায় সাত আট শত ভক্ত খাইতে বসিয়াছেন। খাইতে খাইতে ঠাকুরের দর্শন পাইয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তদারক করিতে করিতে চলিয়াছেন। কেহই বুঝিতে পারিবে না কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে গোবিন্দ চলিয়াছেন কিনা।

চলিতে চলিতে পাতার সারি সামনের শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর বাড়ির দালান ও ছাদ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটিতে হাঁটিতে কখন শিবুদার ছাদে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। সঙ্গে অদ্বৈতদা ও কতিপয় ভক্ত চলিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর একি করিলেন! একটি পাগলের পাতা হইতে উচ্ছিষ্ট ডাল-তরকারীমাখা অন্ন মুখে উঠাইতেছেন! ঠাকুর বলিলেন, "মহাপ্রসাদ"। অমনি পার্শ্বে দণ্ডায়মান অদ্বৈতদা ছোঁ মারিয়া ঠাকুরের হাত হইতে অন্ন কাড়িয়া সকলের মুখের ভিতর হাত ঢুকাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "মহাপ্রসাদ, মহাপ্রসাদ।" চারিদিকে আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল। সকলে যখন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল "তখন লোকটি কোথায় গেল, কোথায় গেল" বলিতে লাগিল কিন্তু তাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড হৈচৈ ও ভীড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে কি অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামগোবিন্দ কতরূপেই লীলা করিয়া গিয়াছেন। চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন।

১৯৪৩ সালের অন্নকূটের সময় এক ঘটনা ঘটে। ঐ বৎসর বীভৎস মন্বন্তর বাংলার বুক চিরিয়া সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীশম্ভু প্রসাদ ঘোষালের লেখা হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রতি বছর কালীপূজার পরদিন আশ্রমে অন্নকূট হইত এবং ৪০০০।৫০০০ ভক্ত ভোগ গ্রহণ করিত। এক বৎসর চালের দারুণ সংকট। ১৯৪৩ হইবে। চাল ভগবান ভক্তের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিতেন। অন্নকূট হইয়া যাইবার পরদিন বাকসাড়া ফাঁড়ির সাব-ইন্‌স্পেক্টর আশ্রমে আসিয়া সাধুবাবাকে খুঁজিলেন এবং সাধু-বাবাকে না পাইয়া আমায় কড়াস্বরে বলিলেন, "৫০০০ লোক আশ্রমে খেয়েছে। এত চাল কোথা থেকে এল আমি জানতে চাই।" আমি বলিলাম, "আমরা ভগবানের পূজা করিতেছি। তিনিই ভক্তদের দিয়া চালের যোগান দিয়াছেন।" সাব-ইন্‌স্পেক্টরটি

বলিলেন, "বেশ, আমি শিক্ষা দিব।" আমিও বলিলাম, "শিক্ষা দিলেই শিক্ষা পাবেন। আমরা উভয়েই শিক্ষালাভ করিব—এত' আনন্দের কথা।" সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরটি চোখ রাঙাইয়া চলিয়া গেল। সাধুবাবা যখন আশ্রমে আসিলেন তখন তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম।

বৈকাল বেলা সাব-ইনস্‌পেক্টরটি আশ্রমে অসিয়া সামনে আমার সহিত দেখা হইতেই বলিলেন, "আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। সকালবেলা থানায় ফিরিয়া শুনিলাম যে আমার স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধপত্র দেওয়া সত্ত্বেও এখনো জ্ঞান ফেরে নাই। বাসার পাশের লোকেরা আমাকে আশ্রমে আসিয়া সাধুবাবাকে জানাইতে বলায় আমি আসিয়াছি। সকালের কথার জন্য আমাকে মাফ করুন।"

সাধুবাবাকে সব বলিলাম। তিনি বলিলেন, "শম্ভুদা যাও।" দারোগার সহিত তাঁহার বাসায় গেলাম। হাতে একটু গঙ্গাজল নিয়া "মা ব্রহ্মময়ী" বলে গায়ে দিতেই মা চোখ মেলিয়া চাহিলেন। ঐদিন হইতে সাব-ইনসপেক্টরটি ঠাকুরের খুব ভক্ত হইয়া উঠিল।"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর দেখা দেন ভক্তের ছোট্ট কুটীরে, গ্রহণ করেন তাহার প্রেমের তুলসী, চোখের জল, শ্রদ্ধা, ভক্তি—ভক্তের আকাঙ্ক্ষিতরূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে। ভক্তের অনন্তভাবের সহিত তিনি নিরন্তর যুক্ত। অনন্ত ভক্তের সহিত তিনি প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী প্রতি মুহূর্ত্তে লীলা করিয়া চলিয়াছেন—আধার অনুযায়ী আধেয় ধরা দিতেছেন। তাই স্বরাট, বিরাট রামগোবিন্দকে মুহূর্ত্তে মহূর্ত্তে আমরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে দেখিতে পাই। ভক্তের আকুল-ক্রন্দনে, আন্তরিক টানে তাহার বিপদে ও আর্ত্তির সময়ে তাহার

সম্মুখে স-শরীরে আবির্ভূত হইয়া পরমস্নেহে শ্রীচরণপরশদানে শীতল করিয়াছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ ছিলেন। তাঁহার চরণাশ্রিতগণ তাঁহাকে স্মরণ বা আকর্ষণ করিলেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটিত কেহ যদি তাঁহাকে আকর্ষণ করিত তিনি আন-চান করিতেন, অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং ভক্তের টানে অস্থানে অসময়ে গিয়া আবির্ভূত হইতেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংরাজির অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মস্তিষ্ক বিকৃতির পর তাঁহার চরণস্পর্শে নীরোগ হন এবং অল্পদিন রোগভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করেন। জনকরোড নিবাসী রায়বাহাদুর বিনোদবিহারী রায়, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিমলা প্রসাদ রায়, লৌহব্যবসায়ী ও বিশ্বরূপা'র স্বত্বাধিকারী শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার, শ্রীরাসবিহারী সরকার, বালিগঞ্জ ব্যাঙ্কের শ্রীনিমাই চরণ মৈত্র, রোল্যাণ্ড রো নিবাসী নেপালাধীশ পরিবারের ভক্ত বাহাদুর, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রভূষণ বক্সী, পার্ক ষ্ট্রীটের শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চক্রবর্ত্তী, আখড়ার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস, সাঁত্রাগাছির শ্রীমিহিরলাল ভট্টাচার্য্য, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, গণিতের অধ্যাপক শ্রীযামিনীরঞ্জন কর, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীচিন্ময় বাগচী (পরে গোবিন্দদাস), টালার শ্রীনিতাই বসু, শ্রীঅপূর্বলাল বসু, বলাই সিংহ 'লেনের শ্রীসুধাংশু ঘোষ, বরাহনগরের বোসমা, কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষ্ঠিয়ার শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, দমদমের শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্যামবাজারের শ্রীজয়নারায়ণ সুর, বালীর শ্রীনিত্যানন্দ ভাদুড়ি, উত্তরপাড়ার শ্রীঅমৃতলাল মুন্সী, বালীর শ্রীবলাই চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিজয়কুমার ঘোষাল, উত্তরপাড়ার কালীবাড়ী মজুমদার পরিবার ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, কাশীতে শ্রীগৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজয়নগরে শ্রীরামলু বাবা, শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি,

অরুন্ধতী আম্মা, শান্তা আম্মা, ডাঃ জি, রামা আয়েঙ্গার, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে শ্রীমতী কমলা ভাদুড়ি, শ্রীজয়গোপাল ও শ্রীসত্যগোপাল ভাদুড়ি, মনোহরপুকুর রোডের শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাকুসাড়ার শ্রীদুলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ পাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, খাঁদুদা, নলিনীমা, রাধামা, চৌধুরীপাড়ার সান্যাল মশাই ও বিন্দুমা ও শ্রীযতন চৌধুরী ও শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী, মহীশূর রোড নিবাসী শ্রীহিরন্ময় বাগচী, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বাগচী, লাভলক্ প্লেসের শ্রীচুণিলাল সান্যাল, ফার্ণরোডের শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ঘোষ, মজঃফরপুরের শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী প্রভৃতি নামের তালিকা এক লক্ষেরও অধিক হইয়া যাইবে। কখন কাহার কি প্রয়োজন ঠাকুর ঠিক মুহূর্ত্তে ঠিক স্থানে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের দুঃখের লাঘব ঘটাইতেন ও তাহাকে নামপ্রেমে ভাসাইয়া ফেলিতেন।

প্রাণের ঠাকুর মানবসমাজে করুণাময়রূপে আবির্ভাবের সময় হইতে একটি রীতি প্রচলন করিয়াছিলেন। যে কোন রোগী আসিলে আগে উহার নাম, ধাম, গোত্র এবং রোগ লিখিয়া রাখা হইত। সাধারণতঃ অরুণদা এই কাজটি করিতেন এবং এক একটি খাতায় দশ বিশ হাজার নাম লিপিবদ্ধ আছে। তাহার পর চরণ স্পর্শ করিয়া রোগমুক্ত করিয়া অষ্টধাতু নির্মিত শঙ্খ চক্র গব্যঘৃতের প্রদীপের শিখায় পোড়াইয়া রোগীর যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ বাহুমূলে ছাপ লাগাইয়া দিতে হইত এবং তিন দিবস রোগীকে সাত্ত্বিক আহার ও ব্যবহারে থাকিতে নির্দ্দেশ দিতেন। এইবার যে নবরূপে গোবিন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই লীলার তালিকা ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যা ও নাম লিখিতে যাইলে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উহা কুলাইবে না এবং আমরাও বা কেমন করিয়া তাঁহার অসংখ্য লীলা ও ভক্তবৃন্দের পরিচয় পাইব?

আমার প্রাণের ঠাকুর যেখানেই থাকিতেন উহাই হইয়া উঠিত

বৃন্দাবন এবং তিনিও আশ্রমের সহিত সবসময় যোগ রাখিতেন। তিনি আশ্রমে না থাকিলেও তাঁহার উপস্থিতি আশ্রমবাসীগণ উপলব্ধি করিতে পারিত এবং তাঁহাকে গভীর রাত্রে দর্শন করিতেন। তাঁহার খড়মের আওয়াজ, তাঁহার আসন ব্যবহারের চিহ্ন তিনি রাখিয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম আশ্রমে আশ্রমবাসী ব্যতীত কাহারও রাত্রি যাপনের হুকুম ছিল না। আশ্রমে রাত্রিবাসের অভিপ্রায়ে পূর্বে কেহ আসিলে ঠাকুর তাহার অন্যত্র শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

প্রাণের ঠাকুর তাঁহার ভাব কবিতার ভাষায় প্রকাশ করিতেন। কখনও কখনও চিঠি কবিতাকারে লিখিয়া পাঠাইতেন, যেমন—

"মার কথা কইতে কে জানে,
তাই সবের মত শুয়ে আছে
মার চরণে শবাসনে।
দুজনা চলিল পথে
মার কথা কহিতে কহিতে
একজন ডাকে মা মা করে
মা মা বলে ডাকলে পরে
মাকি দূরে রহিতে পারে
অনুসন্ধান করে সে মাকে
সহস্রপুর আসনে
মার কথা কহিতে কে জানে।

১৯৫০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মোৎসবের সময় বারাণসীতে কাটাইয়াছিলেন। প্রাণগোবিন্দ উৎসবের পরে নিম্নলিখিত কবিতাটি পত্রাকারে লিখিয়া পাঠান—

কাশীধাম
৬ই মাঘ ১৩৫৬

তুলসী পরিতোষ ভক্তবৃন্দ যত
পাইয়াছি প্রেমলিপি তোমাদের আমি ঠিকমত

জনম উৎসবে যারা নাম সংকীর্ত্তনে
মুখরিত করিয়াছে কেদার 'কেদার-কাননে'
মাতিয়াছে, নাচিয়াছে প্রেমানন্দে যারা
আশীর্বাদ করি যেন ধন্য হয় তারা
শান্তিলভি প্রাণে।
ধন্য করে বসুন্ধরা হরিগুণ গানে॥
হেথা প্রবীন নবীন ধনী ও দীন
উৎসবে মাতিয়াছে নিতা তিনদিন।
ধন্য তারা, ধন্য আমি, তোমা সবা মাঝে
গুরুশিষ্য একাধারে প্রেমেই বিরাজে॥

উহার পর অন্য একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ 30।1।50
সোমবার
রাত্রি ৮টা

স্নেহের পরিতোষ,

তাহাতে এই কথা
দূরন্ত বীপিন মাঝে তোমাধনে হোয়ে হারা
প্রাণ কাঁদে নিরন্তর ম্লানমনে,
ধ্যানে জ্ঞেনে, ভাবি নিশিদিন
রাহু সাধে বাদ, গ্রাসে হৃদি চাঁদ
শশাঙ্ক ভ্রমে যথা মণিহারা ফণী
যেমন ত ধীরা॥
শয়ণে প্রণাম জ্ঞান
নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
আহার কর মনে কর
আহুতি শ্যামামারে।

বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক সংগীতাচার্য্য শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করিয়া ধ্রুপদ সুরে গান করেন। সালটি ১৩৫৭ অর্থাৎ ১৪।১।১৯৫১ তারিখে রবিবার।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ সাধুবাবা শ্রীচরণকমলেষু!
পরমানন্দ লুব্ধ-ভৃঙ্গ
শরীর চক্রে বিকাশরঙ্গ
অনঙ্গমোহন শ্রীপদসঙ্গ, নিত্য অভিসারী।
গুঞ্জন তব কীর্ত্তন গীতি, শাশ্বতমুখী আত্মপ্রণতি
নেত্র তোমার পৃথ্বিলগ্ন, দৃষ্টি ব্যোমচারী।
'কেদার-কানন' পাবনদেহী দেহাতিরিক্ত সুখ চাহি
সর্বত্যাগ মন্ত্রসাধক, মূর্ত্ত পরোপকারী।
ভবকল্লোল ব্যাকুল সাজে, শতেক শিষ্য ভক্তমাঝে
অর্ঘকমল পরাগলিপ্ত, অচপল চিত্তধারী
অন্তহীন জীবনে জাগো, দীন বেদনহারী।

বেড়ো হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নিম্নলিখিত পত্র পাঠান—

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ রাত্রি ৯টা

দোতালা

শ্রীমান রাও সাহেবের বাড়িতে কবে বিয়ে তাহাও জানিনা
তোমাদের সেখানে যে কি হচ্ছে তাহাও জানি না
কবে যে বিয়ে হোলো তাও জানি না
তোমাদের সঙ্গে যে কি কথা হইয়াছে তাহাও জানি না।
তোমরা যে কোন জায়গায় আছ তাও জানি না।
এখানে খুব গরম ১১১ ডিগ্রি গরম রবির মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত
আমি যে এখন কোথায় আছি তাও জানি না।
কি যে করিব তাও জানি না।

তোমরা কোথায় থাক বা কিভাবে থাক তাও জানি না।

তোমরা যেখানে যেভাবেই থাক আমার স্নেহ আশীষ জানিবে।

ইতি

তোমাদের

উপদেশ

ফুল নিজের স্বভাবেই ফোটে।

ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধে যেমন মানুষ ও মৌমাছি যেমন আকৃষ্ট হয় ঠিক তেমনি। ঋতুও স্বভাবে আছে। ছেলেও তেমনি ৫ বৎসরের পর জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে কে তাহাকে বেশী ভালোবাসে ঠিক তেমনি (স্বৎ) তাহার স্বভাবেই প্রকাশ দেয় তাহাকে আর আলাদা প্রমাণ দেবার দরকার নাই। তবে মমতাবশত আমরা বলি প্রমাণ দিতে। ছোট ছেলেদের কাছ হইতে আমি অনেক উপদেশ পাইয়া থাকি। টাকা দিয়া কিংবা কর্ম দেখিয়া মানুষের চরিত্র কিছুটা বোঝা যায়। আশ্রমে শুধু সৎলোক আসে না অসৎ লোকও আসে। শুধু—

বেড়ো হইতে শ্রীশ্রীদাদার লিখিত পত্র—

14/8/51 মঙ্গলবার

৺শ্রীশ্রীহরিস্মরণং ওঁ নমঃ নারায়ণায় শ্রীমৎ বেদমার্গ প্রতীষ্ঠাপনাচার্য্য ও উভয় বেদান্ত প্রকাষক প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত জননী মা ইন্দিরা সাধুদেবী দেবী সাধুর ক্রীপা প্রার্থীর সমীপে পরীপূর্ণতরা পূর্ণতম লক্ষ্মীনারায়ণায় ঈশ্বর চেতন অচেতন জড় ও চৈতন্যময় জ্ঞানগম্য পরমার্থজন্য একতমাই বোধের সসিম ও অসিম জন্য মা ওঁ মা বাবার সমীপে আচার অনাচার সত্য মিথ্যাই কালে শান্তিতে অবস্থান করীতে অক্ষম জন্য মনের পূরণ ও সাধ্যবস্তুর অনুসন্ধানকে বিবেকদ্বারাই ধৌতমান সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করীতে পারে এমন কোন বোধ নাই তাই মহামায়ার

মহারণীও মহালক্ষ্মীর অস্থীরতাই কালও কাল ভয়কে পূর্ণ করীতে চলিল। তাই আমি তুমি তুমি ও আমি ঐ সদসঙ্গ বীবেক ত্যাগ বৈরাগ্যময়।

তোমাদের আসিতে বলিলাম কেহ আসিলে না কেন উত্ত দিও ও সম্মত ক্রমবিকাশ করিতে পারিয়াই মহতী শক্তীর ব্যত্যয় করার ভার এক তোমারা তোদের সমাধি যুক্ত মনের অবস্থায় পূর্ণতা চাই প্রমাণ দিতে হবে প্রয়োগ করিতে হবেই হবে। উত্তম ও মধ্যমা বস্তুর তারতম একত্র একটীর প্রত্যক্ষকরণ সাধ্য সাধন প্রমাণ ও প্রয়োগ করিতে হবে। ঐহীক ও পারত্রীক পূর্ণ কর্ত্তাই গোবিন্দ।

ঠাকুর ১৯৪২ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে আসামে গৌরীপুরে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার গৌরীপুর প্রাসাদে ছিলেন। মে মাসে বিজয়নগর, জুলাই মাসে অগ্রদ্বীপ, বর্দ্ধমানে ছিলেন। ডিসেম্বরে কাশীতে।

১৯৪৩ সালে জুলাই মাসে মজঃফরপুর, পাটনা, আগষ্টে বারাণসী এবং ডিসেম্বরে মধুপুরে ছিলেন।

১৯৪৪ সালে মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাস বিজয়নগর, কোরকুণ্ডা, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, শ্রীরঙ্গম, কটক, পুরীতে ও ডিসেম্বরে পাটনায় ছিলেন।

১৯৪৫ সালে জানুয়ারীতে কাশী, জম্মোৎসবের সময় মজঃফরপুর, ও মে মাসে পুরুলিয়া ও বেড়োতে কাটাইয়াছিলেন।

১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে বিজয়নগর, তিরুপতি ও ডিসেম্বরে পাটনা ও মজঃফরপুরে ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ফেব্রুয়ারী পাটনা, কুষ্টিয়া, মার্চ মাসে বিজয়নগরে কাটাইয়াছিলেন।

১৯৪৮ সালে জানুয়ারী মাসে কুষ্টিয়াতে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ত্যাগী শিষ্য ভক্তদের ভিতর একমাত্র শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তীকে (দাদু) সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছিলেন। দাদুকে সন্ন্যাস প্রদান করিবার সময় বলিলেন, "তাইত' বিবাহ না হইলেত' সন্ন্যাস হয় না। তা হলে কি করা যায়? আচ্ছা, জগজ্জননী মায়ের সঙ্গে উহার বিবাহ দিয়া সন্ন্যাস দান করিব।" গুরুকৃপার নিদর্শন আশ্রমবাসীগণ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন।

১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে দাদুর জন্য তৈয়ারী করা চাঁপাতলায় একটি হোগলার ছাউনিতে দাদু খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দাদুর ছোট ভাইঝি হইলেন আশ্রমের ছোট মা যিনি আজ উনিশ কুড়ি বৎসর আশ্রমে ঠাকুরের ভোগ রাঁধিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাকে ঠাকুর আনাইয়া দাদুর সেবায় নিযুক্ত করিলেন। উহার কিছুদিন পরে দাদু তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে একজোড়া কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন। একটি নীল ও একটি কালো।

দাদুর দেহরক্ষা করিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার চরণাশ্রিতকে ভক্তবৃন্দের সম্মুখে বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া তাঁহার কৃপালুরূপের পরিচয় দিলেন। ঠাকুর হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন দাদুর সময় হইয়া গিয়াছে। দাদুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "দাদু, তুমি সাধারণের মত দেহ রাখিবে কেন? আমি আছি, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ কর।" মাঝে মাঝে দাদুর চোখে চোখ স্থাপনা করিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত হাতের তুড়ি লাগাইয়া প্রাণবায়ুকে উপরদিকে তুলিতে লাগিলেন। ইহাই হইল পরমাশক্তির খেলা। শক্তি চক্ষে দেখা যায়না, অনুভব করা যায় মাত্র। সে দৃশ্য সাধারণে কি বুঝিবে? গুরুকৃপা কাহাকে বলে দাদুর জীবনাবসানে তাহা আশ্রমে সমাগত সকলে প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি আবার বলিলেন, "আমি আছি, তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ কর।" এইরূপে বার কয় হুঙ্কার দিয়া বলিলে প্রিয়শিষ্য দাদুর চোখে চোখ রাখিয়া

নিজ শক্তির দ্বারা শিষ্যের ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করাইয়া তাঁহাকে স্ব-স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরের প্রথম যে কয়জন ত্যাগী ও আশ্রমবাসী ভক্তের আগমন হইয়াছিল দাদু, অরুণদা, শংকরদা, শীতলদা ও অদ্বৈতদা যথাক্রমে মুক্তি, কর্ম, নাম, জ্ঞান ও ভক্তি—ইঁহাদের মালার একটি জ্যোতিষ্ক পঞ্চভূতের ফাঁদ ছিঁড়িয়া স্ব-স্থানে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বলিলেন, "দাদু, তুমি গিয়া আমার জন্য শ্রীবৈকুণ্ঠে যায়গা রাখিয়া দিও, আমি একবৎসরের ভিতর যাইতেছি।" আশ্রমস্থ সকলেই অশ্রুবিসর্জন করিলেন, কেহ শোকাভিভূত হইয়া, কেহ গুরুশিষ্যের বিচ্ছেদ বেদনায়, কেহ ভক্তির আতিশয্যে। সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া ঠাকুর আমায় বলিলেন, "ওরে, সন্ন্যাসী দেহ রক্ষা করিয়াছে। কাঁদিতে নাই, কাঁদিতে নাই।" সকলকে এই স্তোকবাক্য প্রদান করিতে করিতে নিজেই কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন। চোখের জলে ঠাকুরের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার পর সকলে মিলিয়া দাদুকে শিবপুর শ্মশান ঘাটে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধা করিয়া দিয়া আসিলাম।

দাদু যখন প্রথমদিকে ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হন, তাঁহার প্রচণ্ড আফিং এর নেশা ছিল। ঠাকুর তাঁহার এই দুরন্ত নেশা ভাঙ্গিয়াছিলেন। তাঁহার নেশা ঘুরাইয়া দিবার জন্য তিনি দাদুকে লইয়া এক হাতে কুকুর ও অন্যহাতে শিবাকে রুটী ভক্ষণ করাইতেন। ঠাকুরের লীলা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এক হাতে কুকুর অন্য হাতে শিবাকে তিনি কি করিয়া পোষ মানাইতেন। না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এক স্বনামধন্য ও সম্ভ্রান্ত শহর। মল্লেশ্বরের প্রবীন অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি 'শ্রীগোবিন্দ প্রসঙ্গ' রচনায় লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ স্মরণে আমার যাহা কিছু বলা, তাহা আমার নিজস্ব অনুভূতি।

গীতার টীকাকার বলিয়াছেন—গীতার একটি বর্ণও অযথা বলা হয় নাই, অপ্রয়োজনীয় বলা হয় নাই, ঐ কথা পড়িয়া আমার মনে হইল—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি অল্পকাল পরে, বঙ্গদেশে বহু মহাপুরুষের সমসাময়িক রূপ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের আবির্ভাব হইল কেন? এই প্রশ্ন অন্তরে লইয়া তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন পাইলাম।

জপ কর, জপের দ্বারা যজ্ঞ হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"

কীর্ত্তনাবলীতেও প্রথমে নামজপ শুনিতে পাই। জ্ঞানমার্গের তর্ক কর্মমার্গের অনুষ্ঠান মনকে নিষ্কাম করিতে পারে না। আনন্দময়ের সম্মুখে নাম জপের সংগে সংগেই কর্মবাসনা তৎকালীন লয় হইয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরে—জপ করিতে করিতে ভক্ত ও ভগবান, জপকারী ও শ্রীগোবিন্দ এক হইয়া যায়। অবশ্য এ অনুভূতি ক্ষণিকের জন্য। তখন অ, উ, ম, অ, ম, উ, ম, উ, অ, এই প্রণবের খেলা চলে।

তৃতীয় স্তরে—জীবনের যেটুকু দুর্লভ সময় জপ ও কীর্ত্তনের সান্নিধ্যে কাটে, তা ছাড়া বাকি সময় সংসারে মনকে নামিয়ে আনে।

সংসার মনকে বদ্ধ করে মায়াজালে। সংসারে থেকে জীবের মুক্তি, জীবনের পূর্ণ আনন্দের কথা স্মরণ করিতে দেয় না।

এই সমস্যার উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন—একবার শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইলে আর বিনাশ নাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই বাসনা রক্তবীজের বিনাশ—চামুণ্ডার রক্তপানে। শ্রীগোবিন্দ তাঁর কীর্ত্তন দ্বারা বিনাশ করেছেন। কিন্তু শুধু কীর্ত্তন দ্বারা কি? শুধু নিজেকে ভুলে যাওয়াই কি চরম? তা নয়, প্রমাণ পাই বুদ্ধের নির্ব্বাণ মহায়ানে পরিণত হওয়ায়। দক্ষিণ ভারতে শ্রীশ্রীরামানুজ নিজের সাধনায় এই দেখাইয়াছেন।

নিত্যমুক্ত হইতে হইলে রস-সাধক হওয়া চাই।

কেমন করিয়া সেই রস-সাধক হওয়া যায়—গোবিন্দ অবতারে শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ তাহাই প্রকাশ করিলেন। সমাধিতে, তাঁহার অবচেতন সমাধিতে, মধুর হাস্যালাপে, গানে ও কীর্ত্তনে পানভোজনাদিতে নিষ্ঠা ও আচারে জাতি, ধর্ম্ম, নির্ব্বিশেষে, শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগ, হোম, ক্রিয়াকর্মের সন্ন্যাস ও গৃহস্থ ধর্মের, পণ্ডিত ও অপণ্ডিতের মধ্যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্বের, শারীরিক শক্তি সাধনায়, ভোগ ও ত্যাগে এমন অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় আর কোথাও দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীগোবিন্দের জীবনালোচনার আর একটি প্রধান অঙ্গ হইল—জীবকে রোগ যন্ত্রণা হইতে রোগীর রোগ নিরসন। তিনি এই দেখাইয়াছেন সৃষ্টিতে বিষ্ণুপ্রধান নারায়ণ। নারায়ণ বক্ষঃলগ্না লক্ষ্মীর সহিত অলক্ষ্মী বা রোগ থাকিতে পারে না। তবে আমরা দারিদ্র যন্ত্রণায় ভুগি কেন? অনিত্য মায়ায় ঘুরিয়া অন্ধ হইয়া থাকি বলিয়া। নিত্য ও বিষ্ণুমায়ায় প্রবেশ করিলে আর দুঃখযন্ত্রণা থাকে না। কেমন করিয়া বিষ্ণুমায়ার আশ্রয় পাইব? তাঁহাকে মুখে উত্তর দিতে শুনি নাই। তাঁহার রূপ দর্শন করিয়া অনুভূতি হইয়াছে—তিনি বলিতেছেন—"আমাকে দেখ"। কীর্ত্তনাবলীর এই অধ্যায়ের পর রাধাকৃষ্ণলীলা তাহার পর নামে আসিয়া সংসারের কল্যাণে লক্ষ্মীর স্তব ও তাহার পর শ্রীগুরুবন্দনা।

যে প্রশ্ন লইয়া প্রসঙ্গ সুরু করিয়াছি তাহার সমাধানের জন্য অনুভূতি সশরীরী আনন্দময় শ্রীগোবিন্দের দর্শন না মিলিলে গীতা উক্ত "অত্যন্তং সুখমশ্নুতে" এই বাক্যের প্রকৃত বোধ জাগিত না। যার যেমন অধিকার স্ত্রী, শূদ্র, পাপী, পুণ্যবান, জ্ঞানী, গুণী, নিজ নিজ সাধনোপযোগী শান্তি ও তৃপ্তি কি করিয়া লাভ করিবে শ্রীগোবিন্দ কথা' পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবে। হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর ভিতর শ্রীগোবিন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীমদনমোহনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ১৯৫০ কি ১৯৫১ সাল জুন কিম্বা জুলাই মাসে কোন একদিন বৈকালে সালকিয়া নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাড়িতে ওঁরই গাড়ী করিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবা, ভারতখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক সংগীতাচার্য শ্রীশ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেতার শিল্পী শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরি শংকর ঘোষ, তুলসীদাস ও আমি সংগীতের আসরে যোগদান করিতে যাই। রাত্রে ফিরিব না বলিয়া বাক্‌সাড়া পুলিশ ফাঁড়ির এক ভক্ত হাবিলদারকে রাত্রে আশ্রম দেখাশুনার বা পাহারার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যবস্থা করিয়া যান সেই সময়ে উপরোক্ত হাবিলদার আশ্রমের খুব ভক্ত ছিলেন।

সুরেনবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যা হইতে খুব গান-বাজনা চলিতেছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর ও যোগীনবাবু নানারূপ সুরের লহরা করিতেছেন। সুরের মূর্চ্ছনায় মাঝে মাঝে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। যোগীনবাবু, কানাইবাবু অবতার পুরুষের সামনে বসিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছেন। যখন যে সুর গাহিতেছেন তার রূপ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। ঘরের শ্রোতারা অপলক-দৃষ্টিতে বসিয়া বসিয়া শুনিতেছেন, যেন কাহারও কোনরূপ বাহ্য-জ্ঞান নাই। সন্ধ্যা কখন পার হইয়া গভীর রাত হইয়া গিয়াছে কাহারও খেয়াল নাই। হঠাৎ রাত্রি ২টা নাগাদ টেলিফোন রিং বাজিয়া উঠিল। সরকার মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিলেন। দুই চার মিনিট পরে আসিয়া সাধুবাবাকে বলিলেন, "বাবা, বাক্‌সাড়া ফাঁড়ি হইতে হাবিলদার ফোন করিয়া বলিতেছেন যে রাত ৯টা নাগাদ হাবিলদার দুইজন সিপাহীকে লইয়া আশ্রম পাহারা দিবার জন্য আশ্রমে আসে এবং ১০টা নাগাদ মশারী খাটাইয়া শুইয়া পড়ে। ঘণ্টাখানেক বাদে হঠাৎ তারা শুনতে পায় বাইরে কে যেন "সাধুবাবা" "সাধুবাবা" বলিয়া ডাকিতেছে। সেই

ডাকে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং হাবিলদার চিৎকার করে বলে যে সাধুবাবা আশ্রমে নাই, সালকিয়া সুরেন সরকারের বাড়ি গেছে। এই বলে তারা শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে আবার তারা শুনতে পায় কে যেন "সাধুবাবা, সাধুবাবা" বলে ডাকছে। আবার তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং হাবিলদার এবার চিৎকার করে বলে যে সাধুবাবা আশ্রমে নাই, সুরেন বাবুর বাড়ি, সালকিয়া গেছেন। তারপর আবার সে শুয়ে পড়ে। আবার কিছুক্ষণ বাদে ঐ ডাক আসতে থাকে—তখন তার মনে হয় ডাকটা আশ্রমের ভিতর থেকেই আসছে। এইভাবে ৬।৭ বার "সাধুবাবা, সাধুবাবা" বলিয়া ডাকা-ডাকিতে তাদের আর ঘুম হয় না এবং অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ব্যাপারটি কি দেখিবার জন্য তারা উঠে পড়ে এবং আশ্রমের ভিতর বাহির টর্চলাইট লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়া কাহাকেও দেখিতে পায় নাই ও পরে ক্লান্ত হইয়া আশ্রমের ঘাটে কিছুক্ষণ বসিয়া ফাঁড়িতে আসিয়া আপনাকে ফোন করিতেছে। আপনাকে বলতে বলেছে যে শুধু শুধু তাদের পাহারা দিবার জন্য রেখে গেছেন। যাঁরা পাহারা দিবার তাঁরাই দিতেছেন।" সাধুবাবা কথাগুলি শুনিয়া কোন কথা বলিলেন না, চুপচাপ রহিলেন।

ভোর হইতে হইতে না হইতে ঠাকুর বলিলেন, "চলো, এখনি আমরা আশ্রমে যাইব।" যতদূর মনে আছে সকাল ৭টার ভিতর আমরা সদলবলে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আশ্রমের ভিতর ঢুকিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "এরা মদনমোহনের ভোগ দেয় নাই। সেই জন্য মদনমোহন রাগ করিয়াছেন এবং আমার কাছে নালিশ করিয়াছে। এখন হইতে আজ ৫২ বার মদনমোহনের ভোগ দিতে হইবে এবং মদনমোহনকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।" বলাও যা কাজেও তাহাই। সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত বারে বারে ৫২ বার নানারূপ রান্না করিয়া ভোগরাগাদি হইল। পরে ঠাকুর বলিলেন, "যাও, মদনমোহন সন্তুষ্ট হইয়াছে, এরূপ যেন আর কখনো না হয়।"

একদা ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনী ও অভ্রজগতের একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীরামকুমার আগরওয়ালা আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবার দীন কুটীরের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, আপনাকে আমি এক লক্ষ টাকা দিয়া এইস্থানে মন্দির বানাইয়া দিতেছি—মন্দিরের ট্রাষ্টি আমি করিয়া লইতেছি।" উহাতে অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "দূর শালা, তোর একার টাকায় মায়ের মন্দিব কেন হইবে? মা প্রতিটি ভক্তের প্রেমের ও শ্রদ্ধার প্রণামী গ্রহণ করিয়া একটা একটা টাকা দিয়া মন্দির হইবে। মা যদি ইচ্ছা করেন মায়ের দশ হাতের এক হাতে দিলেই মন্দির হইয়া যাইবে। দীনদরিদ্রের সেই মন্দিরে সকলের সমান প্রবেশাধিকাব থাকিবে। ধনী-গরীব একসাথে খাইতে বসিবে। ইহা শ্রীক্ষেত্র।" তাহাতে প্রেমিক রামকুমারজীও চমৎকৃত হইয়া তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কতরকম ভাবে যে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই সময়ে আধ্যাত্মিক ঢেউ আসিয়াছিল এবং বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গ-নিতাই, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বামাক্ষ্যাপা, নিগমানন্দ, অন্নদাঠাকুর, সারদামা, প্রণবানন্দ, আনন্দময়ী মা, সীতারামদাস, রমন, বিজয়কৃষ্ণ, রামদাস বাবাজী, কাঠিয়াবাবা, বারদীর ব্রহ্মচারী, ত্রৈলঙ্গ প্রমুখ মহাপুরুষ ও অবতারকল্প পুরুষগণ পূজিত হইতেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসী মাতোয়ারা হইয়া আছে। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে মহাপুরুষগণ তাঁহাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন ও সনাতন ভারতবাসীর দ্বারা করাইয়া লইতেছিলেন। দেশবাসীগণও নরেন্দ্রনাথের ভাবে উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিজেদের আচার-ব্যবহার সেইরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট ছিল। সেইজন্য মহাপুরুষের দর্শন পাইলে উহারা আর কিছু করুক চাই নাই করুক আগে পরীক্ষা করিবার মনোভাবই তাহাদের মনের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিত। পরন্তু বৈদেশিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অবিশ্বাসী

ও বিচারশীল চরিত্রও বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদিগের মধ্যে এক আদর্শের বস্তু হইয়া উঠিতেছিল। নরেন্দ্রনাথের আর কিছু লইতে পারুক চাই না পারুক তাঁহার পরীক্ষা করার বৈশিষ্ট্য ও সন্দেহাকুল কৈশোরের মন ও বিদেশী শিক্ষার বিচারধারা বঙ্গসন্তানগণ ভালো করিয়াই রপ্ত করিয়া নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর" ও "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মঃ ভয়াবহঃ" এই দুই আপ্ত বাক্য হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া আজ হীরা ফেলিয়া কাঁচ ঘরে তুলিতেছে, স্বর্ণ ফেলিয়া কাগজ উঠাইতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে হো-হো করিয়া মধুর হাসি হাসিয়া "That is the question, consult করে insult করেছে" এইরূপ বলিয়া উঠিতেন। শ্রীগোবিন্দকে মায়েরা যখন ঘিরিয়া সেবা করিতেন তাঁহার তখন ঠিক গোপালের অবস্থা হইত মাঝে মাঝে কোনও অদৃশ্যের সহিত এমন ভাষায় কথা বলিতেন যে কেহই কিছু বুঝিতে পারিত না। ভাষাটি যেন শোনা-শোনা, বোঝা-বোঝা কিন্তু উহার কোন মর্ম উদ্ধার করিতে পারিতাম না। দেবতাদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে তিনি ঐসকল ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং আচমকা ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া পড়িতেন। তিনি যেন সবসময় কাহার সহিত থাকিতেন। হঠাৎ দেখা যাইত তাঁহার চক্ষু দুইটি জবার ন্যায় লাল হইয়া গিয়াছে, কোন্ গভীর রাজ্যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারিপার্শ্বে এমন গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত যে কাহারও সেই সময় তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস ও ভরসা হইত না। বালকভাব হইতে হঠাৎ এমন বিশ্বম্ভর-ভাব হইয়া যাইত যে কে বিশ্বাস করিবে যে মুহূর্ত্তকাল পূর্বে তিনি একেবারে শিশুটি হইয়া হাসি-ঠাট্টা করিয়াছেন।

কোন ভক্ত তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে তিনি ছটফট করিতেন,

অস্থির হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার আর এক ভাব। যতক্ষণ না সেই ভক্তের সহিত মিলিত হইতেছেন ততক্ষণ তাঁহার ভিতর এক অসোয়াস্তি পরিলক্ষিত হইত। ভক্তের কষ্ট তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিতেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তিনি নিয়ত রাখিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে শুধু সাধু ধারণা করিলে ভুল হইবে। সাধারণতঃ আমরা যে সকল অসাধারণ সাধু মহাপুরুষ দেখিয়া থাকি ও পুস্তকে পাঠ করি প্রাণগোবিন্দ কিন্তু ঠিক ঐরূপ ছিলেন না। তিনি অসাধারণ হইতেও স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনিই স্বয়ং ভগবান ছিলেন। এই উক্তিতে কোন ভাবুকতা বা আতিশয্য নাই। বহুবার বহুজনকে তিনি নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ তৎকালীন কলিকাতার বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও বিদ্বান্মণ্ডলী পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার শ্রীচরণে তাঁহারা সাক্ষাৎ অবতার ভাবিয়া লুটাইয়া পড়িতেন।

আমি প্রায়ই তাঁহার শ্রী-অঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া দিতাম। ফুলের ন্যায় নরম ছিল তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাঁহার শ্রীচরণতলে, হস্তে ও অঙ্গুলীতে, আমি স্বচক্ষে কতকগুলি দৈবচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া অভিভূত হইয়াছি। ওঁকার, ত্রিশূল. শঙ্খ, চক্র, ত্রিকোণ প্রভৃতি চিহ্নসকল তাঁহার শ্রী-অঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অষ্টসিদ্ধি তাঁহার শ্রীচরণের দাস ছিল এবং তিনি ঐ সকলের পারে গিয়া বাৎসল্যভাবে ও সহজ অবস্থায় বাস করিতেন। মুহূর্ত্তে উহা ভেদ করিয়া, তাঁহার বিভূতিসকল উপছাইয়া বাহির হইয়া দিগন্ত আলোকিত করিয়া তুলিত।

আশ্রমে কেহ আসিলে তাহাকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার আদেশ। সে সাহেবই হউক আর মুসলমানই হউক। ওনার কয়জন খাঁটি সাহেব ভক্ত ও শিষ্য ছিল। তাঁহারা সকলেই এখন বিলাতে ও আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো সঙ্গে রাখিতেন এবং শ্রীগোবিন্দকে

চরণ স্পর্শ করিয়া বা সাষ্টাঙ্গ করিয়া প্রণামও করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও যেন সাহেবদের সঙ্গে একেবারে সাহেব বনিয়া যাইতেন। কোথা হইতে State Express 555 Tin আসিয়া হাজির হইত এবং তিনি সেই ভক্তদের তাহা offer করিতেন। ওনারা ঠাকুরকে গোবিন্দ বলিত। ঠাকুরেরও খুব আনন্দ হইত এবং যাহাতে ওনাদের সেবা যত্নের কোন ক্রুটি না হয় সেইজন্য সদা সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখিতেন। আশ্চর্য্য হইতে হয় যে তাঁহারা ঠাকুরেব কথা বুঝিতেন আর অন্তর্যামী ঠাকুবও তাঁহাদের কথা বুঝিতেন।

কোন কোন সাহেব জুট মিল হইতে আশ্রমে ভক্তদের উপবেশনের জন্য ঠাকুরকে চট পাঠাইয়া দিতেন। ঠাকুরকে তাঁহারা বিলাতী জিনিসপত্র দিতেন। সেণ্ট, সিগারেট. লাইটার, কলম ইত্যাদি। ঠাকুরও তাহা বিলাইয়া দিতেন। একবার জার্ভিস নামধারী এক আমেরিকান ভক্ত ঠাকুরকে এক পেটী সেরা চা দেন এবং কয়মাস ধরিয়া ঐ চা আশ্রমে সকলের সেবায় লাগে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাসকল ঠাকুর মিটাইয়া দিতেন। আশ্চর্য্য হইতে হয় তাঁহারাও তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ ঠাকুরকে জানাইতে কুণ্ঠিতবোধ করিতেন না।

এক এক সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দুই হাতে দশটি আংটি দেখা যাইত। পরের দিন একটিও নাই। কাহাকে কখন দান করিয়া দিয়াছেন। ভালো ভালো শাড়ী, ধুতি উনি অকৃপণ হস্তে যাহাকে তাহাকে বিলাইয়া দিতেন।

সুভাষ চন্দ্র বসু শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কয়বার সঙ্গ করিয়াছেন। একবার ঠাকুর সুভাষবাবুর মাকে বলিলেন, "মা, তুই সুভাষের বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করলিনি কেন? সুভাষকে কেন এই পথে পাঠালি?" উহাতে সুভাষের মা তেজোদ্দীপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরও উহাতে যারপরনাই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া-

ছিলেন, "প্রতি ঘরে ঘরে সুভাষের জন্য মায়েরা যদি তাহাদের বীর সন্তানদের ত্যাগের মন্ত্রে, আত্ম বিসর্জনের পথে দীক্ষা দিতে পারেন, আমি সুভাষের মা হইয়া সুভাষকে সেই পথে আগাইয়া দিতে পারি না ?" সুভাষের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের আন্তরিক যোগ ছিল এবং দুইজনের মধ্যে কখনও কখনও যোগ হইত। বহু বিপ্লবী নেতা তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া আত্মশুদ্ধি ও প্রেরণা জাগাইয়া চলিয়া যাইতেন। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রায়ই ঠাকুরের সহিত নির্জনে কথোপকথন করিয়া যাইতেন। বারীনবাবুর মুখে অরবিন্দের উল্লেখ শুনিতাম। বারীনবাবু শ্রীশ্রীঠাকুর ও অরবিন্দের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ দীর্ঘাঙ্গী, ডাঃ অমল রায়চৌধুরী, ডাঃ এস, কে, দাস, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ডাঃ হরিগোপাল বরাট, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিখ্যাত ডাক্তারগণ তাঁহার চরণ স্পর্শ পাইয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিতেন।

মানঅভিমানের পালায় ঠাকুরকে খুব ক্লেশ ভোগ করিতে হইত— আমরা যাহাকে লীলা আখ্যা দিই। পঞ্চভূতের শরীর ত' বটে। তবু তাঁহাকে ভক্তের টানে ছুটাছুটি করিতে হয়। কখনও টালিগঞ্জের টালির নালার ওপারে আবার পরমুহূর্ত্তে শ্যামবাজারে, কি আহিরী-টোলায়, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি কালীঘাটে, কি শিবপুরে, কি ব্যাঁটরায়, কি বিজয়নগরে, কি পাটনায়, কি মজঃফরপুরে। কলিকাতায় কলি-যুগে ঠাকুর ত' আর গাণ্ডীব বা বংশীহাতে ঘুরিবেন না। তাই তাঁহাকে আমরা আমাদেরই মত মোটরে বাড়ী বাড়ী ভক্তের টানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। স্বয়ং নারায়ণ যে সর্ব্বভূতময় তাঁহার আবির্ভাবে আমরা প্রতিবারই উপলব্ধি করিতাম। উনি বলিতেন, "ওরে, একি কানে দিলাম ফিস্ ফিস্ মাঝে মাঝে কিছু দিস্ ? দীক্ষা লইবার তিন জন্মের ভিতর উদ্ধার করিতে হইবে। বাবাঃ! সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরুশিষ্যে দেখা নাই।

সেখানে গরুগাড়ীর প্রবেশ নিষেধ। দীক্ষা দিবার তিন দিনের ভিতর দর্শন হইবে—সে স্বপ্নেই হউক আর সাক্ষাতেই হউক।" শিষ্যভক্তগণও আত্মহারা হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতেন। কেউ কৃষ্ণ দেখিতেছেন, কেউ কালী দেখিতেছেন, কেউ মহাদেব দেখিতেছেন, কেউ রামানুজ দেখিতেছেন, কেউ গৌর আবার কেউ রামকৃষ্ণ দেখিতেছেন তাঁহার ভিতর। এক এক সময় ভাবতরঙ্গের এমন ঢেউ আসিত যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মুহূর্ত্তের ন্যায় বাহিয়া যাইত। এখন সেই সকল দিনগুলির কথা মনে পড়িলে বিস্ময় জাগে ঐসকল তাঁহার লীলার মাধুরী ছাড়া কিছুই নয়। যিনি শৈশবে বিষস্তন্য পান করিয়া পূতনাবধ করিলেন তিনিই আবার ব্যাধের বিষাক্ত তীর গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার লীলা বুঝিবার ক্ষমতা কাহার আছে তিনি যদি না বোঝাইয়া দেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর রামগোবিন্দকে কেহ কেহ কোনও কোন স্থানে কয়বার বিষমিশ্রিত খাদ্য দিয়াছিল। লীলাধর সেই নীল গরল হজম করিয়াছিলেন। গোড়ালীতে জমা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

বালিগঞ্জের শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ডি ছিলেন। তিনি ঠাকুরের ভক্ত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার স্বরচনা হইতে কিছু উদ্ধৃতি করিয়া দিলাম—

৬।৭ বৎসর পূর্বে এক বিপন্ন বন্ধুকে 'চরণ দেওয়া সাধুর' খোঁজ করিতে দেখিয়াছিলাম। নামটি তাঁহারই কাছে প্রথম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। তিনি খবর পাইয়াছিলেন বালিগঞ্জ জনক রোডে এক অবসরপ্রাপ্ত জজের বাড়ীতে ঐ সাধুর যাতায়াত ছিল।

দুইজনে সেই জজের (রায়বাহাদুর বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের) বাড়ী আবিষ্কার করি। সাধুর সন্ধান পাওয়া যায়।

তিনি 'সাধুবাবা' নামে পরিচিত এবং হাওড়া বেতড়ে তাঁর

সদাব্রত আশ্রম আছে। তিনি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ রামানুজ সম্প্রদায়ের কিন্তু বহুদিন মানভূমের বেড়ো গ্রামের নিকট পুরুষানুক্রমে বাস করায় সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া গিয়াছেন।

সেই আশ্রমে দেখিলাম নাতিক্ষুদ্র নিরাভরণ এক জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির আশে পাশে নানা দেবদেবী। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনার অর্থাৎ বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতির প্রচলন। কয়েকটি বালক লইয়া একটি অনাড়ম্বর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম এবং কয়েকটি সুন্দর আশ্রম-গাভীসহ একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন গো-শালা।

দেখিলাম সাধুমহারাজের কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব দক্ষতা, পদাবলীর ফাঁকে ফাঁকে স্বরচিত পংক্তিলহরীর লীলা সুকণ্ঠ ও সুবাদ্য সহযোগে অনুপম মাধুর্য্য মনোহরণ করিতেছে। গান তাঁহার সাধনা বলিয়া মনে হইল; দান তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি, সৌজন্য তাঁহার ভূষণ।

কেহ কেহ তাঁহাকে যোগসিদ্ধ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলিতেন। রোগীর দেহ স্পর্শ করিয়া রোগ প্রশমনের কথা অবগত হইয়াছি। দুস্থকে তিনি অর্থ ও উপদেশ দিয়া, বিনা পারিশ্রমিকে রোগীর বাড়ী গিয়া ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গোঁড়ামির পরিচয় পাই নাই যদিও শুদ্ধাচার ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ ছিলেন। ব্যথিত চিত্ত সাহায্যপ্রার্থীকে সান্ত্বনা, উপদেশ ও সরল হাস্য পরিহাসে পরিতৃপ্ত করিয়া সাধ্যমত সম্ভবমত তাহার উপকার করিয়াছেন।

আলাপে বা পোষাকে তাঁহাকে মাদ্রাজী বলিয়া বোঝা যাইত না। মানভূমের বেড়ো গ্রামের নিকটে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ও আত্মীয়গণ বাস করিতেছেন। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় তিনি স্বচ্ছন্দে কথা বলিতেন ও লিখিতেন।

শ্রীমতী কমলা দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অনেকগুলি বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনা তাঁহার অনুরোধে নকল করিয়া দিতেন। কয়েকটি ভাবসমৃদ্ধ ও সাধনার ইঙ্গিতময় ছিল।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের চরিত্র গঠন ও বিনামূল্যে শিক্ষাদান তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বেতড় গ্রামে একটি স্কুলও তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

একদিন উক্ত জজবাবুর বাড়ীতে ধর্ম্মালোচনার আসরে 'পণ্ডিতজী' নামক এক বিত্তবান অশীতিপর হিন্দুস্থানী বেদজ্ঞ ও জ্যোতিষীর সহিত তর্কযুদ্ধে সাধুজীর সরল যুক্তিসহ অনুশীলন পদ্ধতি ও প্রশ্নোত্তরছলে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠার কৌশল শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিল।

স্মিতহাস্য তাঁহার প্রতিপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিত, কঠোর বিদ্রূপকে স্তিমিত করিত, ছোট ছোট মন্তব্যগুলি বড় বড় প্রশ্নের সমাধান করিত।

অপরের নিকট নূতন কিছু শুনিতে তিনি তৎপর ছিলেন এবং দুরূহ বিষয়ের অবতারণাদ্বারা ধূম্র জালের সৃষ্টি করিতেন না। মাঝে মাঝে নিজের কৃতিত্বের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, যশোলাভের কথার উল্লেখ করিতেন—এই ক্ষণিক অসাবধানতা তাঁহার স্বভাবজ সারল্যের পরিচায়ক।

গত ১৩৬০ সালে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এই সজ্জন বিদ্যোৎসাহী মহানুভবের তিরোধান হইয়াছে। তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্তগণ তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে সমুজ্জ্বল রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে ইহা আনন্দের কথা। নিবিড় ভাবে অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য সম্ভবতঃ উদ্ঘাটিত হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অগ্রদ্বীপ-লীলার কিছু অংশ আমরা শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা হইতে উদ্ধার করি। উহা লিপিবদ্ধ করিলাম—

প্রায় দিনই ঠাকুর আমার দাদুর কাছে অগ্রদ্বীপ নিয়ে যাবার জন্য আবদার করতে লাগলেন। দাদুও ঠাকুর শীঘ্রই যাবেন বলে

অগ্রদ্বীপে অনবরতঃ চিঠি দিতে লাগলেন কিন্তু সেই শুভযাত্রার দিনটি কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। সালটা হবে ১৯৩৯।৪০।

চৈত্রের গরম দিনের এক সকালে আমাকে ও দাদুকে নিয়ে ঠাকুর হাওড়ার ডাঃ সুরেন ঘোষের বাড়ী গেলেন। প্রায় সারাদিন খাওয়া দাওয়া ও গানবাজনা করে কেটে গেল। বেলা তিনটা নাগাদ দাদুকে বললেন "আজ অগ্রদ্বীপ যাব, দাদু।" দাদু প্রমাদ গণলেন কারণ সন্ধ্যার গাড়ীতে গেলে অজ পাড়াগাঁয়ে অনেক অসুবিধা। গভীর রাতে ট্রেন থেকে নেমে গঙ্গার অপরপারে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কিছু করবার শক্তি নেই কাজেই সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। যথাসময়ে আমি, দাদু, মটরদা এবং ঠাকুর ট্রেনে উঠে বসলাম। গাড়ীর মধ্যেও অনেক গান গেয়েছি এবং নানা গল্পের মধ্য দিয়ে রাত এগারটার পর অগ্রদ্বীপ ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। ভাগ্য ভাল যে দাদু বুদ্ধি করে হাওড়ার ভক্তের বাড়ী থেকে একটা হ্যারিকেন নিয়ে এসেছিলেন।

ষ্টেশন থেকে গঙ্গা পর্য্যন্ত দেড় মাইল কাঁচা পথ এই গভীর রাতে কি ভাবে যে যাব তাই ভাবতে লাগলাম আমরা সবাই। হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোয় দেখলাম ঠাকুর হাসছেন। গাঢ় নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ঠাকুর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, "জয় শ্রীগুরু পরমানন্দে হরি হরি বোল" তারপরই আমাদের আগে আগে খড়ম পায়ে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন। ঠাকুরের যেন কতদিনের চেনা পথ। নিবিড় বনানী, ধূলিকণা যেন ঠাকুরের চরণস্পর্শে ধন্য হয়েছে। গাজীপুর গ্রামের কিছু দক্ষিণে যাবার পরই যা দেখলাম এবং যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম তা'তে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। রাত প্রায় বারটা, গভীর অন্ধকার। রাস্তাটা যেখানে ডানদিকে গঙ্গার দিকে বেঁকে গেছে ঠিক সেই মোড়ে একটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনেক দূর থেকেই ঠাকুর চিৎকার করে বললেন, "কিগো, ঘোষের পো, কেমন আছ সবাই ?" "ভাল আছি ঠাকুর" এই বলে লোকটি

ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। ঠাকুর কিন্তু আর কোন কথা বললেন না, এগিয়ে চললেন গঙ্গার দিকে। আমরা পিছন ফিরে ঘোষের পো'কে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না।

অগ্রদ্বীপে সেই সময় গাজনের মেলা চলছে। বিরাট মেলা, নানা জায়গা থেকে পসারীরা দোকান পাট খুলে বসেছে। নানা গ্রাম থেকে এসেছে কীর্ত্তনের দল। রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত সারা গ্রাম আনন্দ মুখর হয়ে থাকে এবং এই সময় পর্য্যন্ত খেয়াও পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা খেয়া ঘাটে এসেছি রাত সাড়ে বারটায়। কাজেই পারাপারের কোন ব্যবস্থাই নেই। ঠাকুর খানিকটা জলে নেমে গিয়ে বিভিন্ন নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। খানিক পরে দেখলাম একটি আলো মিট্ মিট্ করে এপারে এগিয়ে আসছে। ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলার শব্দ শুনতে পেলাম। এই লীলা কি বিচিত্র! ঠাকুর যেন প্রচুর উদ্দীপনা ও আনন্দ নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে চলেছেন। ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে মাঝি নেমে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। নৌকায় উঠে ঠাকুর আপনজনের মত মাঝির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। ওপারে নেমে আমরা রাস্তা কম হবে বলে জমিদার বাড়ীর এলাকা ধরে যেতে যেতে বাধা পেলাম। ঐ দুপুর রাতে কোন মহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে বললেন। ঠাকুর বললেন, "আমাদের কষ্ট দিয়ে নিজেরও না ভোগান্তি হয়।"

যাহ'ক রাত প্রায় পৌনে একটায় গন্তব্য স্থানে পৌছে ঠাকুর হাসিমুখে ডাকলেন, "কইগো, ছোটমা (আমার কাকীমা) একটু চা হবে নাকি?" নিভৃত পল্লীর বুক বিদীর্ণ করে যেন সেই মধুর কণ্ঠ পল্লীবাসীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। নদীয়ার গোরা যেন বহুদিন পর আবার তার লীলাভূমিতে এসে পৌছেছে। বাড়ীর সবাই জেগে উঠে আনন্দে দিশাহারা। আমাদেরও সারাদিনের ক্লান্তি মনে

রইল না। গভীর রাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে এসেছে তাদের প্রাণের ঠাকুরকে স্বাগত জানাতে।

পরের দিন স্নানপর্ব শেষ হলে আমাকে ডেকে ঠাকুর বললেন, "নাথ, মেলাতলায় গিয়ে আমার একটা জামা তৈরী করিয়ে নিয়ে আয়।" আরও বললেন, "গুপীনাথের মন্দিরের পশ্চিমে যেখানে তিনটা কাঁঠাল গাছ এক সঙ্গে উঠেছে তার নীচেই দেখবি কেষ্টনগরের শ্যামদাসের দোকান, সেই দোকানে অর্ডার দিবি, মাপের দরকার হবে না।" আমি ও মটরদা এই অসংলগ্ন এবং অহেতুক হুকুম তামিল করতে চরণকে সঙ্গে নিয়ে মেলাতলায় গেলাম। তিনটি জোড়া কাঁঠাল গাছের তলায় দেখলাম এক দর্জ্জির দোকান। খোঁজ নিয়ে জানলাম দর্জ্জির নাম শ্যাম, কেষ্টনগরে বাড়ী। আমাদের কাছে সব শুনে সে বিকালেই জামা পৌঁছে দেবে বললো। আমরা লীলাময়ের একের পর এক লীলা দেখবার আশা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। ঠাকুরের ঘরে তখন বহু দর্শনার্থীর ভীড়। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসেছেন জমিদার বাবুর বিধবা বোন। হঠাৎ পেটে ভীষণ যন্ত্রণা নিয়ে এসেছেন ঠাকুরের কাছে কারণ আগেই শুনেছেন ঠাকুর রোগ সারাতে পারেন। ঠাকুর হাসিমুখে বলছেন, "কাল রাতে আমায় অত কষ্ট না দিলে আজ এই হঠাৎ ভোগান্তি হ'ত না।" যাহ'ক কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে তাঁর যন্ত্রণা সেরে গেল।

দিনের পর দিন দর্শনার্থী এবং নানা প্রকারের রোগীর ভীড় বাড়তে লাগলো এবং এর ফলে ঠাকুরের একটুও অবসর থাকতো না। বহু গরীব রোগী যারা পল্লীগ্রামে থেকে অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরে যেত তারা ঠাকুরের চরণস্পর্শে সেরে গেল।

একদিন সকালে স্নান করার পর ঘরে গিয়ে দেখি ঠাকুর নেই। সকলকে জিজ্ঞাসা করেও কোন হদিস্ পেলাম না। সারা পাড়া খবর নিয়ে গেলাম গোয়ালপাড়ায়। গোবিন্দ ঘোষের উঠানে গিয়ে দেখি দাওয়ার উপর বসে ঠাকুর বালকের মত ক্ষীর

আর ছানার নাড়ু খাচ্ছেন। গোবিন্দ ঘোষের বৌ ঠাকুরকে খাওয়াবে বলে ঐ সব খাবার তৈরী করছিল কিন্তু অন্তর্যামীর চেনাশুনার বালাই নেই অথচ সব জানতে পেরে গোবিন্দের বাড়ী লুকিয়ে পালিয়ে এসে খেতে বসে গেছেন। গোবিন্দের বৌ-এর ভাগ্যের তারিফ্ করতে হয়।

সারাদিন হৈ-চৈ-এর মধ্যে কাটলেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিকের চওড়া রোয়াকে কীর্ত্তনের আসর বসতো। অগণিত শ্রোতার মাঝে গান খুব জমে উঠতো। মেলাতলা থেকে বহু কীর্ত্তনের দল এসে প্রায়ই জমা হ'ত. আমাদের আসরে। তু-তিন ঘণ্টা গানের মধ্যে যে ভাব ফুটে উঠতো তা' ভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। ধর্মপ্রবণ দেশ অগ্রদ্বীপ। প্রতিটি মানুষের ধর্মপ্রবণতা ও সঙ্গীতের ভাবধারা এক হয়ে গেলে ঠাকুরের সমাধি হ'ত। তাঁর কানের কাছে 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'রামগোবিন্দ' নাম নিলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতো।

একদিন বিকালে আকাশ ভরে উঠেছে কালবৈশাখীর ঘন কাল মেঘে। ঠাকুর 'তুর্যা' মাঝিকে ডেকে নৌকা আনতে বললেন। আমি বাধা দিলাম কিন্তু ঠাকুর হেসে বললেন, "চল্‌না—গঙ্গার মাঝখানে গিয়ে শিবের নাচ দেখবো।" নৌকা নিয়ে আমি, ঠাকুর, মটরদা এবং আমাদের মেয়েরা বেরিয়ে পড়লাম। দক্ষিণে পাটুলির দিকে যাবার পথেই ঝড় উঠলো। নৌকার মধ্যে আমরা তখন ভয়ে মুষড়ে পড়েছি। ঠাকুরের তখন কি বিকট আনন্দ। আপন মনে বলছেন, "শিব কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের মাথায় উপরই নাচছে, অগ্রদ্বীপে ঝড় নেই।" আমাদের এই কথাটা ঠিক মনের মত লাগলো না। নৌকা প্রচণ্ডভাবে তুলছে। ঠাকুর হঠাৎ মটরদাকে ঠেলে মাঝ গঙ্গায় ফেলে দিলেন। আমরা যত হাঁ-হাঁ ক'রে উঠি ঠাকুর তত হাসেন। ও বেচারা সাঁতার জানতো না কাজেই হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রমে জল খেতে

লাগলো। আমরা বিব্রত বোধ করলাম। মাঝিও ছট্‌ফট্ করতে লাগলো কিন্তু ঠাকুর নির্বিকার। মটরদা যখন ক্রমে তলিয়ে যাবার উপক্রম করছে তখন ঠাকুর দু হাত মেলে ধরলেন এবং মটরদা স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মত নৌকায় উঠে এল। ঠাকুরের মতে এটা সাহসী এবং স্বাবলম্বী হবার দীক্ষা।

এরপর সুরু হ'ল প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রাম পরিক্রমা করে কীর্ত্তন। রাস্তাঘাটে ধূলার মধ্যে অল্পক্ষণ কীর্ত্তনের পরই প্রায়ই হ'ত ভাব সমাধি। প্রেমে মাতোয়ারা নিমাইয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতো ঠাকুরের সারা অবয়বে। এরপর রাত্রে বিভিন্ন বাড়ীতে কীর্ত্তনের আসর বসতো। গ্রামের লোকের সারা বৎসরের মধ্যে এক মাস আনন্দের উৎস ছিল গাজনের মেলা। কিন্তু ঠাকুর প্রেম দিয়ে সবাইকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

একদিন সকালে উঠে কয়েকজন যোগাড়ে ডেকে পশ্চিমের উঠানে দুই মানুষভর গর্ত্ত খুঁড়তে বললেন। সেদিন রাত্রেই যজ্ঞ হবে। বিকালে যজ্ঞের জন্য সব কিছু প্রস্তুত। কাতারে কাতারে নামের দল এসে সমবেত হ'তে লাগলো। ঠিক সন্ধ্যার কিছু আগেই নামলো আকাশ ভেঙ্গে ঝড় আর বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর ঝড় কমে গেল কিন্তু বৃষ্টি কমলো না। ঠাকুরের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে দরজা খুলে বেরিয়ে ঘনমেঘে ঢাকা আকাশের দিকে দেখছেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, "এবার চল যজ্ঞ সুরু হবে, দেখি বেটা বৃষ্টির কত জোর।" যজ্ঞকুণ্ডের চার দিকে জলের উপর আসন পেতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বসলেন। যজ্ঞকুণ্ড বৃষ্টির জলে ভরে গিয়েছে এবং বাইরে অবিরাম বৃষ্টি। যজ্ঞকুণ্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে কুণ্ডের উপর হাত বাড়িয়ে ঠাকুর মন্ত্র বলতে লাগলেন। দুই ঘণ্টা যজ্ঞ হবার পর ব্রাহ্মণেরা শেষ আহুতি দেবার পর দেখতে পেলেন যজ্ঞকুণ্ডে এক ফোঁটাও জল নেই এবং তাদের গায়েও বৃষ্টির জল পড়েনি। ঠাকুরের জামাকাপড়েও বৃষ্টির জলের

চিহ্ন নেই অথচ তখনও বৃষ্টি থামেনি। ঘরে ফিরে এসে চা খাবার পর বললেন, "বৃষ্টির বেশে এসে তুমি আমার যজ্ঞ পণ্ড করতে চেয়েছিলে, এখন হার মানলে তো?" গ্রামবাসীদের মনে এরপর আর সংশয় রইলো না যে গোবিন্দরূপে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

চৈত্রের শেষদিকে ফেরার পালা। ঘাটের ধারে অসংখ্য নরনারী, শিশুর দল। চোখের জলে ভাসছে তাদের মুখ। প্রাণের ঠাকুরকে তারা ছাড়তে পারছেন না। সুখদুঃখের অতীত লীলাময় গোবিন্দ হাসিমাখা মুখে বললেন, "আমি কি তোদের ছেড়ে যাচ্ছি? প্রেম রেখে গেলাম। রোজ কীর্ত্তন করবি, তাহলেই আমি আসবো।"

এরপর একদিন প্রথম এলেন আমাদের বাগবাজারের বাড়ীতে। কীর্ত্তনের বিরাম নেই। সেইবার আমাদের বাড়ী তিন দিন থেকেও গেলেন। রাতে কোনদিন ঘুমাতে দেখিনি। চুপ করে শুয়ে গল্প শুনতেন। একদিন রাতে বাবাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, Out of sight out of mind মানে কি?"—তিনি আবার বললেন এই কথাটার প্রকৃত অর্থ অভিধানে পাওয়া যাবে না কারণ মনে যে একবার বাসা বাঁধে দৃষ্টির অগোচর হলেও তাকে ভোলা যায় না। বিশ্বপ্রেম এমনই জিনিস একবার তার বিকাশ হলে, একবার জীবকে ভালবাসলে আর দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না। এরপরেই That is the question বলে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কাকীমার ছেলেপুলে হ'য়ে বাঁচতো না। একদিন গভীর রাতে তাঁকে কাছে ডেকে বললেন: "মা তোর দুঃখ কি? আমি তো এসেছি। দেখি কে তোর কোল থেকে সন্তান কেড়ে নেয়?" এরপর অবশ্য কাকীমার তিনটি সন্তান হয়েছে এবং সবাই সুস্থভাবে জীবিত আছে। প্রায়ই আমাদের জানাতেন একটি সুন্দর আশ্রমের কথা যেখানে থাকবে আতুরের সেবা। ধনী,

দরিদ্র, জাতি নির্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ এবং ভজন, কীর্ত্তন। এই ছিল তাঁর স্বপ্ন এবং সাধনা—কিন্তু এই বিরাট পুরুষের বিরাট অন্তর্নিহিত আশা একদিন বাস্তবে রূপ পেল। ১৯৩৭ সালে শ্রীগোবিন্দ গড়ে. তুললেন তাঁর সাধনার লীলাভূমি হাওড়া জেলার বাক্‌সাড়া গ্রামে "কেদার কাননে" তাঁর আশ্রম।

১৯৪৩ সালে পার্ক ষ্ট্রীটের শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে শরণ লন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

একবার আমার এক বান্ধবীর ছেলের খুব খারাপ ধরনের জণ্ডিস্ (ন্যাবা) হয়েছিল। সমস্ত দেহ, চোখ ও নখ থেকে সর্ব্বাঙ্গ হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই কমছিল না এবং ঐ সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর। আমার বান্ধবী আমারই বাড়ীতে ভাড়া ছিল এবং সাধুবাবাকে বহুবার দেখেছে এবং কয়েকবার তাহাকে আশ্রমেও লইয়া গিয়াছি। সে আমাকে ঠাকুরকে এনে ছেলেকে দেখাবার জন্য অনুরোধ করে। বাবা তখন বিডন ষ্ট্রীটে দেবেদের বাড়ী রয়েছেন। বান্ধবীর অনুরোধে বাবাকে আনবার জন্য গেলাম এবং গিয়ে তাঁকে সব বললাম। শুনে তিনি একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "বড়ই খারাপ অবস্থা, কিন্তু আজ তো আমি যেতে পারব না। আমি কাল যাব, আজ তুই গিয়ে তার মাথায়, গায়ে, পেটে, হাত বুলিয়ে দিগে যা।" আমি তো অবাক্। বললাম, "আমি দেব?" উনি বললেন, "হ্যাঁ, তুই দিলেই হবে। আজ আমি কিছুতেই যেতে পারছি না।" বেশ বুঝলাম যে উনি যাচ্ছেন না। ভাবলাম—যাই হোক, আমার কি? আমি তো তাঁর কথামত করছি। ফলাফল যা কিছু ওঁর আর ছেলের মায়ের কপাল—এই মনে করে চলে এলাম। আসার সময় বলে দিলেন, "গিয়ে আর কোথাও ঢুকবি না সোজা ওপরে উঠেই

ঐ ঘরে চলে যাবি।" আদেশ শিরোধার্য্য করে চলে এলাম। আসতে আসতে গাড়ীতে অতি সন্তর্পণে হাতকে যেন কোলে করে নিয়ে এলাম কারণ তাঁর চরণধূলি নিয়ে এসেছি। বাড়ী পৌঁছে সর্ব্বপ্রথম নিজের ঘরে না গিয়ে বান্ধবীর ঘরে এসে তার ছেলের মাথায়, গায়ে, পেটে, হাত বুলিয়ে দিলাম। মনে মনে বললাম, "ঠাকুর তোমার কথার দাম তুমিই রাখবে।" কিন্তু আশ্চর্য্য! রাত্রির নটার মধ্যে জ্বর ১০৩° থেকে ১০১°এ নেমে গেল যেখানে গত কয়দিন একদম কমেনি। মুখের চেহারা বদলে গেল। ছেলে চোখ চেয়ে পরিষ্কার দৃষ্টিতে তাকাল। পরদিন সকালবেলা হলুদ রং অর্দ্ধেক কমে গেছে। জ্বর ৯৯°। উনি নিজের কথামত বিকাল বেলা এলেন এবং বললেন, "এই তো অর্দ্ধেক সেরে গেছে।" ক্রমে ক্রমে সত্যই ছেলে সেরে গেল।

আর একবার ঠাকুর এসে কয়েকদিন রয়েছেন আমার বাড়ীতে। আমার সেই বান্ধবী ক্যামেরা নিয়ে ঠাকুরের ফটো তুলতে এলো। খাটে তিনি বসে আছেন। বান্ধবী এসে বলল, "আপনার ফটো তুলব।" বাবা আমাকে কাছে ডেকে গলা জড়িয়ে বললেন, "নে, তোল্ ফটো।" সে কেবলি বলে, "আপনাকে একা ছবি নেব।" ঠাকুর বলছেন, "না বাপু, আমি এখন মায়ের কাছে আছি। মাকে ছেড়ে আমি ছবি তুলব না।" সেও ছাড়বে না, জোর করছে একা ছবি নেবে বলে। শেষে ঠাকুর বললেন, "তুলবি তো নে, একটা ছবিও উঠবে না।" সে মানল না। বারান্দায় দাঁড় করিয়ে ভালো আলোর সুমুখে ছবি তুললো। আশ্চর্য্য ফিল্মের সব ছবি উঠ্লো; ঘরের ভেতরে তোলা অন্য ছবি উঠ্লো কেবল ঠাকুরের তিনটি ছবি একবারে ধব্ধবে সাদা, কোন রেখা পর্য্যন্ত পড়েনি।

১৯৪৭ সাল। ঠাকুর তখন গিরিজাবাবুর অসুস্থতার দরুন কুষ্টিয়াতে

আছেন। আমি মনোময়কে নিয়ে আমার এক পুত্রের বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য কুষ্টিয়া রওনা হয়ে গেলাম। বাড়ীতে পৌঁছুতে ১১৷৷৹টা বেজে গেছে। গিরিজাবাবুর অট্টালিকায় এসে রিক্সা থেকে নামলাম। ভেতরে যেতেই মাসীমা (গিরিজাবাবুর স্ত্রী লীলাময়ী দেবী) সাগ্রহে বল্লেন, "ও! তাই বাবা এখনও ভোগ গ্রহণ করছেন না। কখন ১১টায় খাওয়া হয়ে যায়। আজ সাড়ে এগারোটা বেজে গেল এখনও বলছেন আর একটু পরে আর একটু পরে" বলে আমাকে বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বাবাকে গিয়ে প্রণাম করতেই সযত্নে আমায় পাশে বসালেন এবং মাসীমাকে বললেন, "মা, ভোগ যদি হয়ে গিয়ে থাকে আমায় দিয়ে দে।" মাসীমা হাসিমুখে শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর নানাবিধ ব্যঞ্জন ও দই, ক্ষীর, মিষ্টি পরিপূর্ণ পাথরের থালায় অন্ন এনে দিলেন। বাবা মনোময়কেও খেতে দিতে বললেন এবং মাসীমাকে বললেন, "কেন খাই নাই এখন দেখলি ত?"

১৯৫০ সাল নাগাদ সি, রিঙ্গার কোম্পানীর হোমিও ডাক্তার সুশীল রায়ের বৃদ্ধা জননী ইন্দুমতী দেবী বালীগঞ্জ ব্যাঙ্কের শ্রীনিমাইচরণ মৈত্রের বাটী গিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে নামদীক্ষা ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ঠাকুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "দিদিমা, কিরকম দীক্ষা নিবি? কানে দিলাম ফিস্ ফিস্ আর মাঝে মাঝে কিছু দিস্—এই রকম দীক্ষা?" তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অন্নকূটের দিন আশ্রমে আসিস, দিদিমা।"

অন্নকূটের দিন আশ্রমে আসিতে ঠাকুর সুশীলবাবুকে ধমকাইয়া বলিলেন, "কিরে, দিদিমাকে কিছু না খাওইয়া আনিয়াছিস কেন? দিদিমার কিছু খাওয়া হয় নাই।" তাহার পর দিদিমাকে হতবাক করিয়া বলিলেন, "যাগো, দিদিমা, পেট ভরে খেয়ে নেগে যা।

তারপর দীক্ষা দোব।" দিদিমা সারাজীবন জানিয়া আসিয়াছেন যে দীক্ষা লইতে গেলে উপবাস করিতে হয়। সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় সুশীলবাবু বৃদ্ধা জননীকে বারংবার খাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপবাস অবস্থায় দীক্ষা লইবেন মনে করিয়া অভুক্ত হইয়া আশ্রমে আসেন। এখন অগত্যায় পেট ভরিয়া প্রসাদ খাইয়া 'দিদিমা' ঠাকুরের চৌকির পাশে পায়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে গান থামাইয়া অন্তর্যামী নারায়ণ বলিলেন, "দিদিমা, তোকে কাল রাত্রে যে মন্তরটা দিয়াছি সেই মন্তরটা তুই আমার কানে কানে বল্‌ত। তুইই আমার কানে মন্তরটা দে।" সকলে শুনিয়া অবাক। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করিয়া দিদিমা ঠাকুরের কানে কি বলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এইত বেশ বলেছিস। মনে আছেও দেখিতেছি। আমার কানে তুই মন্তরটা ত ঠিক বলেছিস।" দিদিমা পূর্বরাত্রে স্বপ্নে ঠাকুর-এর নিকট হইতে নাম পাইয়াছিলেন। উহাই তিনি শ্রীশ্রীগোবিন্দকে জানাইয়া দিলেন। আসরস্থ সকলে বাকরুদ্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। এমনই ছিল অন্তর্যামী গোবিন্দর লীলা মাহাত্ম্য ও বিভূতি। পূর্বরাত্রে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া পরের দিন তাহার পরীক্ষা লইতেছেন। এইরূপ লীলা তিনি নিত্যই করিতেন।

প্রতি ভক্তের সহিত তিনি অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত লীলা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক ভক্তই তাহার সাক্ষী দিবে।

চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের পুত্রবধূ শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মৈত্র বলেন, "তিনি আমাদের কাছে ভগবান ছিলেন। তাঁকে যখনই আমরা মনে মনে ডেকেছি তখনই তিনি সশরীরে গিয়াছেন। একবার নয়, দুইবার নয়, বহু বহু বার। তিনি ভগবান ছাড়া কি ছিলেন? জ্যান্ত ভগবান ছিলেন। ভগবানকে ডাকলে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁকে ডাকলে আমরা পেতাম। বিপদে আপদে ঠিক এসে গেছেন।"

টালার শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীশংকরনাথের সহিত বাক্‌সাড়ার শ্রীমতী গৌরীর শুভ-পরিণয় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং কন্যা-সম্প্রদানকারী হইয়া সম্পন্ন করেন। ঠাকুর তাঁহার শিষ্যভক্তমণ্ডলীর ভিতর বিবাহসূত্রে একে অপরের সহিত বাঁধিয়া দিতে ভালো-বাসিতেন। সানন্দে ঘটকের কাজ করিতেন। এ ত' সামান্য ঘটক নয়—স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাঁহাব বৈবাহিক আদেশ কাহারও অমান্য করিবার সাধ্য ছিল না। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী কন্যার সহিত শ্রীনিমাই চরণ মৈত্রের ভ্রাতার বিবাহ প্রভৃতি প্রায় তিরিশ চল্লিশটি বিবাহ তিনি মুখে মুখে স্থির করিয়া গিয়াছেন। তিনি পণপ্রথা পছন্দ করিতেন না। গিরিজাবাবু, তাঁহার পত্নী, পুত্রগণ ও পুত্রবধূ ও কন্যাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। মোহিনী মিলের চক্রবর্ত্তী পরিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের এক প্রধান রসদ্‌দার ছিলেন। তাঁহাদের সুমধুর ব্যবহারে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া ওঠেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (কানুদা) আশ্রমে O. Y. T. Schemeএ টেলিফোনের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মেজো ভ্রাতা শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (বলাইদা) ও মেজ মা, সেজো ভ্রাতা প্রাক্তন শেরিফ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (গেঁদুদা) ও সেজো মা ও পুত্র রঞ্জন, পরের ভ্রাতা শ্রীচণ্ডিপ্রসাদ (হাঁদুদা) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীউমাপ্রসাদ (নিমাইদা) আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা ও ঠাকুরের সেবা করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। সর্বোপরি তাঁহাদের রত্নগর্ভা জগদ্ধাত্রী-প্রতিম লীলাময়ী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসানের পর আশ্রমের সুখে দুঃখে সর্ববিষয়ে উপদেশ, নির্দেশ ও সাহায্য দিয়া গুরুভক্তির নিদর্শন রাখিয়াছিলেন। অবতারের নিত্য লীলার রসদ্‌দার ছিলেন। যখন একত্রে বিজয়নগরের মহারাণী ললিতা দেবী, কুষ্টিয়ার মা, লীলাময়ী দেবী ও শ্রীপশুপতিনাথ দেবের পত্নী সুষমা দেবী শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার ভার

লইতেন তখন সকলে মহাশক্তির আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। দশদিক ভরিয়া যাইত। তাঁহাদের নিকট ঠাকুর যেন একেবারে শিশু বালকের মত হইয়া যাইতেন।

দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং কয় বৎসর গিরিজাবাবু তাঁহার মিল হইতে বেল-বেল বস্ত্র ঠাকুরের হাত দিয়া বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যখন অন্নপূর্ণা কটন মিল চালু হয় তাঁহারা ঠাকুরের নামে প্রথম কয়টি শেয়ার উৎসর্গ করিয়া একটি বস্ত্রে 'গীতগোবিন্দ' ছবি ছাপাইয়া শ্রীগুরুগোবিন্দের নামপ্রচার ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রাখেন। উহা বাজারে বর্ত্তমানে চালু আছে।

প্রখ্যাত লাহাবংশের শ্রীনিতাই চরণ লাহা ঠাকুরের এক রসিক শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে স্বয়ং বিষ্ণু অবতার জ্ঞানে সাষ্টাঙ্গ করিতেন। তিনি হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকিতেন ও ভক্তদের উচ্ছিষ্ট চায়ের গ্লাস ধুইতে ও পাতা ফেলিতে যাইতেন। তিনিও ঠাকুরের এক রসদ্‌দার ছিলেন। তিনি তাঁহার বিরাট হলুদ রঙের গাড়ি করিয়া কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের প্রাসাদ হইতে এক পাল ছেলে মেয়ে লইয়া প্রায়ই আশ্রমে আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইতেন। সঙ্গে অসময়ের আনাজ তরি-তরকারী ফল মিষ্টি লইয়া আসিতেন। শ্রীবিমলাচরণ লাহাও তাঁহার নিকট আসিতেন।

তিনি বলিতেন যে, "গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে যদি গো-সেবা ঠিক ঠিক হইতে থাকে, গৃহে গৃহে গো-ধনের বর্দ্ধন ঠিক ঠিক হয় তাহা হইলেই ভারত খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। দুধে, ঘিয়ে, দইয়ে, ননীতে, দেশকে ভাসাইয়া দাও। গরুর দীর্ঘশ্বাসে শস্যহানি, অজন্মা ও দুগ্ধহীনতা দেশকে দুর্বল করিবে।" তিনি গরুর চামড়ার ব্যবহার পছন্দ করিতেন না।

তিনি গো-সেবার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। এক বৎসর আশ্রমে একটি গাভী প্রসব হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর

সেই সময় কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি কীর্ত্তন হইতে উঠিয়া "দেখি, দেখি," বলিয়া তুলসীদাসের হাত হইতে বৎসটি লইয়া দেখিয়া বলিলেন, "ইহা কপিলা—ইহা সব সময়ই দুধ দিবে।" আশ্চর্য্য! গাভীটি যখন বড় হইল উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সবই অন্য গাভী হইতে একেবারেই পৃথক! দশটি গাভীর মধ্যে উহা দেখিলেই বুঝা যাইত যে উহার বিশেষ গুণ আছে। একটি বিশেষ শ্রী ও আভা গাভীটির চারিপার্শ্বে বিরাজ করিত। গাভীটির শরীর বিশেষভাবে মসৃণ ছিল এবং বৎসরের অসময়েও উহা আমাদের কম করিয়া হইলেও একপোয়া দুধ দিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন দেখিয়া আমরা দিনের পর দিন বিস্ময়াবিভূত হইয়া পড়িতাম। গো-সেবার পুরা ভার তুলসী মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল এবং বৎসরের পর বৎসর আদর্শ আশ্রমবাসীরূপে সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিত। ঠাকুর যাহা ভালোবাসিতেন, যেমন গোসেবা, তুলসী তাহা স্বহস্তে করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও ভালোবাসাকে সেবা করিয়াছে।

আশ্রমের রান্নার কাজ তুলসীর হাতেই ন্যস্ত ছিল। পূজার কাজ আমার হাতে। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের দর্শন করাইয়াছেন। তাঁহার কৃপা আমাদের সর্বকার্য্যে, সর্বঅস্তিত্বে, সর্বমুহূর্ত্তে আমরা নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছি এবং তিনি এখনও আমাদের উৎসবের সময় আবির্ভূত হইয়া আমাদের আরতি, পূজা গ্রহণ করিয়া চলিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ধ্রুপদ গায়ক শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত গানটি রচনা করেন এবং প্রতি রবিবার ধ্রুপদ গানের আসরের পূর্বে গানটি গীত হয়—

শ্রীশ্রীগুরু গোবিন্দ বন্দনা

যোগীরাজ যোগী প্রবর
পরম বৈষ্ণব দ্বিজ কুলমনি
সিদ্ধ সাধক গুরু গোবিন্দ
চরণ যুগল অর্চয়ামী।
লভিলে সিদ্ধি সমাধি শক্তি
শিখাইলে সেবা প্রেম ও ভকতি
হরি হরি বলে হরি নামে দীক্ষা দিলে
তরাইতে পাপী তাপী অধোগামী॥
বসি পদ্মাসনে প্রসন্ন আননে
প্রেম ও তুলসী সেবিত চন্দনে
কল্পতরু হ'য়ে দিলে সর্বজনে
শান্তি আশীর বাণী॥
শঙ্খ ঘণ্টা তানপুরা করতাল
মৃদঙ্গ ঝাঁঝর শ্রীখোল দেয় তাল
হরি হরি বোলে নৃত্যে মাতাল
এক হ'য়ে হরি নাম ও নামী॥

গানের এতই Current হইত যে আসরস্থ সকলে আবিষ্ট হইয়া যাইত—কাহারও সমাধি হইয়া যাইত—ঠাকুরের সহিত চোখে-চোখে সমাধি হইয়া যাইত। Current এর চোটে ইলেকট্রিক দপ করিয়া নিভিয়া যাইত, ফ্যান বন্ধ হইয়া যাইত। কোথা হইতে নীল, সাদা, লাল তেজঃপুঞ্জ বলের ন্যায় অন্ধকার হইতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া আসরে নিঃশব্দে ফাটিয়া পড়িত। এক জ্যোতির্ময়ে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। দুই তিন চার পাঁচ জনে ধরাশায়ী হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ফুলে কেঁপে দুইগুণ, তিনগুণ, চারিগুণ আকার ধারণ করিতেন—দক্ষিণ বাহু মুদ্রাকারে উত্থিত হইত—দরবিগলিত রক্তনেত্র অচঞ্চল হইয়া কোথাও স্থির হইয়া

পড়িত, নাক মুখ দিয়া গাঁজলা বাহির হইত—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কখনও শ্রীঅনাথনাথ বসু "রাধে কৃষ্ণ বোল রাধে কৃষ্ণ বোল" বলিয়া গাহিয়া চলিয়াছেন। কখনও শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও সারেংগীবাদক ছোটে খাঁ, কখনও শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট গায়কগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমাহিত করিবার জন্য তৈয়ার হইয়া গান বাজনায় বসিবামাত্র ঠাকুর আমার সমাহিত। গায়কগণও যেন তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া আত্মোৎসর্গের মনোভাবে সর্বান্তর দিয়া গান গাহিতেন। ঠাকুর তান দিতে দিতে চড়ায় সপ্তমের পারে চলিয়া যাইতেন—তখন হারমোনিয়াম বাদক হারমোনিয়াম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিতেন এবং হয়ত তখন দপ করিয়া আলো সব নিভিয়া গিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। খাদেও তদ্রূপ হারমোনিয়ামের রীড হার মানিয়া যাইত। হারমোনিয়াম তাঁহার নিকট হার মানিয়া বসিয়া থাকিত। যোগেশ্বর হরি সমাধিরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া হয়ত ঘণ্টাখানেক পরে পুনরায় গানের মাঝে ফিরিয়া আসিলেন। গানের সময় টুঁ শব্দ করিবার হুকুম কাহারও ছিল না।

কাজী নজরুল বহুবার ঠাকুরকে গান শোনাইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট সাধক বলিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ ভক্তের ইচ্ছাধীন ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন মানুষ আমাদের মধ্যে এমন সহজভাবে লীলা করিয়া যাইবেন তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি নাই। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার তীক্ষ্ণ নজর সকলে লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইত। ভণ্ডামী তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার অন্তর যেমন ছিল বাহিরও তদ্রূপ ছিল। লোকের সাধ্য কি উহার তল পায়? সাধারণ লোকে সব সময় দ্বিধাগ্রস্ত, লোকভয়ে সন্ত্রস্ত, সম্মান-অসম্মানের দোলায় দোদুল্যমান। তিনি ছিলেন স্থির, দৃঢ়, স্বচ্ছ, উন্মুক্ত, বিরাট ও দ্বিধাহীন। তাই সকলকেই আপন করিয়া লইতে

তাঁহার এক মুহূর্ত্ত লাগিত। তাঁহার "মা" ডাক যেই শুনিয়াছে সেই মাতৃ-হৃদয় বাৎসল্যরসে, অপত্যস্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তাঁহার "বাবা" ডাকে কঠিন পিতৃ-হৃদয়ও মুহূর্ত্তে পুত্রস্নেহে সঞ্জীবিত ও পুলকিত হইয়া উঠিত।

গঙ্গাসাগর স্নানের সময় বাংলাদেশে হাজার হাজার সাধু, সন্ন্যাসীর আগমন হয়। কোনও কোনও বৎসর হঠাৎ পঞ্চাশ-ষাট জন সাধু আসিয়া আশ্রমে আসিয়া হাজির হইতেন। কি করিয়া বা কোথা হইতে যে তাঁহারা সংবাদ পাইতেন যে এই স্থানে পরমহংসদেব বাস করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানিতেন। তাঁহাদের আসিবার সময়ের স্থিরতা থাকিত না। তাঁহারা আসিয়াই ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন এবং যেন কত আপনজন এইরূপে কথাবার্ত্তা ও ভাববিনিময় করিতেন। সাধারণতঃ তাঁহারা মকর সংক্রান্তির পরে সাগর-স্নান সারিয়া আশ্রমে পদার্পণ করিতেন।

পৌষ সংক্রান্তিতে আশ্রমে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। একবার তাঁহারা আশ্রমের জন্মোৎসবান্তে দুপুরে ভোজনপর্বের পর হঠাৎ আশ্রমে আসিয়া হাজির। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাঁহাদের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন এমনভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং অন্ন চাপাইতে বলিয়া কি ডাল-তরকারী ভোজনপর্বের পরে উদ্বৃত্ত আছে উহা জানিতে চাহিলেন। অতি সামান্য ডাল-তরকারী যাহা উদ্বৃত্ত ছিল উহা তাঁহাকে দেখানো হইলে তিনি ঐগুলি তাঁহার খাটের তলায় কাপড় চাপা দিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হইল যে কেহ কিছুই ধরিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ঠাকুর বলিলেন, "তোমাদের পরিবেশন করিতে হইবে না। আমিই পরিবেশন করিব।" কেহ কেহ উদ্বৃত্ত ডাল-তরকারীর পরিমাণ দেখিয়া হাসিয়া লজ্জায় ও আশংকায় ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইল। উহারা ভাবিয়াই পাইল না যে ঐটুকু ডাল ও তরকারী দিয়া ঠাকুর কি করিয়া

পঞ্চাশ-ষাটজন সাধুকে পরিবেশন করিবে। দীনবন্ধু মধুসূদন গোবিন্দ সেদিন ঐটুকু প্রসাদে সাধুবৃন্দকে পেট ভরিয়া পরম তৃপ্তিতে খাওয়াইলেন এবং পরিবেশনের পরে সকলে দেখিল তখনও একটু ডাল ও তরকারী বালতি ও হাঁড়িতে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি এইরূপে নিত্যলীলা করিতেন।

যদি কখনও অস্বাভাবিক ভক্তসমাগম হইত তখন দেখা যাইত হঠাৎ কোথা হইতে ঝোড়া ভর্ত্তি করিয়া ফল, মিষ্টি, আনাজ, তরি-তরকারী আসিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যদি কখনও পূজায় ফুলের ঘাটতি দেখা যাইত হঠাৎ কোথা হইতে ঝোড়া ঝোড়া ফুল, মালা, বিল্বপত্র, তুলসী আসিয়া পড়িত। ইহা কতই যে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা বর্ণনা করিয়া শেস করা যাইবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর আশ্রম হইতে 'আবির্ভাব' ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইত। এই পত্রিকায় ঠাকুরের সহিত তাঁহার ভক্তের কথোপকথন প্রকাশ হইয়াছিল। উহা লিপিবদ্ধ করিলাম—

সাধুবাবা, কিছুদিন আগে বলেছিলেন: আশ্রমের (অর্থাৎ বাক্‌সাড়া আশ্রমের) উদ্দেশ্য সহজে সাধারণে ধরিতে পারে না—আর পারে না বলেই কেহ-ই উহার সম্বন্ধে কোন যত্নই নেয় না।—না নিলেও আমিই করবো, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

ভক্ত—আমাদের এই আশ্রমের উদ্দেশ্য কি ?

বাবা—এর উদ্দেশ্য বর্ণাশ্রম স্থাপন করা ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, বালকাশ্রম ও গোশালা গঠন করা। আর নিজে অক্ষত ব্রহ্মচারী না হলে কি কেউ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপন করতে পারে ?

ভক্ত—বাবা, 'অবধূত' মানে কি ?

বাবা—যার ইচ্ছা স্বাধীন, পরবস নয়, যিনি স্বতন্ত্র পুরুষ—

তিনিই অবধূত। আমার ছয়মাস বয়সে যখন অন্নপ্রাশন হয় তখন হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে নিমন্ত্রিত সব ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণ করি। আমার এই বয়স থেকেই সব কথাই মনে আছে।

ভক্ত—আপনি কি জাতিস্মর?

বাবা—জাতিস্মরের তো তিন জন্মের কথা মনে থাকে—আমি বহু জন্মের কথা জানি। আমি স্বয়ম্ভু। আমার বাল্যকালে এখানে (বেড়ো) অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসতেন, আমি তাদের পরীক্ষা করতাম—দেখতাম প্রায় সকলেই সংসারের অশান্তিতে বা পেটের জন্য সাধু সেজেছেন। পরে সন্ন্যাসের পর পরিব্রাজক অবস্থায় দেখতাম ঐ প্রায় একই রকম কারণে সকলে সাধু সেজেছে—যথার্থ ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধু হয়নি, শুধু কৈলাস পরিক্রমার সময় একজনকে দেখেছিলাম। তিনি বাঙ্গালী। তিনি যথার্থ সিদ্ধ পুরুষ।

ভক্ত—কিন্তু আমাদের তো সাধুকে পরীক্ষার চিন্তা করাও সাজে না, কারণ সাধারণতঃ আমাদের গত বা অনাগত সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি নেই। আমাদের তাঁদেরকে সাধ্যমত সেবা করা ও সঙ্গ করে হিতোপদেশ সংগ্রহ করে সেইমত চলতে চেষ্টা করাই এক-মাত্র করণীয় কর্ত্তব্য! আচ্ছা বাবা, পরিব্রাজক সময়ে কিরকম অবস্থা ছিল?

বাবা—তখন কি আর দেহাত্মবুদ্ধি ছিল? বনজঙ্গল সব কি কিছু মনে হয়? নদী দেখলেই ঝাঁপ দিয়েই এক নিমেষে পার হয়ে যেতাম। কি একটা যেন পেয়ে সদা সর্ব্বদাই আনন্দে ভাসতে থাকতাম। বড় বড় চুল, জটা, নখ—বাঁদরেরা এসে চুল ঘাঁটত।

ভক্ত—আপনার প্রথম সিদ্ধিলাভ কোথায়?

বাবা—এইখানেই (অর্থাৎ বেড়াতেই)। চারিদিকের পাহাড়ে এগারোটি পঞ্চবটী আছে। প্রথম জীবনে এই সব পঞ্চবটীতে

ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। এক পঞ্চবটীতে ধ্যানস্থ হয়ে আছি, এক পাথর এসে কোলে পড়ল, হাঁটু জখম হয়ে গেল,—অপরূপ বালিকা মূর্ত্তিতে শ্রীমহালক্ষ্মী দর্শন দিয়ে সেই পাথরখানি তুলে দিলেন। এই আমার প্রথম দর্শন।

ভক্ত—আপনার ঐ সিদ্ধি লাভের আসনটি কোথায় আর কেনই বা হাঁটু জখম করলেন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে?

বাবা—জায়গার নাম 'ইসরার কোংরা' বা 'ধোপা পাহাড়'। পঞ্চবটীটি এখন নাই। হাঁটু জখম করলেন ৬/৭ মাস বাড়ীতে থেকে তাঁর উপাসনা করতে হবে বলে। আর দর্শন দিয়ে বল্লেন—'আমি তোর মেয়ে হয়ে আসছি।' এই সময়েই তোমাদের এই মা (শৃঙ্গারী আম্মা) আমার খুব সেবা করেছিলেন আর তাঁর মেয়ে হয়ে এলেন জগদ্ধাত্রী। এ রকম যোগাযোগেই ওর (আমাদের সীতারি) বিয়ে হল, ছেলে হ'ল পরে আবার সব ধুয়ে মুছে গেল।

ভক্ত—আপনার সন্ন্যাস কোথায় হ'ল?

বাবা—শ্রীরঙ্গমে আমার সন্ন্যাস হয়। তারপর কত যে ঘুরেছি তা আর কত বলব। নর্ম্মদায় আমার বালানন্দের সঙ্গে দেখা হয়।

ভক্ত—শুনেছি নর্ম্মদায় আপনার এক আসন আছে, সেখানে আপনার সাধন অঙ্গের কোন এক অঙ্গের সিদ্ধিলাভ হয়।

বাবা—হাঁ, আছে।

ভক্ত—সে জায়গাটি কোথায় ও কি তার নাম?

বাবা—ওসব কথা সবাইকে এখন বলবার উপায় নেই বা জিজ্ঞাসাও করতে নেই। এসব যাদের জন্য তাদের বলতে পারি। এতে তোমাদের অধিকার নেই। আর একবার হিমালয়ে উঠেছি, প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পা বরফে বসে যাচ্ছে, সঙ্গে দণ্ডও নেই, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলাম। সেখান থেকে পড়ে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অজ্ঞান হোয়েই বোধহয় পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি

পালকের উপর পড়ে আছি। আর দেখি এক জীর্ণ কলেবর মহাপুরুষ বসে আছেন। তিনি বল্লেন ভালই হয়েছে—তুমি এসেছো আমারও দেহের তুমি সৎকার করো। এই বলে তিনি যোগবলে এমন একটা শক্তি সঞ্চার করে গেলেন—যা তোমাদের বলা যায় না—বিশেষ করে এখন বলব না। তারপর ঘুরতে ঘুরতে সর্বশেষে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসি—তখন আমি হনুমান ভাবে আছি। দক্ষিণেশ্বরে আসতেই বকুল গাছ ভেঙ্গে পড়লো ও রামকৃষ্ণের ছবিটি ভেঙ্গে পড়লো। পঞ্চবটীর পাশের গাছের উপর আমি কিছুদিন ছিলাম। তারপর বালীতে গেলাম। বালীর সাধনমার বাড়ীতে আমার তন্ত্রাসন আছে। গুল্‌টুবাবার বাড়ীতে (বাগবাজার, কলিকাতা) আমার সাধন শেষের বর্হিবাস ও কৌপিন পুঁটুলি বাঁধা আছে। ঘুরতে ঘুরতে কত যে পাথরে ও পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা লিপি লেখা দেখেছি।

ভক্ত—যে স্বতন্ত্র পুরুষ তার আবার সাধনার কি দরকার?

বাবা—তা বললে চলবে না। এই পথের নিয়ম বা ধারা পালন করে চলতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র আদি সকলকেই তা সম্যকরূপে পালন করতে হয়েছে। কি শক্তিবান পুরুষ তারা?

ভক্ত—কেন করতে হয়? তবে কি লোকশিক্ষার জন্য?

বাবা—হাঁ, তা নয়তো কি? আরও কারণ আছে।

ভক্ত—আপনার ঐ উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করার জন্য কর্ম্মীরা কোথায়, কবে শুরু হবে?

বাবা—শুরু ত হ'য়ে গেছে। তোমাদের সকলকেই ত' করতে বলছি, কেউ গা করে না। না করলে আমিই করে যাব। এ সব যুদ্ধ যা হয়ে গেল ও হবে তা কে করছে?

ভক্ত—বলতে গেলে বলতে হয় সৈন্যদের মাধ্যমে এক দেশের বা জাতীর বিপক্ষে আর একদল সৈন্যদের মাধ্যমে আর এক দেশ বা জাতি।

বাবা—তাই কি? যে করবার সে করছে। সে যে কল্কীরূপে এসে গেছে, তাই এ ধ্বংস লীলা! সে কারো কথা শুনেও না শুনবেও না, সে নিজের ইচ্ছামত নিজের উদ্দেশ্য সাধনের কাজ করে যাবে। দেখনা দেবী শক্তির প্রভাব কি? অন্যান্য মহাপুরুষদের দেহান্তে প্রচার বা অন্যান্য কর্ম্ম হয়েছে। আমি বেঁচে থাকতেই জগৎকে দেখিয়ে দিয়ে যাব। আমার এই আধারেই একাধারে শঙ্কর, চৈতন্য ও রামানুজ। আমি গুরুর গুরু।

ভক্ত—কতদিন এ ধ্বংস লীলা চলবে?

বাবা—২৯ বছর যুদ্ধ হয়েছে এখনও ২১ বছরের যুদ্ধ বাকী আছে। তারপর শান্তি বা সত্যযুগ পড়বে। কলিযুগের শুরু থেকে এই প্রথম ১৬ হাজার বছর গেল। এই ১৬ হাজার বছরের চার সমান ভাগে চার হাজার বছর করে প্রত্যেক ভাগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ভাবাপন্ন ভাব আকাশে বাতাসে প্রবাহিত থাকে ও থাকবে। কলির শেষে এই যুদ্ধ। ৬০ বছরের যুদ্ধের পর শান্তি। ধর্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কলির দ্বিতীয় সত্যযুগের আরম্ভ।

ভক্ত—আপনার এইসব কর্মের কর্ম্মী কোথায় বা কাহারা?

বাবা—তোমরা করলেও করতে পার। কেন পারবে না? তোমাদের স্বাস্থ্য ও বল ও বিশ্বাস আছে, আশ্রমের দাদুর ত' তাও ছিল না। সে পারলো কি করে?

ভক্ত—আমি ত অনেকবার বলেছি আমরা অশেষ ক্ষুদ্র লোক। আমাদের দ্বারা কোন মহৎ কাজ বা নিঃস্বার্থ কাজ সম্ভব নয়। আচ্ছা, আমাদের মতন লোককে কেন আপনি আশ্রয় দিলেন।

বাবা—নইলে যে তোমরা মরে যেতে।

ভক্ত—মরে যেতাম তো যেতাম। আমাদের দ্বারা যদি দেশের বা দশের উপকারই হল না ত কি হোল? এমনকি নিজের উপকার বা ভগবান লাভও মনে হয়.আমাদের মতন লোকের দ্বারা সম্ভব নয়।

বাবা—কেন হবে না? আত্মবলে বলীয়ান হ'লে—নিষ্ঠায়

প্রতিষ্ঠিত হলে গুরুকৃপায় সবই হয়। চাই একটু নিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস— সদ্‌গুরু সবই করিয়ে বা করে নেন। তোদের ভাবনা কি? মাভৈঃ॥

অরুণদার একটি চিঠি পাঠ করিলে শ্রীশ্রীসাধুবাবার ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের পাটনায় তাঁহার লীলা জানিতে পারি।

c/o New Pintu Hotel
Station Road
Patna
বুধবার ২৯. ১. ৪৭

স্নেহের রবি,

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে ৭৷২০ মিনিট (Bengal Time) আমরা ২ জনে শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত এখানে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

……এবৎসর সরস্বতী পূজা এইখানেই হইল; সে এক অভিনব ব্যাপার। এখানে সাধুবাবা যে ঘরে শুইতেছেন সে ঘরে শ্রীকৃষ্ণের একখানি মুরলীধারী মূর্ত্তি ছিল; সেই পটের মূর্ত্তিকেই তিনি সরস্বতী মায়ী বলিয়া পূজা করিলেন এবং সেই মুর্ত্তিই এখনও পর্য্যন্ত নিত্য পূজিত হইতেছে। জটাধারী খুব মনের আনন্দে আছে এবং একান্তভাবে সাধুবাবার সেবা করিতেছে। বিডন ষ্ট্রীট হইতে লালুদার পত্র পাইলাম তাহাতে বড়মা (শোভা মার) অসুস্থতা সংবাদ শুনিলাম।……………………ইতি তোমাদের অরুণদা।

১৯৪৭ সালে বিজয়নগরের অম্মডু আম্মাকে লিখিত পত্র হইতে সেই সময়কার আশ্রমের নির্মাণ কার্য্যের দরুন কিরূপে ধীরে ধীরে আশ্রম-প্রাঙ্গণের পরিবর্ত্তনের রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। কেদার কানন

পূজনীয় অম্মড়ু আম্মা,

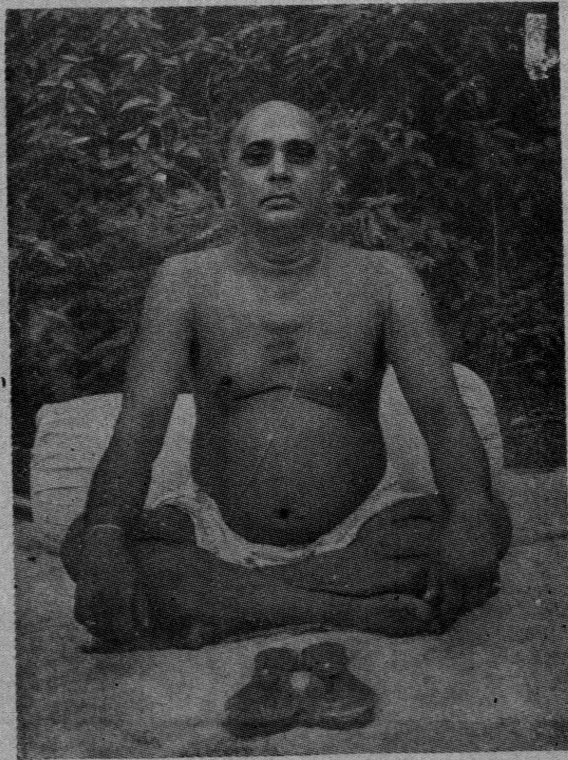
ইহার আগে আপনার দেওয়া সমস্ত পত্রই আমরা পাইয়াছি কিন্তু চিঠি লিখিবার অবসর পাইতেছি না। আপনারা বোধহয় চিঠি মারফৎ নিশ্চয় শুনিয়াছেন যে আশ্রমের ঘরদ্বোরগুলির পুনর উদ্ধার হইতেছে। পিছন দিকের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকিবে যে শ্রীশ্রী৺মায়ের টিনের ঠাকুর-ঘরের পিছন দিকে একটি বড় বেদী ছিল এবং একটি কূর্মকুণ্ড ছিল। উপস্থিত সেই বেদী ও কূর্মকুণ্ডটিকে লইয়া একটি টিনের বড় ঘর তৈয়ারী হইয়াছে আর সেই কূর্মকুণ্ডটিকে লইয়া একটি অর্দ্ধচন্দ্র আকৃতি মস্তবড় বেদী তৈয়ার হইয়াছে। বেদীটির তিনটি ধাপ বা স্তর। উপরের ধাপটিতে শ্রীশ্রীমায়ের ২৪ ঘট বসানো হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ধাপে বসিয়া যাহা কিছু পূজার কাজ সম্পাদন করা হয়। এবারকার যাহাকিছু পূজা, উৎসব, অন্নকূট প্রভৃতি ঐ পিছনের নূতন ঘরেতেই সম্পাদন হইল। তবে মেঝে এখনও সিমেন্ট হয় নাই। শুধু ইঁট পাতিয়া তাহার উপর খোয়া দিয়া চূণশুরকীর কাজ হইয়াছে; আর মাটির তলা হইতে কেবল জল উঠিতেছে। বসিবার ও শুইবার কোন জায়গা নাই। সামনের দিকের আপনারা যেসব টালি ও টিনের ঘর দেখিয়াছিলেন উপস্থিত তাহা সমস্তই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এমনকি টিনের ঠাকুর ঘরটি পর্য্যন্ত। সামনের দিকে পূর্বদিকে মাত্র ঘরের দেওয়াল উঠিতেছে, চারিদিক ফাঁকা। এই দারুণ শীতে আমরা যে কিরূপ ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা আর চিঠিতে লিখিয়া কি জানাইব। কবে যে এই নূতন ঘরের কাজ শেষ হইবে তাহা ভগবানই জানেন। বোধহয় এবারকার এই নিদারুণ শীতে আমাদের এইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াই কাটাইতে হইবে। আশ্রমের সামনে যে পুকুর আছে সেই পুকুরের ঘাটের উপর স্মরণ থাকিতে পারে যাহাকে

চাঁপাতলা বলিয়া থাকি একটি বড় আটচালা তৈয়ারী হইয়াছে। এবার আশ্রমটিকে একটি কূর্মের আকৃতির ন্যায় তৈয়ার করা হইতেছে। আচ্ছা একটি ম্যাপ আঁকিয়া দিতেছি তাহলে বোধহয় কিছু বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক এই ত গেল আমাদের কথা। তারপর আরও কি কাজ দেখিবার জন্য শ্রীশ্রীসাধুবাবা উপস্থিত ৩।৪ দিন কলিকাতায় বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মৈত্রের বাড়িতে আছেন। আজই বোধহয় তিনি এখানে আসিবেন।

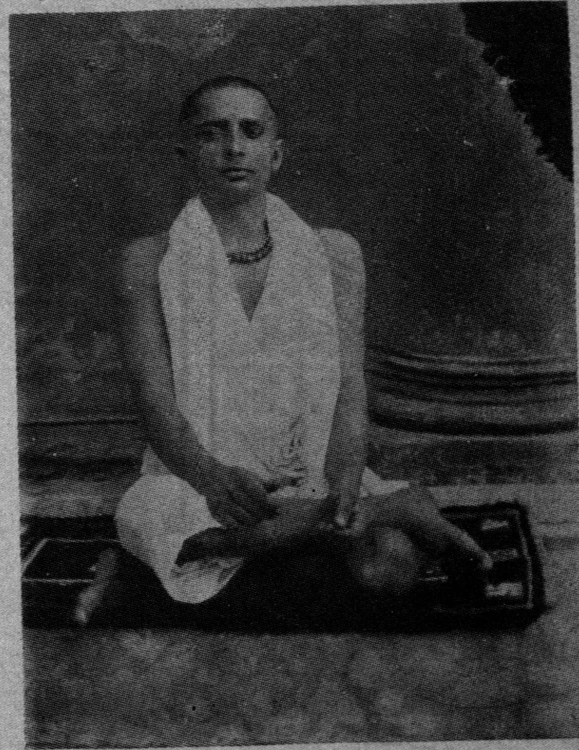




চাঁপাতলায় আশ্রমে পুকুরের ঘাটে (১৯৫১)



আশ্রমে দেহরক্ষার এক বৎসর পূর্বে (১৯৫২)



১৯৩৪-৩৫ সালে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাকসাড়ায় শ্রীদুলাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এই মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম।

দশম অধ্যায়

লীলা সম্বরণ

ভগবান শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামী যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন তখন লীলাময় তাঁহার নিত্যলীলার সঙ্গীদের, অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের লইয়া লীলা করিয়া অপ্রকট হন। তাঁহার লীলার বৃন্দাবন ছিল কেদার-কাননে 'শ্রীগোবিন্দ আশ্রম'। এই স্থলে বাৎসল্যরসে তিনি আমাদের ধরা দিয়াছিলেন। মান-অভিমানের পালায় আমরা ভগবান ও ভক্তের কত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাঁহারাই গোবিন্দের দর্শন পাইয়াছেন প্রত্যেকে কতই না রূপে তাঁহার লীলা দর্শন ও উপভোগ করিয়া সতত আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন।

আমি ও তুলসী কৈশোরে তাঁহার অমোঘ আকর্ষণী শক্তিতে আমাদের সব বিসর্জন করিয়া তাঁহার রাতুল চরণে আত্মোৎসর্গ করিলাম। আমার প্রাণাধিক ঠাকুরও আমাদের সহিত কতরূপেই লীলা করিয়াছেন—আমাদের পাশে লইয়া দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুইয়াছেন, হাসাইয়াছেন, কাঁদাইয়াছেন, রাগাইয়াছেন; নিজে কাঁদিয়াছেন, মান-অভিমান করাইয়াছেন। কত পরীক্ষার ভিতর দিয়া গড়িয়া, পিটিয়া, পুড়াইয়া মানুষ করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে জানিতাম না, আজও জানি না। আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স হইতে প্রাণগোবিন্দকেই পূজা, আরতি, কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছি। তিনিই আমার লক্ষ্মী, দুর্গা, শিব, কালী, কৃষ্ণ। তাঁহাকে ছাড়া জীবনে অন্য কাউকে জানি না, ধ্যান করি নাই। তিনিই আমার সব।

আচার্য্যদেব কখনও নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার চান নাই। যিনি মহাকালের সহিত বাস করেন তাঁহার নিকট প্রচার ও

প্রতিষ্ঠার অর্থ কি হইতে পারে? যিনিই মৎস্য, বরাহ, কূর্ম, নৃসিংহ, ভৃগুরাম, বলরাম, কৃষ্ণ ও কল্কি হইয়া সর্বকালে পূজিত তাঁহার নিকট রামগোবিন্দ রূপ অধিক কি? কিন্তু শিষ্যভক্তদের বাসনা তাঁহারা তাঁহাদের আচার্য্যদেবের জ্যোতির্ময়রূপ পৃথিবীতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবে। ঘরে ঘরে পূজিত হইবে তাঁহার এই আনন্দঘন মূরতি। কলিযুগে নবরূপে প্রেমের ঠাকুর নাম ও প্রেমে অন্নগত জীবকে ভাসাইতে আসিয়াছেন। তাঁহার অভূতপূর্ব জীবনাবলী পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যকেও ম্লান করিয়া দেয়। পৃথিবীর প্রকৃত আশ্চর্য্য বস্তু হইল তাঁহার প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনাবলী। সনাতন ভারতীয়গণ জড় বস্তুর ভিতর আশ্চর্য্যের কিছু পায় না কারণ তাহারা পাশ্চাত্যের ন্যায় জড়ের সাধনা করে না।

ভগবান তাঁহার ভক্তের ভিতর বাঁচিয়া আছে। ভক্তই ভগবানকে দেখে এবং পৃথিবীর সকলকে দেখায় ও জগৎসভায় প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে।

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব বলিতেন, "সাড়ে চব্বিশ তত্ত্বের পারে গেলে তবেই তাঁহার দর্শন, স্পর্শন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূতের আধারে ষড় রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—সদাই ব্যস্ত। উহারা সদা ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইতে উদ্‌গ্রীব। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ—হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, মুখ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। ইহাদের রাজা মন ও মনের দুই মন্ত্রী বিবেক ও বুদ্ধি। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উপরে গিয়াও সাধকের পতনের সম্ভাবনা থাকে। উহা হইল প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার লোভে সাধকের পতন হয়। প্রতিষ্ঠা হইল এই সাড়ে।"

দাদুর কঠোর সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে আমাদের আদর্শের বস্তু হইয়া উঠে। দিনের পর দিন, বছরের পর

বছর তিনি নামযজ্ঞে ডুবিয়া একদিন মানবের জন্মজন্মান্তরের অভীষ্ট জগন্মাতার দর্শন পাইলেন। আশ্রমের আমগাছের তলায় একটি ছোট্ট বেঞ্চীই ছিল তাঁহার আসন ও খাট এবং উহারই উপর একদিন সাধনায় মগ্ন হইয়া তিনি মাতৃদর্শন পান। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করেন এবং যদিও লোকালয়ে থাকিতেন তাঁহার আচার ও ব্যবহার সমাজবহির্ভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঠাকুর যেখানে প্রথমে কেদার-কাননে আসিয়া আসনে বসেন সেই স্থানে বার বৎসর পর দাদু একটি চালাঘর তৈয়ারী করিয়া দুইটি কালীমূর্ত্তি বসাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ১৯৫১ সালের শেষে তিনি দেহ রাখিলেন এবং সেই দিনই গোবিন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার জন্য বৈকুণ্ঠে জায়গা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলেন।

সোমবার ১৪ই জুলাই ১৯৫২। একদিন খুব বৃষ্টি হইতেছে এবং আশ্রমের চারিদিকে জল পড়িয়া সব ভাসিয়া যাইতেছে। এমন কোথাও ছিল না যেখানে জল পড়ে নাই। দাদুর দেহরক্ষার পর ঘাটের ধারে যে হোমকুণ্ডটি হইয়াছিল উহা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া গেল। একে বিষণ্ণ বর্ষণ তায় এই আকস্মিক হোমকুণ্ড ভাঙনের ঘটনা সকলের মন সন্দেহ ও বিষাদে ভরিয়া গেল। ঠাকুর সমাধি অবস্থায় আছেন। সেই সকল দিনগুলি যেন কোন এক অজানা ও বেদনায় ভরিয়া থাকিত। উহার ঠিক এগারো মাস পরে ১৪ই জুন ১৯৫৩ রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুর অমূর্ত্ত হইলেন।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ আমাদের জীবনে গভীর বেদনা বহন করিয়া আনে। ঐ বৎসর আমরা আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে পৌষ-সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী আশ্রমে পাইলাম না। ঐ বৎসর জন্মোৎসব নমো নমো করিয়া সাঙ্গ করা হয় কারণ সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত যেহেতু সকল ভক্তের হৃদয়রাজা প্রাণগোবিন্দ অসুস্থ হইয়া পীড়িতাবস্থায় রাঁচীর বারাণ্ডায় অবস্থান করিতেছেন। মাঝে

মাঝে ভক্তবৃন্দের অন্তরে বিচ্ছেদের ভাব জাগরূক হইয়া তাহাকে অবশ, শিথিল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিতেছে। ঠাকুরকে আরতি করিতে না পারিয়া মন, প্রাণ অশান্ত। ভক্তগণ আশ্রমে সমবেত হইয়া ঠাকুরকে তিন দিন ধ্যান ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। অন্নপূর্ণামা ঐ বৎসর একটি কবিতা রচনা করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেন। উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"শুভলগ্ন"

জীবনে এসেছে পরমলগ্ন
পেয়েছি তোমার দেখা।
সহায় আমার, সুহৃদ আমার
হে মোর দয়াল সখা॥
গুরু হ'য়ে তুমি হাত ধরে নাও
মাতারূপে তুমি স্নেহভরে চাও।
মানবের সাথী হইয়া দাঁড়াও
যখন থাকি যে একা॥
তোমারে ভুলিয়া থাকি যবে নাথ
পরশ বুলাও করিয়া আঘাত।
পরক্ষণে ফিরে হাসিয়া তাকাও
চাহনি অমিয়-মাখা॥
মিনতি আমার চরণে হে প্রভু
তোমারে যেন গো নাহি ভুলি কভু।
সুখে সম্পদে দুখে ও বিপদে
স্মরণে থাকিও আঁকা॥

শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মোৎসবের দিন বারাগুা হইতে স্বহস্তে একটি পোষ্ট-কার্ড লিখিয়া আমার ও তুলসীর নামে আশ্রমে পাঠাইলেন। উৎসবের দুইদিন পর উহা পাইয়া আমাদের হৃদয় কিঞ্চিত শান্ত হইলেও

ঠাকুরের অদর্শনে ও অসুস্থতা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি শ্লাঘা অনুভব করিতেছিলাম। পোষ্টকার্ডটিতে যাহা লেখা ছিল উহা উদ্ধৃত করিলাম—

৺শ্রীশ্রীহরি স্মরণং 14.1.53 বুধবার

শ্রীয় পতয়ে

ওঁ নমঃ নারায়ণায় চরণৌ স্মরণ অহং প্রপদ্যে পরমারাধ্য তমঃ
শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ

সর্ব্ব জ্ঞান জন্য পরম পিতার শ্রীচরণ পরসে সর্ব্ব ব্যাধীর আরোগ্য বিষয় জ্ঞান হইতে পারে তাই বিভূতি পতী জনক জন্য মঙ্গলময় বিভূতি পতীর পরম পাবন এক একটি ভাব মহাভাব জনক জন্য অভাব-নাষন করিতে হইলে একাই বিশ্বম্ভর আত্মার ভাব বুদ্ধির জনক হেতুর মহিমা প্রচারে একটীর পর একটী ভাববুদ্ধিকে পূর্ণ সমস্যায় ব্যাপক ॥

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পৌষ পার্বন
শুভলগ্ন শুভবিৎ সম্বৎসার সারমর্মক্ষণ
জন্মলগ্ন মিথুন সিংহ সন্ধি ক্ষেত্র
অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী
যোগে জাগযজ্ঞ ব্রতগম পুনঃ পূর্ণ ॥
সনাতন ধর্ম রক্ষা কর্ত্তীর আবির্ভূত
আবরণ শূন্যকরি অকার উকার মকার ধরি
আকারত্রয় করিতে স্থাপন দুষ্ট নাশ সৃষ্ট পালন
আবির্ভূত শ্রীসীতু নন্দন।
গোবিন্দ নাম ধাম সার সারাৎসার
পরিপূর্ণতম গীতগোবিন্দ বৈরাগ্য নাম,
রামগোবিন্দ ধরি নাম
ধাম সেই গোলোক নিত্য বৃন্দাবন ॥
শান্তদাস্য সখ্যবাৎসল্য মধুর অধরা ধর

সুধারায় পূর্ণ করেন মন
অনন্তও পায়না অন্ত
শান্ত সাধুর আকার
প্রকৃতির পরপারে রন।
বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথি
তাই গঙ্গার পশ্চিমতীরে
বাক্‌সাড়া ব্রহ্মচর্য্য গোরক্ষাস্থাপন॥
তুলসী, পরিতোষ সবে করে নাম সংকীর্ত্তন
বালক-ভোজন, মহা মহাপূজার পত্তন
মা নিজে আবির্ভূতা হন॥

বিভিন্ন সময় তাঁহার মহাপ্রয়াণের স্মরণে যাহা লিখিয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

তাঁহার বিদায় বেলার দিনগুলির কথা তাই স্মরণে আসিলেই আমাদের আকুলিত করে। আমরা যখন বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের প্রাণের ঠাকুর তাঁহার নরদেহ রাখিতে প্রস্তুত হইতেছেন তখন নানারূপ কথাবার্ত্তা আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি দেহ রাখিতে অচল অটল। ১৩৬০ সাল, বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অক্ষয় যাত্রা করিতে আসিলেন আশ্রমে। সেদিন বহুভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল আশ্রমে। সকলেরই মনে প্রাণে ঐ এক কথা "হে দেব, হে নারায়ণ, হে মা দুর্গা, হে মা জগদ্ধাত্রী আমাদের সাধুবাবাকে সারাইয়া দাও।" সে রাত্রি আশ্রমে থাকিয়া পরদিন ভোরে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "আমায় হাত মুখ ধুইবার জল দাও।" আশ্রমের পুকুরে ঘাটের ধারে বসিয়া মুখ, হাত, পা ধুইয়া আমাকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে, আশ্রমের চারিধারে যজ্ঞকুণ্ড হইয়া গিয়াছে, এবার নূতন যজ্ঞকুণ্ডের দরকার", এই বলিয়া আমায় ঠাকুরঘরের পিছনে যে গোয়ালঘর ছিল সেইখানে

লইয়া গেলেন এবং খড়ম দিয়া লম্বা চৌকা একটি দাগ কাটিলেন। ঠাকুরের চিরকালের হোমকুণ্ডের পদ্ধতি হইতেছে ২৪ কোণা, সাড়ে ২৪ কোণা, ২৮ কোণা প্রভৃতি। আর পা দিয়া দাগ দিলেন যেন একটি মানুষ শুইতে পারে এবং দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সমস্তই আন্দাজ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম এবং বলিলাম, "এ আমার দ্বারা হইবে না, আমি পারিব না, আপনি অন্য কারুর দ্বারা করান।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "বেশ, তুমি না পারো'ত আশ্রমের আর-আর ছেলেদের দ্বারা করাও।"

এই পঞ্চভৌতিক দেহ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইবার আগে আজীবন যিনি জগতের জীবের নানারূপভাবে সেবা করিয়া আসিয়াছেন তিনি নিজের দেহটিকে বিলাইয়া দিলেন তাঁহার ভক্তশিষ্যের মধ্যে সেবার লাগি। সকলে ভাবিল সাধুবাবার অসুখ করিয়াছে। বড় বড় ডাক্তার আসিল, ঔষধ ইনজেক্সন পুরামাত্রায় চলিতে লাগিল। সকলে মনপ্রাণ দিয়া সাধুবাবাকে সারাইয়া তুলিবার জন্য সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই একদিন নয়, প্রায় ৪ মাস ধরিয়া সকলের প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু যাঁর সেবা করিতেছেন তিনি সব সময় অচল অটল। তিনি সকল ভক্তবৃন্দের সহিত সমানে নানাভাবে আনন্দ, আলোচনা, গান, উপদেশ দিয়া যাইতেছেন এবং সব সময় লক্ষ্য কোন ভক্ত প্রসাদ না পাইয়া চলিয়া গেল কিনা। যাঁহার দেহ কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে, গোবিন্দময় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আবার রোগ কিসের? একসময় বলিলেন, "দেখ ইহারা কৃষ্ণের দেহে সুঁচ বিঁধাইতেছে। ইহাদের একটুকুও ভয় ডর নাই।" তাই বলি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণের আবার রোগ কোথায়?

রোগ হইল পঞ্চভূতগ্রস্থ মানব শরীরে। মানবের ভবরোগ সারাইবার লাগি যিনি দেহধারণ করেন সেই সর্বতাপহর পরমানন্দ মহাপুরুষ তাঁহার ভক্তের হৃদয়রাজ্যে চিরতরে আসন গ্রহণের জন্য

লীলা সম্বরণ করেন। ভক্ত যাঁহার প্রাণ সেই মহাপ্রাণ মহাপ্রয়াণের পর ভক্তের মণিপুরে নীলকান্তমণিরূপে চিরভাস্বর হন।

সেই দিনটি ছিল শনিবার ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, ইংরাজী ১৯৫৩, শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দৈনন্দিনের ন্যায় সেদিনও আশ্রম হইতে আমি ছোট পিতলের কমণ্ডলু করিয়া প্রাণাধিক শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমার শ্রীশ্রীমায়ের চরণামৃত খাওয়াইতে কলিকাতায় (৮নং বলাই সিংহ লেনে) শ্রীসুধাংশু কুমার ঘোষের বাড়ীতে বিকাল ৪।৫ টার সময় উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার ভক্তিভরে চরণামৃত গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, "অক্ষয় যাত্রা করিতে আজ আমি আশ্রমে যাইব।" তাহার পর ঠাকুর মোটর ডাকিতে বলিলেন। পূর্ণ কালসন্ধ্যার সময় ঠাকুর ও আমি আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। দলে দলে ভক্তবৃন্দের আগমন হইতে লাগিল। বহুদিন পরে আপনজনকে আপন ঘরে পাইয়া সকলেই আনন্দিত কিন্তু তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া সকলের মুখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। শতাধিক ভক্তের আগমন সত্ত্বেও সেদিন সন্ধ্যায় আশ্রমে যেন এক অভূতপূর্ব নীরবতা ও নির্জ্জনতা বিরাজ করিতেছিল। ঠাকুরের অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই চিন্তায় সকলেরই মন ভারাক্রান্ত।

বহুক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যা আরতি হইল। উনি আরতি দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। আরতির শেষে চরণামৃত দিলাম। চরণামৃত পান করিয়া বলিলেন, "আঃ দেখ, আমি একদম সারিয়া গিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে মন্দিরের চারিপাশ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। সে রাত্রে তিনি আশ্রমে অবস্থান করিলেন।

পরদিন ভোরে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সকলকে তিনি শয্যা ত্যাগ করিতে বলিলেন। তাহার কিছু পরে হাত মুখ ধুইয়া আমাকে একান্তে

ডাকিয়া বলিলেন, "এদিকে এসো, একটা জিনিষ দেখাইব।" এই বলিয়া তিনি আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের পিছনে লইয়া গেলেন। পূর্বে এখানে গোয়াল ঘর ছিল এবং ইহাই ছিল কূর্মের লেজ। শ্রীচরণ দিয়া মাটিতে দাগ কাটিয়া বলিলেন, "আশ্রমে কূর্মের উপর বহুজনের বহু হোমকুণ্ড তৈয়ার হইয়াছে, এইবার এইখানে এই রকমের হোমকুণ্ড তৈয়ার করিতে হইবে।" শ্রীচরণ দিয়া আঁকিয়া যে দৈর্ঘ্য ও গভীরতার নক্সা দেখাইলেন তাহা একটি দীর্ঘকায় মানুষের শয়নোপযোগী। আমার বুঝিতে বাকি রইল না তিনি কি বলিতে চাহিতেছেন। আমি বলিলাম, "এ ভাবে গর্ত্ত করা বা হোমকুণ্ড করা আমার দ্বারা হইবে না।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "তুমি যদি না পারো, আশ্রমের ছেলেদের দ্বারা করাইয়া লইবে।" আমি বলিলাম, "আশ্রমের ছেলেরাও ইহা করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। নানারূপ চিন্তা আসিয়া মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। বুঝিতে দেরী হইল না তিনি কি ইঙ্গিত করিতেছেন, তাঁর মনের বাসনাই বা কি। তাহার পর তিনি সামনের দিকে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। হৃদয় ভারাক্রান্ত। জমাট বাঁধা কান্না ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে চাহিতেছে। কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম, "ডাক্তার দেখাইয়া কি লাভ হইবে? অনেক ডাক্তার দেখিয়াছে, অনেক ঔষধ খাইয়াছেন, অনেক ইনজেক্সন লইয়াছেন কিন্তু ফল কী হইয়াছে? আপনি একদিন ছয়মাসব্যাপী উপবাসী থাকিয়া দেহ রাখিবার নিমিত্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই কেদার কাননে রাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মাতৃ আদেশে প্রাণ পাইয়াছিলেন। তারপর ষোল বৎসর মাতৃ পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। আজ তাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা আপনার অসুখের কথা একটিবার মাকে জানান, মা নিশ্চয় আপনার কথা

শুনিবেন। এই অধম, দীন, হীন দাসেদের কথা মা মনে লইতেছে না বটে কিন্তু আপনার কথা নিশ্চয় শুনিবেন।” প্রাণাধিক ঠাকুর ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আমার কথা বা আমার শরীরের কথা আমি বলিতে পারিব না; তোমাদের যাহা খুসি বলিতে বা করিতে পার, আমি বলিতে পারিব না।”

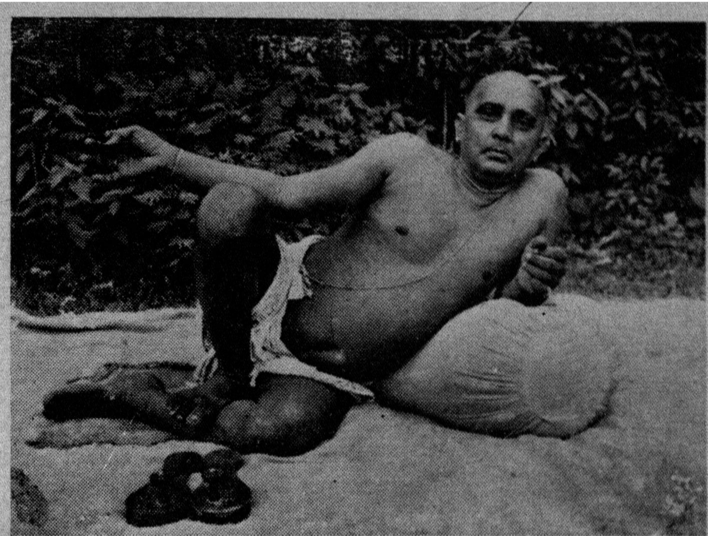
যাহা হউক, ঐদিন সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে ডাক্তার ও ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকে লইয়া আবার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আর আমার নিত্যকর্ম প্রতিদিন বৈকালে ঠাকুরকে চরণামৃত খাওয়াইয়া আসা চলিতে লাগিল। এই ভাবে কয়দিন গত হইলে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ১০ই জুন বুধবার বৈকালে যথানিয়মে চরণামৃত লইয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম; উঠিয়া দেখিলাম ঠাকুরের চোখে জল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হইয়াছে, আপনার চোখে জল কেন?” তিনি ছল ছল নেত্রে বলিতে লাগিলেন, “পরিতোষ, তুমি আমার বুঝদার ছেলে; পরিতোষ, তুমি কেন আমার কথা শুনিতেছ না?” আমি বলিলাম, “কি হইয়াছে, আপনার কোন্ কথা আমি শুনিতেছি না?” তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “সেই যে তোমাকে হোমকুণ্ড করিতে বলিয়াছি। হোমকুণ্ডের গর্ত্তটা যে ভাবে বলিয়াছি সেইভাবে খুঁড়িয়া ফেল; তারপর আমি তোমাদের যে মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছি এবং যাহা যাহা মন্ত্র শিখাইয়াছি, ঐ কুণ্ডে কাঠ দিয়া হোমাগ্নি জ্বালাইয়া দিবে এবং সমস্ত মন্ত্রের সাহায্যে যজ্ঞ সম্পাদন করিবে। অবশেষে যে পূর্ণাহুতি দাও, সেই সময় অন্য কিছু না দিয়া আমার দেহটিকে পূর্ণাহুতি দিবে; আশ্রমের সামনে ঠাকুরের নিকট রাখা পাদুকার উপর চন্দনের পাহাড়টিকে বুকের উপর বসাইয়া দিবে। তুমি আমায় বলিয়াছ আশ্রমে গিয়া থাকিতে; আমি আগামী সংক্রান্তির দিন আশ্রমে যে যাইব আর আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও যাইব না, বরাবর আশ্রমে থাকিয়া যাইব।” ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে তিনি

বলিতে লাগিলেন, "তুমি অধৈর্য্য হইও না ; তুমি কি ভাবিতেছ আমি এখনই মরিয়া যাইব ? আমি এখন কিছুতেই মরিব না, এখনও আমি আঠারো বৎসর বাঁচিয়া থাকিব ; তোমরা কি কর না কর সব দেখে তবে যাব। তোমার মনে মনে যে মন্দিরের কল্পনা আছে তাও আমি দেখে তবে মরবো। আর এখন দেখবে হিংসা এসে সমস্ত দেশকে গ্রাস করে ফেলবে, রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, মানুষ মানুষের মাংস খাবে।" এই রকম বহু কথা তিনি বলিলেন। এই সময় শ্রদ্ধেয়া কুষ্টিয়ার মা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদের উভয়ের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, আপনাদের চোখে জল কেন ?" উনি বলিলেন, "না, কিছু না।" এই বলিয়া কুষ্টিয়ার মার প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন।

যে দিন বিকালে এই সব কথা হইল সেদিন রাত হইতে ঠাকুর আমার নিজের আত্মা ও মনপ্রাণকে তুরীয় অবস্থায় লইয়া গিয়া রাখিয়া দিলেন। শেষ তিন চার দিন উনি আমাদের সঙ্গে সাধারণভাবে না মিশিয়া কেবল জগজ্জননীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কখনও কখনও তিনি বলেন, "যাঃ যাঃ সব গেল, সব গেল ; দাঁড়া মা, একটু দাঁড়া, আমি যাচ্ছি, মা যাচ্ছি।" সকলে বলিল বা ধারণা করিল যে নিত্যসিদ্ধ, অবতারস্বরূপ ঠাকুরের আবার বিকার আসিয়াছে। আমি বলিলাম, "ঠাকুরের কখনও সাধারণ মানুষের মত বিকার আসিতে পারে না। ঠাকুর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।" সেই সময় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আমরা যাহা করিতে বলিয়াছি ঠাকুরও তাহাই করিয়াছেন। বলিলাম— "দাদা, পদ্মাসনে বসুন," উনিও অমনি পদ্মাসনে বসিলেন ; "দাদা, কেহ কেহ বলিতেছেন, আপনার নাকি বিকার আসিয়াছে ? দাদা, আসুন আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি, আপনার মন্ত্র

আপনি বলুন। সকলকে বুঝাইয়া দিন, ওরে নিত্যসিদ্ধ পূর্ণাবতার মহাযোগীর বিকার আসিতে পারে না। তাঁরা সমাধি অবস্থায় বিকারহীন হইয়া অনেক কিছু করিতে বা বলিতে পারে।" আমি বলিলাম—"বলুন'ত দাদা অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র, "ওঁ নমো নারায়ণায়।" দাদা হাসিতে হাসিতে অমনি বলিলেন—"ওঁ নমো নারায়ণায়।" আমরা বলিলাম, "আবার বলুন" এবং দাদা আরও উচ্চৈস্বরে বলিলেন। আর একবার বলিতে বলায় উনি তখন "ওঁ নমো········ নারায়ণায়" বলিয়া কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠাইয়া দিলেন। সেই অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছিল দাদা আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন সকলে বিশ্বাস করিল, এটা বিকার নয়, মহাযোগীর সমাধির ইহা এক অবস্থামাত্র। তাহার পর আমাকে অনেক স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে আসিল সেই কাল দিন, কাল তিথি—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা, রম্ভা তৃতীয়া, রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিঃ। সেদিন আমাদের প্রাণপ্রিয় ঠাকুর তাঁহার কথামত চিরদিনের জন্য আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। চিরদিনের জন্য আসিলেন বটে, তবে আর একভাবে। ঐদিন রাত্রে তাঁহারই বলা ও করা হোমকুণ্ডে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী সমস্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া আমাদের পরমপ্রিয় ঠাকুরের শ্রীদেহটি পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল।

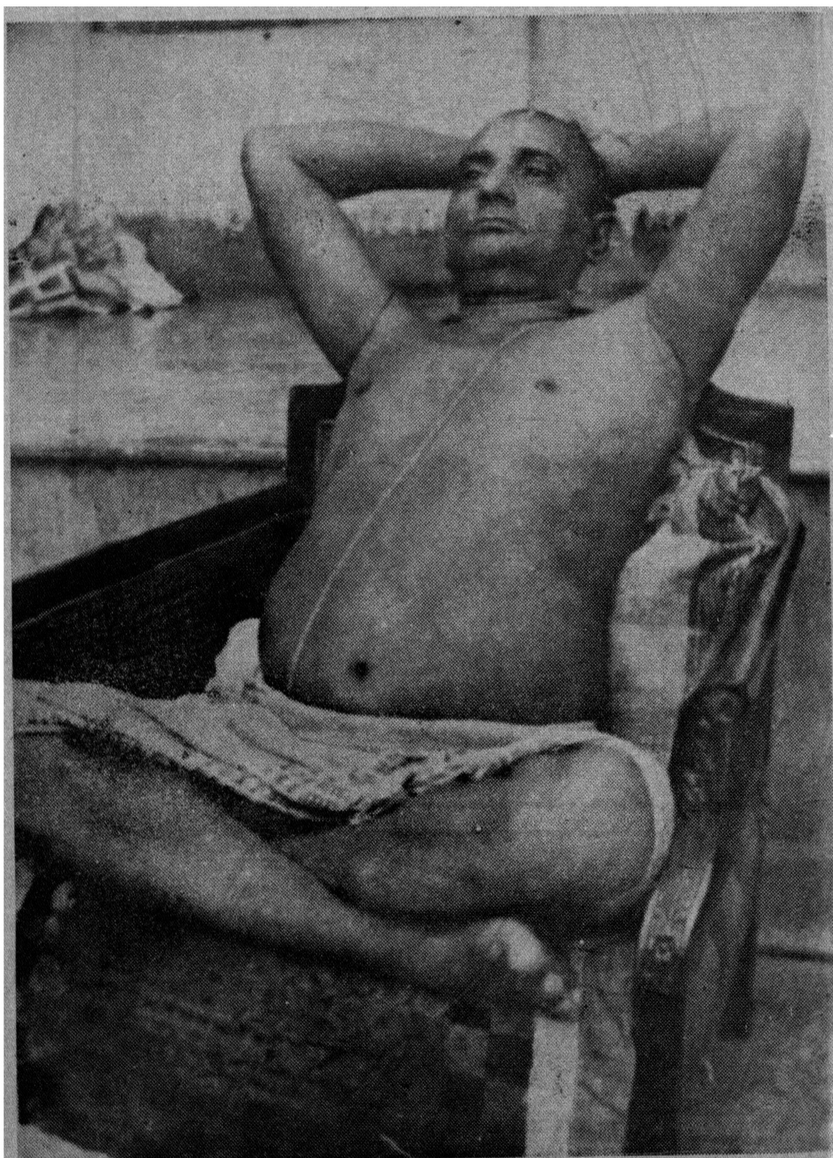
ঠাকুরের আর একটি লীলা এই যে, তিনি কোনও এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার দেহ ভঙ্গ হইতে, বিচ্ছিন্ন হইতে দিও না, দেহ যেন অক্ষত থাকে।" পরদিন সকালে তাঁহার যজ্ঞকুণ্ডে জল ঢালিতে হইবে এ খেয়াল আমাদের নাই। অনেকেই বিভূতি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। এমন সময় তখন সকাল নয়টা হইবে,—ভীষণ রৌদ্রের ভিতর দিয়া কোথা হইতে এক টুকরা মেঘ সমাধি ক্ষেত্রের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণে গভীর গর্জ্জনে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রবল বেগে বৃষ্টি



আশ্রমে প্রাণগোবিন্দের লীলাসম্বরণের একবৎসর পূর্বে (১৯৫২)



আশ্রমে প্রাণগোবিন্দের লীলাসম্বরণের একবৎসর পূর্বে (১৯৫২)



ভক্তগৃহে প্রাণগোবিন্দ

নামিল। বৃষ্টির পর দেখা গেল যে যজ্ঞকুণ্ড বা গর্ত কিছুই নাই। পুরা সমতল জায়গা হইয়া গিয়াছে। কোথাও এক টুকরা পোড়া কাঠ কয়লাও পাওয়া গেল না। যাঁহারা বিভূতি পাইবার আগ্রহে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। ঠাকুর আমার অক্ষত অবস্থাতেই বিরাজ করিতেছেন। লীলাময়ের লীলা, তোমার অধম সন্তানরা কি করিয়া বুঝিবে ?

শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য বেড়ো গ্রামে অনাথবন্ধু টোলে সংস্কৃত ও বেদধ্যয়ন করিতে গিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দের সহিত কৈশোরে পরিচিত হন এবং তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় তিনি আমাদের একটি ক্ষুদ্র রচনা পাঠাইয়া ঠাকুরের সেই সময়কার জীবনের একটি দিক আলোকপাত করেন। উহা এইরূপ—

আমার যখন পাঠ্যাবস্থা সতর কি আঠার বৎসর বয়স তখন মানভূম জেলার বেড়ো গ্রামে ৺রামগোবিন্দ আচার্য্য গোস্বামীর সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বয়সে আমার অল্প কিছু বড় ছিলেন। ঐ সময় হইতেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁহার লেখাপড়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ ছিল না, কিন্তু এমন অদ্ভুত সরল ও মধুর ব্যবহার ছিল যে, অনায়াসেই তিনি সকলকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু করিয়া লইতেন।

ঐ বয়সেই মধ্যে মধ্যে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেন ; ছয় মাস বা এক বৎসর রামগোবিন্দর কোনও সংবাদই কেহ জানিত না। সহসা পুনরায় কোনও একদিন দেখা গেল রামগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই। তিনি যে সাধন ভজন করিবার নিমিত্ত অজ্ঞাতবাসে চলিয়া যান একথাও তিনি কোনও দিন আমাদিগকে বলেন নাই এবং আমরাও তাহা মনে করিতাম না।

এমন কি সাধন ভজন সম্বন্ধে কোনও কথা প্রসঙ্গক্রমে বা গল্পচ্ছলেও তিনি আমাদিগকে বলেন নাই।

তাঁহার মত নির্ভীকপুরুষ খুব কমই আমরা দেখিয়াছি। সাপ, বাঘ প্রভৃতি নিরতিশয় হিংস্র প্রাণীকেও তিনি আদৌ ভয় করিতেন না। বড় বড় বিদ্বানের সম্মুখেও তিনি অনর্গলভাবে কথা বলিয়া যাইতেন। তাঁহার কথাগুলি ঠিক হইল কি ভুল হইল সেই দিকে তাঁহার কোন গ্রাহ্যই ছিল না। এইরূপ কোনও রাজা, মহারাজার নিকট সহসা উপস্থিত হইতেও তাঁহার কোনও সংকোচ আসিত না। অতি অনায়াসেই তিনি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের খেয়াল মত যা কিছু বলিয়া দিতে পারিতেন।

অনেক দিন পরে যখন জানিলাম তিনি সাধু হইয়াছেন এবং অনেক সিদ্ধিও তাঁহার আছে—তখনই আমরা তাঁহার নিরুদ্দেশযাত্রার, পূর্ব্বকথিত সরলতা ও নির্ভীক ব্যবহারের সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছি।

সাধু হওয়ার পরে তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ মিলন হয় নাই। শুনিয়াছি তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ও নিজেও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং গীতগোবিন্দ নাম লইয়াছিলেন।



পরিশিষ্ট

প্রাণগোবিন্দের ইচ্ছা ছিল এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ৫১ (একান্নটি) বালক স্ব-পাক ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জীবনের ভিত তৈয়ারী করিবে।- আমাদের সকলের সীমিত প্রচেষ্টায় বর্ত্তমানে আশ্রমে কিছু বালক আশ্রমবাসী হইয়া পাঠাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছে। কেহ পাঠ সমাপনান্তে স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হইয়াছে। তিনি গরীবের ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া দিবার জন্য আশ্রমের পাশেই স্বহস্তে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বাকসাড়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তদের ইচ্ছা উহা "শ্রীশ্রীরামগোবিন্দ মহাবিদ্যালয়" নামকরণ হউক। ঐ হাইস্কুলের সভাপতি ঠাকুরের ভক্ত শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এই নামকরণ সম্বন্ধে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আশ্রম হইতে বহু বালক কৈশোরে পদার্পণ করিয়া ম্যাট্রিক, হায়ার সেকেণ্ডারী, বি, এ, বি, এস, সি, এম, এস, সি, পাশ করিয়াছে। আশ্রম বালকদের প্রভাতে বেদপাঠ অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য। শ্রীমান সঞ্জয় ভাদুড়ি আশ্রম বালকদের ভিতর বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন। শৈশব হইতে আশ্রমে বাস করিয়া বেদপাঠ, পূজা, ব্যায়াম, আসন, ইত্যাদির সহিত হায়ার সেকেণ্ডারী, আই, এস, সি, বি, এস, সি, ও এম, এস, সি, বৃত্তিসহকারে পাশ করিয়া বর্ত্তমানে হাওড়ার শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে অধ্যাপনা করিতেছে এবং আশ্রমের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। আশ্রম সম্পূর্ণ ভিক্ষার উপর চলিতেছে এবং শ্রীশ্রীগুরুনারায়ণ তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী ভালোভাবেই চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। সকল শিষ্য ভক্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সাহায্য ও সমবায়ে প্রাণগোবিন্দ চালাইয়া লইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুনারায়ণ তাঁহার পঞ্চভৌতিক দেহ রক্ষার তৃতীয় দিনে ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হন। আমি ঘুমাইতে-ছিলাম। আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "পরিতোষ, ভোর হইয়াছে উঠ। আমার হাত-মুখ ধুইবার জল দিবে না? তোমরা কোথায় যাইবে ঠিক করিয়াছ? কেনই বা যাইবে? তোমরা কি ভাবিতেছ আমি চলিয়া গিয়াছি? তোমাদের আর কেহ স্থান দিবে না? আশ্রমের কার্য্যে কেহ সাহায্য করিবে না? তোমাদের দিকে কেহ তাকাইবে না? তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আমি আছি। আমার কাজ আমিই করিব। তোমরা আমার ডান হাত

বাম হাত। আমার কাজ আমার ডান হাত, বাম হাতকে দিয়া করিব। দেখিবে এখন ক্রমশঃ আশ্রমের কত উন্নতি হইবে। তোমাদের কিছু করিতে হইবে না, আমিই সব করিব। আমার গৃহী ভক্তবৃন্দের বাড়ী গেলে তোমাদের পুঁছিবে না মনে করিতেছ? আচ্ছা, একবার আমার যে কোন ভক্তের বাড়ী গিয়া দেখ, যদি কেহ কোনও রূপ তোমাদের অসম্মান করে তখন তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী যেখানে খুসী চলিয়া যাইও।" শ্রীশ্রীঠাকুরের আমাদের এত কথা বলিবার কারণ তাঁহার দেহ রক্ষার পর আমি ও তুলসীদাস জল্পনা করিতেছিলাম যে যখন আমাদের কোন পিছুন টান নাই, আমাদের জন্য কাঁদিবার কেহ নাই, আমরা যেখানে খুসী চলিয়া যাইব; দুইটি খঞ্জনী লইয়া কীর্ত্তন করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া শেষে শ্রীবৃন্দাবনে শেষ কয়দিন থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, একমুঠা চাউল ফুটাইয়া কাটাইয়া দিব। এইমত আমরা দুইজনে কথাবার্ত্তা বলিয়া ঠিক করিতেছিলাম। অন্তর্যামী নারায়ণ আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়া নিজে প্রত্যক্ষ হইয়া সব কথা বলিয়া গেলেন।

আশ্রমে প্রত্যহ সকালে বেদপাঠ, পূজা, আরতি, দুপুরে ভোগ রাগাদি আরতি, সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি ও তাঁহার রচিত ও সম্বলিত '৫ কীর্ত্তনাবলী' কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় তাঁহার অতি প্রিয় ধ্রুপদ গানের আসর হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীহরিশংকর ঘোষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার দেহরক্ষার পর এই অষ্টাদশ বৎসর নিয়মিত আশ্রমে আসিয়া ঠাকুরকে বাজনা শোনাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার ছাত্র শ্রীদীনেশ প্রামাণিকও শংকরদার সহিত আসিয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া থাকেন। গায়কদের মধ্যে শ্রীবলাইচন্দ্র ঘোষ (স্বর্গত:), শ্রীনেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নিয়মিত গানের আসরে যোগদান করেন। মাঝে মাঝে সংগীতাচার্য্য শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে আসিয়া যোগদান করিয়া থাকেন।

প্রতি অমাবস্যায় আশ্রমে হোম যজ্ঞ হইয়া থাকে এবং উহাতে বহুভক্তবৃন্দ যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা ও উপমাচ্ছলে বহু গুহ্য গভীর কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন, "আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীরা হইল ইঞ্জিন আর গৃহস্থ

শিষ্য-ভক্তরা হইল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার বা কামরা। আমি হইলাম গার্ড। আমার এই বিরাট মেল ট্রেন আছে। তোমরা যদি ঠিক ঠিক ভাবে তৈয়ার না হও তাহা হইলে গৃহস্থদের টানিয়া লইয়া যাইবে কি করিয়া?"

দেহরক্ষার পর একদিন প্রত্যক্ষ হইয়া তিনি বলিলেন, "আমি মরি নাই, আমার মরণ নাই, আমার অনেক কাজ যে বাকী আছে। তোমরা যে আমার ডান হাত, বাঁ হাত। তোমাদের দ্বারাই ত আমি আমার সমস্ত কাজ করিব। প্রয়োজন হইলেই দেখা পাইবে, সমস্ত কার্য্য কারণ কথা হইবে। আমার জন্য তোমরা দুঃখ বা চিন্তা করিও না। আমি আছি, আমি যাই নাই। আমি আছি, আমার দেহ ভগ্ন হইতে দিও না। আমি পূর্ণরূপে ঐ স্থানে আছি" বলিয়া আঙুল দিয়া সমাধির দিকে দেখাইলেন। তারপর হাত-মুখ ধুইবার জল চাহিয়া কোথায় মিলাইয়া গেলেন। আর চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষের মৃত্যু নাই। "শ্রীগুরুর মৃত্যু হয় না।" আমাদের প্রাণপ্রিয় শ্রীগুরুগোবিন্দের শুভ জন্মদিনের শুভ লগ্নে পৌষ সংক্রান্তির দিনে রাত্রিতে দেখিলাম শুভ জন্মোৎসবের আরতি চলিতেছে। ঠাকুর আমার আরতি দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। আরতির ভিতর দিয়া দেখি ঠাকুর আমার আসিয়াছেন। আসিয়াছেন এবার নব সাজে, আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘদেহী, লম্বা চওড়া চেহারা, টক টকে ফরসা গায়ের রং, শরীর হইতে যেন দিব্য জ্যোতি বাহির হইতেছে। মাথায় বেশ কোঁকড়ানো চুল, গলায় নীল সবুজ রংয়ের পাতলা চাদর ঝুলিতেছে, পরনে ঘিয়ে রংয়ের গরদের কাপড়, কোঁচাটা মাটিতে লুটিতেছে। যেন এক অপরূপ মূর্ত্তির সমন্বয় ঘটিয়াছে। মনে হইতেছে এ ঠাকুর তো আমার নয়, আমার প্রাণগোবিন্দ নয়, আমি চাইনা ইহাকে, আমার প্রাণগোবিন্দ গেল কোথায়? আমি সেই মূর্ত্তি চাই, তাহাকে চাই, তুমি চলে যাও, স'রে যাও—এই বলিয়া চোখ বুজিতেছি, আর একবার করিয়া ভাল করিয়া তাকাইতেছি। শেষে ইশারা করিয়া চরণযুগল দেখিতে বলিলেন। চরণ যুগলের দিকে তাকাইতেই মনে হইল, এ যে ঠিক আমার প্রাণপ্রিয় গোবিন্দের চরণ দেখিতেছি। তবে কি আমার গোবিন্দ দেহের রূপ পাল্টাইয়া ফেলিয়াছেন, তবে কি প্রিয় ঠাকুর আমার নবরূপে নবসাজে আবার আবির্ভূত হইয়াছেন? আমি কিছু ভুল দেখিতেছি না ত? এইরূপ নানা দ্বন্দ্বে মন যখন দুলিতেছে, তখন আধা হাসি অবস্থায়

আমায় বলিলেন, "কি চিনিতে পারিতেছ না? আমি আবার আসিয়াছি, এবারে আমার এইরূপ। এস এস, আমার সঙ্গে এসো" এই বলিয়া হাত ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। দেখি রাস্তার দুই পাশে জঙ্গল, মাঝে সামান্য একটু সরু রাস্তা দিয়া আমায় লইয়া যাইতেছেন। মনে ভয়ও হইতেছে, কোথায় যাইতেছি, কেন যাই-তেছি প্রভৃতি চিন্তায় এইরূপে হাঁটিতে হাঁটিতে বিরাট জঙ্গল পার হইয়া একটি শুভ্র পাহাড়ের নিকট আসিয়া পৌছিলাম। ধব্‌ধবে সাদা পাহাড়। খুব একটা বিরাট উঁচু নয়, তবে বেশ পরিষ্কার রাস্তা করা আছে। সেই রাস্তা দিয়া চূড়ায় উঠা যায়। ঠাকুর তখন আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া আগে আগে চলিতে লাগিলেন ও আমায় বলিলেন, "আমার পিছনে পিছনে আইস, কোন ভয় নাই।" পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় দেখিলাম তিন-চার জন লোক বসিয়া আছে। মাথা নেড়া, পরনে গেরুয়াবসন চাদরের মত জড়ান আছে, কোন কাছা বা কোঁচা নাই। ঠাকুর আমার কিন্তু সেদিকে তাকাইয়াও দেখিলেন না। একবার করিয়া পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন যে আমি পিছনে পিছনে আসিতেছি কিনা। শেষে কিছুটা সমতল জায়গায় গিয়া হাজির হইলাম। দুই জন বসিবার মত সাদা বরফের একটি হেলান দেওয়া জায়গা আছে, আশেপাশে নানারূপ গাছপালা রহিয়াছে। আমায় বলিলেন, "এইখানে বসিয়া বিশ্রাম কর।" আমি আসনপিঁড়ি হইয়া বসিবার পর বলিলেন, "আমি আবার আসিয়াছি, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। সময়ে আমার দেখা পাবে, তবে কোথায় আমি আসিয়াছি তাহা এখন তোমায় বলিব না। তোমার পেটে কোন কথা থাকে না। সময়ে সব জানিতে পারিবে। সময়ে সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে। জেনে রেখো আমি আসিয়াছি ও তোমাদের পাশে পাশে আছি।" এইরূপভাবে যখন কথাবার্তা হইতেছে তখন পূর্ব্বদিকে সামনের দিকে তাকাইয়া দেখি দিগদিগন্ত আলো করিয়া সূর্য্যদেব উঠিতেছে, সমস্ত অন্ধকার কে যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে ও আমার গায়ে কিরণ আসিয়া পড়িতেছে। ঠাকুর যেন আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতেছেন এবং ক্রমশঃ লীন হইয়া গেলেন, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।

ত্বাম্ নমামি হরিপ্রিয়ে

তুলসীর ডায়েরী

পরিতোষের মার মৃত্যু

২৬।৮।৪৩ (১৩৫০)—বৃহস্পতিবার পরিতোষের মা সকাল ১০টার সময় মারা গিয়াছেন।

তুলসীর মার মৃত্যু

৩১।১০।৪৩ (১৪ই কার্তিক ১৩৫০)—তুলসীর অর্থাৎ আমার মার মৃত্যু ৩১শে অক্টোবর, ১৪ই কার্তিক বেলা ১।৪৫এ মারা গিয়াছে।

মধুপুর

মধুপুর যাত্রা ৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৫০

৪।১২।৪৩—মধুপুরে বাকুলিয়া ঝর্ণা আছে! আমি ও পরিতোষ যাইয়াছিলাম। কালিপাহাড়ি ঝর্ণা ৭ মাইল দূরে। মধুপুরের ঠিকানা—সুধীরচন্দ্র বোস, হেরিটেজ, হারলাটার, মধুপুর। দ্বারকা লজ, খিলানবাড়ি, পাথরচাপটী, মধুপুর।

১০।১২।৪৩—শুক্রবার সকাল ৭টার সময়ে মোগলসরাইয়ে করিয়া অরুণদা, তুলসী, পরিতোষ এই তিনজনে বৈদ্যনাথধাম যাত্রা করিয়াছিলাম।

২৯।১২।৪৩ (১৩ই পৌষ)—আমরা মধুপুর হইতে সন্ধ্যার সময় সদলবলে আশ্রমে যাত্রা করিয়াছি।

শ্রীশ্রীসাধুবাবার মাতাঠাকুরানী

১৪।৭।৪৪ (৩০শে আষাঢ় ১৩৫১)—শ্রীশ্রীসাধুবাবার মাতাঠাকুরানী বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়।

কোরকোণ্ডায়

২৭।৭।৪৪ (১১ই শ্রাবণ) বৃহস্পতিবার পরিতোষের ভাই লালু একখানি পোস্ট কার্ড দেয়।

১০।৮।৪৪ (২৫শে শ্রাবণ)—অরুণদাকে পোস্ট কার্ডে একখানি পত্র দিয়াছি।

১১।৮।৪৪ (২৬শে শ্রাবণ)—সূর্য্যনারায়ণবাবা কোরকোণ্ডা হইতে চলিয়া গিয়াছে।

১৮।৮।৪৪—শুক্রবার অরুণদার ২ খানি পোস্ট কার্ড কোরকোণ্ডায় পাইয়াছি।

১৯।৮।৪৪ (৩রা ভাদ্র)—শনিবার মটু, মাষ্টার ভিজিয়ানাগ্রাম আসিতেছে। ২১।৮।৪৪ (৫ই ভাদ্র) ২ জনে কোরকোণ্ডায় আসিয়াছে।

১৬।৮।৪৪ (৩১শে শ্রাবণ)—বুধবার কূর্মের চারিধার বাঁধানো আরম্ভ হইল।

১৬।৯।৪৪—মাদ্রাজীরা আশ্রমে আসিয়াছে। যাইল ২৩।১০।৪৪

১৬।১১।৪৪ (৩০শে কার্তিক)—বৃহস্পতিবার বৈকাল ৪টায় শিবপুরের ডাক্তারবাবুর মেজ ছেলে দাদু সুবোধকুমার ঘোষ মারা যায়। শ্রীশ্রীসাধুবাবা, বিজু, কাঞ্চন ও আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ফিরিলাম আশ্রমে রাত্রি ৯টার সময় বিজু ও আমি।

স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—কালাজ্বরে ঔষধ আবিষ্কারক।

১৯।১১।৪৪ (৩রা অগ্রহায়ণ)—রবিবার বিমান হানা ও সাইরেন হইয়াছে।

৭।১২।৪৪ (২১শে অগ্রহায়ণ)—বৃহস্পতিবার ভোরে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মারা যায়।

১৭।১২।৪৪ (২রা পৌষ)—রবিবার বেলা ২টার ট্রেনে ৪নং প্লাটফরমে আপার ইণ্ডিয়া এক্‌সপ্রেসে শ্রীশ্রীসাধুবাবা, অরুণদাদা, জ্ঞানবাবু ও কল্পতরু পাটনা যাত্রা করিয়াছেন। তুলসী পরিতোষ আশ্রমে ছিল।

১৫।৬।৪৫ (৪ঠা আষাঢ়)—সোমবার সূর্য্যনারায়ণবাবার ছেলে জগন্নাথ কোরকোণ্ডায় আসিয়া একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতে ভিজিয়ানাগ্রাম যায়।

১।৭।৪৫ (১৭ই আষাঢ়)—রবিবার ভিজিয়ানাগ্রামের রাজা কোরকোণ্ডা প্যালেস দেখিতে আসিয়াছিলেন।

১৩।৪।৪৫—শুক্রবার ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে একজন ব্রাহ্মণ ভাগবত পাঠ করিতে ৯ দিনের জন্য কোরকোণ্ডায় আসিয়াছেন।

২০।৪।৪৫ (৭ই বৈশাখ)—শুক্রবার ২জন ব্রাহ্মণ আসিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়াছে এবং ঐদিনে ২০ জন ব্রাহ্মণভোজন করিয়াছে প্যালেসের ভিতর।

২৭।৬।৪৫ (১৩ই আষাঢ়)—বুধবার বৈকালে সমস্ত হোমকুণ্ডে মাটি দিয়া তুলসীগাছ পুঁতিয়াছি।

তুলসীর ডায়েরি

৩।১২।৪৫ (১ই অগ্রহায়ণ)—রবিবার আমি পানামা ও পানামার ছেলেকে লইয়া দেবেদের বাড়ি গিয়াছিলাম। আমি গিরিধারীলাল গোবিন্দ ঠাকুরকে দেবেদের বাড়ি পৌছাইয়া দিয়াছি।

শ্যার উপেন ব্রহ্মচারী—কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কারক।

১।৪৬ (১৮ই পৌষ)—বুধবার আশ্রমের ঘাটের দুই পার্শে ঘাট ও চারি পাশে কাটান শুরু হইয়াছে।

১।৮।৪৫ (১৪ই ভাদ্র ১৩৫২)—শুক্রবার অরুণদা আশ্রম হইতে বাড়িতে থাকিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে।

কোরকোণ্ডায়

৯৪৪ সাল হইতে কেশব, আনজিনীলু, অশল্লু, ফাইড়আন্না, এল্লা আম্মা নাইড়ু, াপ্পাল নাইডু, নায়েন আপ্পা, সন্ন্যাসী, এই আটজনে শ্রীশ্রীকোরকুণ্ডেশ্বরীর াচিল, হোমকুণ্ড, গেট প্রভৃতি কাজ করিয়াছে।

১২।৪৫—বুধবার অরুণদার সহিত পরিতোষের একটি প্রদীপ লইয়া ভয়ানক তর্ক হইয়াছিল। পাড়ার বহুলোক থামাইতে আসিয়াছিল।

০।৭।৪৫ (৪ শ্রাবণ)—শুক্রবার বৈকাল হইতে মিলিটারী পেলেসের চারিপার্শের আমগাছ কাটিতে শুরু করিয়াছে।

৩।৩।৪৫ (৯ চৈত্র)—শুক্রবার প্রমথবাবার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। বেলা ৩টার সময় বরানগর বাড়ীতে।

৯।১২।৪৩ (১৩ই পৌষ)—২।২৬।৪৪ শুক্রবার অরুণদা কোরকোণ্ডায় মাকে ও আমাদের দেখিতে আসিয়াছিল। ৬।৬।৪৪ মঙ্গলবার ভিজিয়ানাগ্রাম চলিয়া যায়।

।৩।৪৪—বুধবার ভিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীসাধুবাবা, অরুণদা, অদ্বৈতদা, শীতলদা, প্রমথবাবা, তুলসী, পরিতোষ। ৬।৩।৪৪ কোরকুণ্ডা যাত্রা ১২।৩।৪৪ কালিমাতা প্রতিষ্ঠা।

৫।৩।৪৪—রবিবার হইতে তুলসী পরিতোষ কোরকোণ্ডায় রহিয়াছে।

৬।৫।৪৪—শুক্রবার কোরকুণ্ডেশ্বরীর মার পাঁচিল পরিতোষ তুলসীর উপস্থিতিতে আরম্ভ হইতেছে।

।৫।৪৪—মঙ্গলবার অরুণদা কোরকোণ্ডায় আসিয়াছে। ২৮শে মে রবিবার

শ্রীরঙ্গম, বাঙ্গালোর, মাইশোর দেখিয়া ভিজিয়ানাগ্রামে আসিয়াছেন।

২৪।৬।৪৪—শনিবার শ্রীশ্রীসাধুবাবা বহরমপুর যাত্রা করিয়াছেন।

২৯।৬।৪৪—ভিজিয়ানাগ্রাম প্যালেসে মিলিটারী আসিতেছে আমরা খবর পাইলাম। শুক্রবার ৩০শে জুন একজন মিলিটারী প্যালেস দেখিতে আসিয়াছিল।

১৮ই মাঘ ১৩৪৬ শুক্রবারে—অরুণদা ভবানীপুর বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিয়া এক রাত্রি বাস করিয়া ভবানীপুর বাড়িতে চলিয়া যান ইং ১।২।৪৬ তারিখে।

৮।২।৪৬ শুক্রবার—হরিবিলাসদা শাশুড়িকে লইয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ২ ঘণ্টা থাকিয়া পুনরায় চলিয়া যান।

১২।২।৪৬ মঙ্গলবার—কানাই ভট্টাচার্য ও সুশীল সান্যাল এই দুই জনে ভোট হইয়াছে। সুশীল সান্যাল জিতিয়াছে।

১৩।২।৪৬ বুধবার বেলা ১২টা হইতে—কলিকাতায় Marsial Law পাশ হইয়াছে।

২৮।২।৪৬ বৃহস্পতিবার ১০।১১ দিন পরে—শীতলদা আজ ৫।।০টার সময় আমার গলার আংটাটী বাহির করিয়া আমার হাতে দেয়।

৬।৩।৪৬ বুধবার তৃতীয়ার দিন—দুলালদার বাড়ী তুলসীমঞ্চ করিয়াছি ও বৈকালে ৭টার সময় তুলসীগাছ পুঁতিয়া আসিয়াছি।

১০।৩।৪৬ (২৬শে ফাল্গুন ১৩৫২)—রবিবার শ্রীশ্রীসাধুবাবা আশ্রমে রাত্রি ৮।।০টার সময় আসিয়া বৃদ্ধ শশধরবাবুর হস্তে আশ্রমের ভার অর্পণ করেন ও ২৫টি টাকা দিয়া যান। তখন আমিও পরিতোষ আমরা ২ জনে আশ্রমে হাজির ছিলাম।

১৩।৩।৪৬ (২৯শে ফাল্গুন ১৩৫২)—বুধবার একাদশীর দিন দাদার পিতলের বাক্স আমি দুলালদার বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছি।

২১।৩।৪৬ (৭ই চৈত্র ১৩৫২)—বৃহস্পতিবার চতুর্থীর দিন কোবুকুণ্ডেশ্বরীর গেট শেষ হইয়াছে। কেশব ও অনজীনিলু দুই জন মিস্ত্রী করিয়াছে।

২০।৩।৪৬ (৬ই চৈত্র ১৩৫২)—বুধবার তৃতীয়ার দিন শ্রীশ্রীসাধুবাবা, অরুণদা, তুলসী, পরিতোষ মাদ্রাজ মেলে ভিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা করিয়াছিল। ভিজিয়ানাগ্রাম ১ রাত্রি বাস করিয়া তুলসীও পরিতোষ পরদিন বেলা ১০টার সময় একটী ঝট্কা করিয়া কোরকুণ্ডায় গিয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবা ঐ দিনে

কোরকোণ্ডায় মায়ের দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে অরুণদা, রাঘবাচারী ও রঙ্গনাথন ছিলেন।

(ভবিষ্যৎ বাণী)

।।৪৬ (১৯শে চৈত্র ১৩৫২)—মঙ্গলবার বেলা ৫টার সময় শ্রীশ্রীসাধুবাবা ডাক্তার আয়েঙ্গার, রঙ্গনাথম, সোমেশ্বর রাও প্রভৃতি সকলে ২ খানি মোটর যোগে বেনারস রাজকুমারের (স্যার ভিজির) বড় ছেলেকে লইয়া কোরকোণ্ডায় আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবা আমাদের বলিলেন "তোমাদের আর দেড় বৎসর সময় আছে।" অর্থাৎ তুলসী ও পরিতোষকে বলিলেন। "পরে কি হইবে তাহা দেখিতে থাক।"

৪।৪৬ (১৩ই বৈশাখ ১৩৫৩)—শুক্রবার সকাল ৮টার সময় শ্রীশ্রীসাধুবাবা প্রতাপ সিংহী, রঙ্গনাথম, অরুণদা, শ্রীশ্রীকোরকুণ্ডেশ্বরীর মায়ের দর্শনে এবং যজ্ঞ করিতে আসিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইবার পর মায়ের নিকট পয়সার বাক্স খুলিয়া সমস্ত গণনা করিয়া রঙ্গনাথম লইয়া গেলেন। বাক্সে মোট ৯০৸৴০ মাত্র।

'চুরি হয়'

।৪৬ (১৯শে বৈশাখ ১৩৫৩)—বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীশ্রীকোরকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দিরের দরজার কুলুপ ভাঙ্গিয়া মায়ের হাতে সোনার খাড়া, ৮ গাছা চুড়ি, গলায় সোনার মুজুরী সূত্র, রূপার শঙ্খের Stand, চন্দনের বাটী একটি বড় এবং একটী ছোট, ২টী তাম্রকুণ্ড, একখানি নীলপাড় আমাদের কাপড় প্রভৃতি সব চুরি হইয়া গিয়াছে। মায়ের সামনে ভক্তদের যে কাঠের বাক্সটি ছিল চোরে তাহা পাঁচিলের বাহিরে লইয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তাহাতে যাহা ছিল সমস্ত বাহির করিয়া লয়। তাহাতে আন্দাজ ছিল ৪৲ টাকা হইবে। বেলা ১১টার সময় রঙ্গনাথমবাবা পুলিশ ইনস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া এখানকার সমস্ত চাকরদের নাম লিখিয়া লইয়া যায়। ঐদিনই শ্রীশ্রীসাধুবাবা কোরকোণ্ডায় আসিয়া আমাদের সান্ত্বনা দিয়া সন্ধ্যার পর ভিজিয়ানাগ্রাম চলিয়া যান।

৭।৪৬ (৩০শে আষাঢ় ১৩৫৩)—সোমবার দুপুর হইতে মহারাণী মাতার আজ্ঞা

অনুযায়ী আমরা অর্থাৎ তুলসী, পরিতোষ কোরকুণ্ডেশ্বরীর মায়ের মন্দি
রাত্রে ও দিনে শুইতেছি।

১।৭।৪৬ (১৬ই আষাঢ় ১৩৫৩)—সোমবার ভিজিয়ানাগ্রামে রাজার রা
অভিষেক হইল। এই দিন সকালে ৮ ঘটিয়ায় বেনারস রাজকুমা
(ভিজি-স্যার বিজয়ানন্দ) ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে কোরকুণ্ডায় মায়ের মন্দি
আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া স্নান করিয়া মায়ের পূজা ও আর
করিয়াছিলেন। পরে প্রণামী স্বরূপ তুলসী পরিতোষকে একটি গি
দিয়াছেন। গিণিখানি ১৮৭৭ সালের—ভিক্টোরিয়া মার্কা।

১৬।৮।৪৬ (৩১শে শ্রাবণ)—শুক্রবারে কলিকাতা হিন্দু মুসলমানে লড়
হইয়াছিল। লড়াইয়ের দরুণ বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় ২।৩ হাজ
লোক মারা গিয়াছে।

২১।৯।৪৬ (৪ঠা আশ্বিন ১৩৫৩)—শনিবার একাদশীর দিন বৈকাল ৪টার স
কোরকোণ্ডায় মায়ের মন্দিরের দক্ষিণদিকে বেশ মেঘ করিয়াছিল। ঐ স
আশ্চর্যজনক একটী ঘটনা ঘটে। ঘটনাবলী হইতেছে এই, হঠাৎ মে
ভিতর হইতে একটি প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় মেঘ রাশি নামিতে থাকে এ
খানিক দূরতক নামিয়া পুনরায় ফিতা গুটানোর ন্যায় ক্রমশ উঠিয়া যা
এইরূপ ১৫ মিনিট কাল উঠা নামার পর মেঘের সহিত আবার লী
হইয়া গেল।

২৯।১০।৪৬ (১২ই কার্তিক)—মঙ্গলবার সকালবেলা আশ্রম হইতে কা
কোরকোণ্ডায় মাষ্টারের সঙ্গে থাকিবার জন্য আসিয়াছে।

৪।১১।৪৬ (১৮ই কার্তিক)—সোমবার বৈকাল ৫টার সময় তুলসী, পরিতে
ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে আশ্রমে আসিয়া পৌছাইয়াছে। আশ্রমে ত
অরুণদা, দাদু উপস্থিত ছিলেন।

৯।১২।৪৬—সোমবার গণপরিষদ অধিবেশন দিল্লীতে হইয়াছে।

২৮।১২।৪৬ (১২ই পৌষ ১৩৫৩)—শনিবার কাকা হাত দিয়া দেবেদের বা
দেওয়া শ্রীশ্রীসাধুবাবার একখানি হাফসাইজ ফটো কোরকোণ্ডায় কালি
মাষ্টারের কাছে পোষ্টে কেদার কানন হইতে পাঠাইয়া দিয়াছি।

৩।১।৪৭—শুক্রবার কাকার বাড়ী হইতে খাট আনিয়া দাদুকে শুইবার জন্য দা
দিয়া গেলেন।

তুলসীর ডায়েরী

'পলাশা যাত্রা'

১৩।৪।৪৭ (৩০শে চৈত্র)—রবিবার মাদ্রাজ মেল যোগে শ্রীশ্রীসাধুবাবা, তুলসী, পরিতোষ, কমলা আম্মা, রাও সাহেব, বসন্ত, দিল্লী আম্মা প্রভৃতি সকলে পলাশায় মূর্ত্তি সাহেবের বাড়ি গ্রামের নাম কত্তা অগ্রহায়ণম্ অভিমুখে যাত্রা করি। তথায় ৯ রাত্রি বাস করিয়া অর্থাৎ নবরাত্রি শীতাকল্যাম্ করিয়া পরদিন অর্থাৎ 23।4।47 তারিখে বাং ৯ বৈশাখ বুধবার মাদ্রাজ প্যাসেঞ্জার যোগে বহরামপুরে সীতা আম্মার শ্বশুর বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করি। পরদিন বৃহস্পতিবার ৯টার সময় আমরা সদলবলে সিতা আম্মার বাড়ীতে আসিয়া পৌছাই। সেখানে ৩ রাত্রি কাটাইয়া গত 27।4।47 তারিখে রবিবার রাত্রি ১০টার ট্রেণে পরদিন বেলা ৩৷৷০টার সময় কাকীনাড়ায় রাওবাবার বাড়িতে আসিয়া পৌছাই।

কাকীনাড়ায়

৯।৫।৪৭ (২৫শে বৈশাখ)—শুক্রবার রবি ও অন্নপূর্ণামা ভাইজাগ হইতে কাকীনাড়ায় রাওবাবার বাড়ীতে পৈতা উপলক্ষ্যে বৈকাল ৪৷৷০টার সময় আসিয়া পৌছাইয়াছে। রবি ও অন্নপূর্ণামা ২ দিন থাকিয়া আবার ভাইজাগ চলিয়া গিয়াছে।

১২।৫।৪৭ (২৮শে বৈশাখ)—সোমবার রাওবাবার ছেলে রাজার পৈতা হইয়া গেল। শ্রীশ্রীসাধুবাবা, তুলসী, পরিতোষ, রবি, বসন্ত, অন্নপূর্ণা এইকয়জন উপস্থিত ছিলাম।

১৬।৫।৪৭ (১লা জ্যৈষ্ঠ)—শুক্রবার একাদশীর দিন রাওবাবার কাকীনাড়ায় বাড়ীতে ব্যাসপীঠে যজ্ঞ হইয়াছে।

২৮।৫।৪৭—বুধবার ভোর ৫টার সময় কাকীনাড়া হইতে বাহির হইয়া ভাইজাগে অনাদিদাদার বাড়িতে বেলা ১১৷৷০টার সময় পৌছাইয়াছি। শ্রীশ্রীদাদা, তুলসী, পরিতোষ, বসন্ত।

গোদাবরীতে স্নান

১৮।৫।৪৭—তুলসী, বসন্ত, ও একজন তেলেগু ব্রাহ্মণ এই চার জনে রাজ বাগি— গিয়াছিলাম।

৩০।৫।৪৭—অনাদিদার বাড়ি হইতে নৌকা করিয়া জাহাজে বেলা ১টার সময় গিয়াছিলাম। এবং বৈকাল ৪টের সময় তুলসী, পরিতোষ, প্যাডি ও বসন্ত সমুদ্রের উপর নৌকা করিয়া গিয়া একটী মস্ত বড় পাহাড়ের উপর ('ডলফিন নোস') গিয়াছিলাম। ফিরিলাম সন্ধ্যার সময় পাহাড় হইতে সমস্ত টাউনটি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রোজ হাট বাজার আমরা ২ জনে করিতাম। ছিলাম ১ সপ্তাহ কাল।

ভারতের ইতিহাস

৩।৬।৪৭—মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় বড়লাট, জহরলাল, জিন্না, বলদেব সিং, প্রভৃতি ইহারা রেডিওতে বক্তৃতা দিয়াছেন। বিষয়-বিরূপভাবে শক্তি হস্তান্তরিত করা হইবে। বেঙ্গল ভাগ, পাঞ্জাব এবং আসাম ভাগ প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছে।

'সিংহাচলম্ যাত্রা'

৪।৬।৪৭—বুধবার তুলসী, পরিতোষ, বসন্ত ও অন্নপূর্ণামার ছেলে প্যাডি সিমাচল পাহাড়ে গিয়াছিলাম। ভাইজাগে অনাদিদাদার বাড়ী হইতে যাত্রা ভোর ৪টা। বেলা ৩টার ঝটকা করিয়া ফিরিয়াছি।

কলিকাতা যাত্রা

৯।৬।৬৭ (২৫শে জৈষ্ঠ)—সোমবার ৩।২৫ মিনিটে ভাইজাগে অনাদিদাদার বাড়ী হইতে শ্রীশ্রীসাধুবাবা, তুলসী, পরিতোষ, বসন্ত, বিমলদা, প্যাডি মাদ্রাজ মেলযোগে আশ্রমে ফিরিয়াছি।

(গারদ বাস)

১৪।৬।৬৭ (৩০শে জৈষ্ঠ)—শনিবার বড়বাজার থানায় কুষ্টবাবা, কেশবদা, তুলসী, পরিতোষ এই ৪ জনকে ১ রাত্রি হাজত বাস করিতে হইয়াছে। পরে কোর্টে উঠিয়া ৫৲ টাকা ফাইন দিয়া আশ্রমে ফিরিতে হইয়াছে।

(ভিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা)

৭।৬।৪৭—শনিবার ভাইজাগ হইতে মোটরযোগে শ্রীশ্রীসাধুবাবা, তুলসী,

পরিতোষ, বসন্ত, বিমলদা, কৃষ্ণবাবু আরও ৩।৪ জনে ভিজিয়ানাগ্রাম আসিয়াছিলাম। Journey ৪২ মাইল হইবে।

(কোরকোণ্ডা যাত্রা)

৮।৬।৪৭—রবিবার সকাল ১০টার সময় ২খানি ঝটকা করিয়া তুলসী, পরিতোষ, বসন্ত, বিমলদা, অন্নপূর্ণামা, কেষ্টবাবু প্রভৃতি সকলে কোরকোণ্ডার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন করিয়া এবং প্যালেসের চারিদিকে ঘুরিয়া বেলা ৯টায় যাত্রা করিয়া বেলা ২টায় রাঘবাচারীর বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

(ওয়ালটেয়ার হইতে আশ্রম যাত্রা)

৯।৬।৪৭—সোমবার শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও আমরা ৩।২০ মিনিটে মাদ্রাজ মেল যোগে Waltair হইতে হাওড়ায় আসি ও হাওড়া হইতে নিমাইবাবুর বাড়িতে গিয়া উঠি। পরদিন বেলা ১২টার সময় আমি ও পরিতোষ মোটরে করিয়া আশ্রমে আসি।

(গোড়ে যাত্রা)

১৭।৬।৪৭—তুলসী, পরিতোষ ও কেশবদা এই ৩ জনে সকাল ৯টার সময় বাহির হইয়া বাসে করিয়া গোড়ে মায়ের দর্শন করিয়া তথায় ১ঘণ্টা কাল বসিয়া পুনরায় চক্রবেড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

(বঙ্গভঙ্গ)

২০।৬।৪৭ (৫ই আষাঢ়)—শুক্রবার Bengal Partition সেটেল হইয়াছে।

১।৮।৪৭ (১৫ই শ্রাবণ)—শুক্রবার সকাল ৯টার সময় আশ্রম হইতে দাদু পাটনা রওনা হইয়াছেন। আমরা ১৫৲ টাকা দিয়াছি। গার্ডমা ২০৲ টাকা দিয়াছে ও ২৲ টাকা ভিক্ষা করিয়া লইয়াছেন।

১২।৮।৪৭—মঙ্গলবার BLB 6099 নম্বরের একটি বাস শ্রীশ্রীসাধুবাবাকে ভক্তবাহাদুর কিনিয়া দিয়াছেন। দাম নিয়াছে ৭ হাজার টাকা।

১৯৪৭—স্বাধীনতার দিন

১৫।৮।৪৭—শুক্রবার ভারতে সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরব্যাপী কুখ্যাত বৃটিশ শাসনের

অবসান। বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টায় গণপরিষদের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের সেবার সঙ্কল্প গ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর পদে শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী বৃহস্পতিবার রাত্রিতে দরবার কক্ষে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ।

দক্ষিণেশ্বরে উৎসব

২৯।৮।৪৭ (৩১শে শ্রাবণ)—রবিবার প্রতিপদ ঐদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে কালিফিল্মের প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসব হইয়াছে। বহু ভক্তবৃন্দ সমাগম হইয়ছিল। আশ্রম হইতে আমরা সবাই গিয়াছিলাম ও ২।১ দিন থাকিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছি।

২১।৯।৪৭ (৪ঠা আশ্বিন, ১৩৫৪)—রবিবার শ্রীশ্রীসাধুবাবা আমাদের বলিলেন, "আজ হইতে আর তোমাদের হিসাব দেখাইতে হইবে না ও লইতেও হইবে না।" তখন রাত্রি ৯টা।

২১।১০।৪৭ (৩রা কার্তিক)—মঙ্গলবার সপ্তমীর দিন বাকসাড়া আশ্রমে অর্থাৎ 'কেদার কাননে' কূর্মপীঠে মায়ের বেদী তৈয়ার করা হইয়াছে এবং ঐদিন হইতে সমস্ত ঘট বেদীর উপর বসান হইয়াছে। এবং ৫জনে পূজা করা হইয়াছে। তুলসী, পরিতোষ, মাষ্টার, মনোময় ও কেশবদা এই ৫ জনে। মোটের উপর ১৯টি ঘট ও ৭টি কমণ্ডলু বসান।

বাকসাড়া আশ্রমের ভার—১৯৪৮

২০।১।৪৮—মঙ্গলবার ঐদিন হইতে আশ্রমের ভারবালির কৃষ্ণর যাতে দিয়া দিয়াছে। আমি ও পরিতোষ ঐদিন হইতে অন্য কাজে লিপ্ত হইয়াছি। আশ্রম-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমরা নাই।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর কথা

৩০।১।৪৮ (১৬ই মাঘ)—শুক্রবার পঞ্চমী তিথি উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র বৈকাল ৫।৪০ মিঃ মহাত্মা গান্ধী প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় যাইবার কালে এক ২৪।২৫ বৎসরের যুবক পিস্তল দিয়া গান্ধীকে পেটে আঘাত করে ও তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। শুনিলাম যুবকটি নাবি

মারাঠী। মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ শনিবার ৪টার সময় যমুনা নদীর তীরে তাঁহাকে দাহ করা হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে

ঝাঁঝাঁ যাত্রা

১১।১।৪৮ (২৮ বৈশাখ)—বুধবার রাত্রি ২টা ১০ মিনিটে শ্রীশ্রীসাধুবাবা সদলবলে বাক্‌সাড়া আশ্রম হইতে সাহারানপুর, মধুপুর ও ঝাঁঝা রওনা হইয়াছেন।

২৫।২।৪৮—"আমি তুলসীকে বলিলাম, সবই তোমার।" ইতি পরিতোষ। এবং তুলসীও আমাকে তাহার সর্বস্বই অর্থাৎ মন, প্রাণ, ধন, দৌলত প্রভৃতি সবই আমাকে সমর্পণ করিয়াছে। ইতি তুলসী পরিতোষ।

২১।৩।৪৮ (৮ই চৈত্র)—রবিবার একাদশীর দিন টালিগঞ্জের (বাড়িতে) অন্নপূর্ণামার নূতন বাড়িতে পরিতোষ ও আমি যজ্ঞ উপলক্ষে গিয়া ১ রাত্রি থাকিয়া পরদিন সকালবেলা আশ্রমে আসিয়াছি।

৯।৪।৪৮ (২৭শে চৈত্র)—শুক্রবার অমাবস্যার দিন রেবতীনক্ষত্রে সকালে ১০।১১টার সময় ভালুপালের ত্রিশূল ৯টি উচ্ছুগু করিয়া মায়ের চারিপার্শ্বে রাখা হইয়াছে।

১০।৪।৪৮ (২৮শে চৈত্র)—শনিবার প্রতিপদের দিন শ্রীশ্রীসাধুবাবা, নিমাইবাবা ও আর আর সকলে সন্ধ্যার সময় মোটরযোগে আশ্রমে আসিয়া এই কয়টি জিনিস নিমাইবাবার বাড়ি লইয়া যান।

পিতলের থালা—৫টি
পিতলের বড় ডোল—১টি
পিতলের ছোট ডোল—১টি
পেট্রোম্যাক্স লাইট—৪টি
মাদরাসী বালতী—১টি

আজ বৎসরের প্রথম দিন

১৪।৪।৪৮ (১লা বৈশাখ)—বুধবার পঞ্চমী তিথি শ্রীশ্রীসাধুবাবা কলিকাতা হইতে আশ্রমে আসিলেন ও অন্নপূর্ণা পূজার বোধন শুরু করিলেন, মায়ের পূজা করিলেন। বিমলদা ও হিরন্ময়দা, আমি ও পরিতোষ পিছন দিকে যজ্ঞ করিলাম।

বাসন্তীপূজা

১৪।৪।৪৮ (৩রা বৈশাখ)—আজ বাসন্তী পূজা। শ্রীশ্রীসাধুবাবা কলিকাতা হইতে আসিয়া পরিতোষ, মাষ্টার ও আমাকে কলিকাতায় ঘুরিয়া আসিবার জন্য বাহির করিয়া দিয়াছেন। আমরা সকাল হইতে ঘুরিয়া রাত্রি ১০টার সময় আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছি।

আশ্রমের হিসাব

১৭।৪।৪৮ (৪ঠা বৈশাখ)—শনিবার আজ অন্নপূর্ণা পূজা। শ্রীশ্রীসাধুবাবা আবার আশ্রম চালাইবার জন্য আমার হাতে ২৭৲ টাকা দিয়াছেন।

(ভিক্ষা)

১।৫।৪৮ (১৮ই বৈশাখ)—শনিবার ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে শ্রীরামলুবাবার ছেলে আনন্দম্ ও অপ্তাল আম্মার ছোট ছেলে বাক্‌সাড়া আশ্রমে আসিয়া পরদিন আমার সহিত বালীগঞ্জে শ্রীশ্রীসাধুবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ঐদিন শ্রীশ্রীসাধুবাবাকে আশ্রমের খরচের জন্য আমি নিজে চাহিলাম। কোন উত্তর দিলেন না। পরে ভিক্ষা করিবার আদেশ দিলেন। ঐদিন আম্মামা মায়ের ভোগের জন্য ১০৲ টাকা ভিক্ষা দিয়াছেন।

"চেক"

১৪।৫।৪৮—শুক্রবার ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে মহারাণী মাতা অরুণদার নাম দিয়া একখানি চেক পাঠাইয়াছে। আমি সেই চেক ভবানীপুরে অরুণদার বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছি।

আশ্রমের গরু

২৪।৫।৪৮ (১০ই জ্যৈষ্ঠ)—সোমবার প্রতিপদে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে হাওড়ার ডাক্তারদা বাক্‌সাড়া আশ্রমে একটি ২৷৷০ বৎসরের গরু পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীসাধুবাবা তখন অগ্রদ্বীপ গিয়াছেন। তাঁহার আদেশে ও সুবীরের কথামত ডাক্তারদা এই গরুটিকে পাঠাইয়াছে।

ভিক্ষা নাই

২।৬।৪৮ (১৯শে জ্যৈষ্ঠ)—বুধবার পরিতোষ আশ্রম হইতে বিডন ষ্ট্রীটে দেবেদের বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়া বিমুখ হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসে।

মৃত্যু সংবাদ

১।১২।৪৮ (১৫ই অগ্রহায়ণ)—বুধবার শ্রীশ্রীসাধুবাবার কন্যা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমরা শনিবার খবর পাইয়াছি ৪ তারিখে।

আশ্রমের কাউন্সিল—১৯৪৮, ১৩৫৫ সালে

১৮।৭।৪৮ (২রা শ্রাবণ)—রবিবার শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও নিমাইবাবা, বিমলদা ও আর আর সকলে আশ্রমে আসিয়া কাউন্সিল মেম্বার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রথমে বাক্সাড়ার মধ্যে দুলালদার টাকা জমা লওয়া হইয়াছে। পরে আর আর সকলে।

১৫।১১।৪৮ (২৯শে কার্তিক)—সোমবারও ক্ষণিকদর্শন হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য শিক্ষা

১৬।১১।৪৮ (৩০শে কার্তিক)—বৃশ্চিক নক্ষত্রে মঙ্গলবার পূর্ণিমার দিন সকাল ১০টার সময় পরিতোষের মাতৃদর্শন হইয়াছে—পূর্ণরূপে ঐদিনেই পরিতোষকে পূর্ণিমায় শুরু করিলাম।

আশ্রমের ভাব

৩০।৬।৪৮ (১৬ই আষাঢ়)—বুধবার অষ্টমীর দিন হইতে খরচ চালাইতেছে পান্নালাল। এই দিন হইতে পরিতোষ ও আমি অর্থাৎ তুলসী ছুটি পাইলাম।

আশ্রমে নারায়ণ আসিয়াছেন

২৯।৪।৪৮ (১৩ই ভাদ্র)—রবিবার নবমীর দিন পার্ক ষ্ট্রীট হইতে মদনমোহন, গোপাল, দুর্গা ও অনেকগুলি নরায়ণকে বাক্সাড়া আশ্রমে সেবা করিবার জন্য রাখিয়া যান।

আশ্রমে ইলেক্‌ট্রিক শুরু

২৮।৯।৪৮ (১২ই আশ্বিন)—মঙ্গলবার দশমী তিথিতে সকাল ১০টা হইতে শুরু করিয়া ৩।৪ দিনে লাইট জ্বালাইয়া দিয়াছে। ১লা অক্টোবর শুক্রবার বৈকাল ৫।৫ সময় আশ্রমের ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালাইয়া দিয়াছে।

৫।১১।৪৮—১৯শে কার্তিক ইং ৫ই নভেম্বর ১৯৪৮ শুক্রবার চতুর্থীর দিন বাক্‌সাড়ায় নতুন হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে ঠাকুর ঐদিন হাওড়ায় সুরেন সরকারের বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন।

৭।১২।৪৮—শ্রীশ্রীসাধুবাবার বহরমপুর ও বেড়োযাত্রা মঙ্গলবার দিন সকাল ১০টার সময় শ্রীশ্রীবাবা ভক্তদের লইয়া যাত্রা করেন।

আশ্রমে পরিতোষ ও আমি, শীতলদা, দাদু এই কয়জন রহিলাম।

১৯।১২।৪৮ (৪ঠা পৌষ)—রবিবার তৃতীয়ার দিন সকাল ১১টার সময় গুরুতী, রাজা বাক্‌সাড়া আশ্রম হইতে ভিজিয়ানাগ্রাম রঙ্গচারীর আশ্রমে গিয়াছে। ঐদিন একটার সময় কানাই ও যোগীনবাবু এখান হইতে বেড়ো যাত্রা করিয়াছে।

২৯।১২।৪৮ (১৪ই পৌষ)—বুধবার চতুর্দশীর দিন সকাল ৯টার সময় আশ্রম নলিনীমা ও পিতম পাঞ্জাব এক্‌সপ্রেসে করিয়া আসানসোল ও বার্ণপুর ও বেড়ো যাত্রা করিয়াছেন।

৩১।১২।৪৮ (১৬ই পৌষ)—শুক্রবার প্রতিপদের দিন রাত্রি ১১।৷০ টার সময় বেড়ো হইতে কানাইদা, যোগীনবাবা, কৃষ্ণ ও মাষ্টার আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে।

১৮।১।৪৯ (৬ই মাঘ)—মঙ্গলবার কানাইকে শ্রীশ্রীসাধুবাবা ২৭৲ টাকা দিয়া আশ্রম হইতে ছুটী করিয়া দিয়াছেন।

সংযম পথ

১৮ই জানুয়ারী ৬ই পৌষ মঙ্গলবার ১২টার সময় শ্রীশ্রীসাধুবাবার হাতে আমি অর্থাৎ তুলসী সমস্ত আশ্রমের হিসাব দিয়া দিয়াছি।

৩০।১।৪৯ (১৭ই মাঘ ১৩৫৫)—"বাক্‌সাড়া আশ্রমে মিটিং"—দিনে বেকালে ৪টার সময় আশ্রমের জমি সংক্রান্ত, টাকা আদায় ও আশ্রম কিরূপে চলিবে তাহার বিষয় আলোচনা হইয়াছে।

১২।২।৪৯—মঙ্গলবার ভিজিয়ানাগ্রামের সেক্রেটারী রঙ্গনাথমবাবার বড় ছেলে

N. N. Murti বেলা ২টার সময় আশ্রমে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। অরুণদাও আশ্রমে ছিলেন।

২৭।২।৪৬—বুধবার আমার মার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ হইয়াছে। কাজ আমিই করিয়াছি। দাদাও ঐদিনে বাবা ও মার কাজ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ২ জন নাম অনাথ ও দুলাল চ্যাটার্জী। রঙ্গনাথনের বড় ছেলে নারায়ণ মূর্তি আশ্রমে ১৫ দিন থাকিয়া আজ চলিয়া গেল। অরুণদাও উহার সহিত ১৫ দিন থাকিয়া আজ ভবানীপুরের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

২৯।১।৪৯ (১৬ই মাঘ)—শনিবার বাক্‌সাড়া জগৎজননীর আশ্রমে প্রথম মিটিং হইবার আগের দিনে রাত্রি ৯টার সময় হিরন্ময়দা কলিকাতা হইতে আশ্রমে আসিয়াছিলেন ও পরিতোষকে ও আমাকে এই ডায়েরীটা উপহার করিয়া দেন। ঐদিন হইতেই এ ডায়েরী ব্যবহার হইতেছে।

১।৩।৪৯ (১৩ই ফাল্গুন)—মঙ্গলবার বাক্‌সাড়ায় পোস্ট অফিস হইয়াছে। এই দিন হইতে কাজ চলিতেছে।

২০।৩।৪৯ (৬ই চৈত্র)—রবিবার বৈকালবেলা আশ্রম হইতে দাদু মেদিনীপুর ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া যায়। পরদিন শ্রীশ্রীসাধুবাবা সন্ধ্যা ৭টায় আশ্রমে আসিয়াছেন।

১১।৫।৪৯ (২৮শে বৈশাখ)—বুধবার আশ্রমে সর্বপ্রথম নতুন মিটার দিয়া গিয়াছে। আজই একটি ক্লক ঘড়ি আশ্রমে আসিয়াছে। ঘাটে একটি কুড়েঘর তৈয়ারী হইয়াছে।

ময়ূর

২০।৬।৪৯ (৬ই আষাঢ়)—সোমবার কীর্তনের পর জাবছা হইতে কলিবাবু একটি ময়ূর আশ্রমে দান করিয়াছে।

ভিক্ষা

৩।৭।৪৯—রবিবার সকাল ৯॥০ টার সময় শিবুদা আসিয়া আশ্রম হইতে ১০টী জানালা ও ৪টী দরজা লইয়া বাক্‌সাড়া হাইস্কুলের জন্য লইয়া গিয়াছেন।

১০।৭।৪৭ (২৫শে আষাঢ়)—রবিবার ১৪৭ অব্দ ফাল্গুনি পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন ২৩শে ফাল্গুন শনিবার ২৪ বৎসর গৃহস্থ

আশ্রমে ছিলেন। চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাস আশ্রমে ছিলেন। চব্বিশ বৎসর শেষে সেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।

৮।১১।৪৯ (২২শে কার্তিক)—মঙ্গলবার শ্রীশ্রীদাদার ৫।৬ দিন জ্বর হইবার পর আজ সকালবেলা নিমাইবাবা, বিমলবাবা প্রভৃতি সকলে আসিয়া কলিকাতায় নিমাই বাবার বাড়ি লইয়া যান।

ফাঁসি

১৫।১১।৪৯ (২৯শে কার্তিক)—আম্বালা জেলে সকাল ৮টার সময় নাথুরাম গড্‌সের ফাঁসি হইয়াছে। এইরূপ শুনিলাম।

মহারানীমাতা

৩১।৮।৪৯ (১৪ই ভাদ্র)—বুধবার "রাধা অষ্টমীর দিন" সকাল ১০টার সময় মহারানীমাতা বাক্‌সাড়া আশ্রমে কুমারীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। প্রায় ২ ঘণ্টা কাল আশ্রমে ছিলেন।

গোয়ালঘর

১৪।৯।৪৯ (২৮শে ভাদ্র)—আশ্রমের পিছন দিকে খড়ের চাল দেওয়া একটী গোয়ালঘর তৈয়ারী করিয়া আজ হইতে গরু রাখা হইতেছে।

অগ্রদ্বীপ যাত্রা

২৯।৭।৪৯ (১৩ই শ্রাবণ)—শুক্রবার আমি ভীষ্মবাবা, আন্নামা এই তিনজনে শ্রীশ্রীসাধুবাবাকে আনিবার জন্য অগ্রদ্বীপ গিয়াছিলাম। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় হিরণ্ময়দা, জ্যোতি, মাটুদা, সন্ন্যাসী পরদিন সকালের ট্রেনে নিমাইবাবা বিমলদা ও সুধীরদা ও আরো দুজনা শ্রীশ্রীসাধুবাবাকে আনিবার জন্য গিয়াছিলেন।

৩১।৭।৪৯ (১৫ই শ্রাবণ)—রবিবার সকাল ১২টার সময় অগ্রদ্বীপ হইতে শ্রীশ্রীদাদা ও আমরা সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি।

৫।১২।৪৯ (১৯শে অগ্রহায়ণ)—সে এই প্রথম আশ্রমে দুগাছার কালিবাবুর দেওয়া সত্যনারায়ণীর শিন্নি হইয়াছে। ইহার আগে শিন্নি আশ্রমে আর হয় নাই।

বেনারস যাত্রা

।১২।৪৯—সোমবার পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীদাদা ও মহারানীমাতা এই প্রথম Aeroplaneএ করিয়া ভোর ৬টার সময় দমদম হইতে বেনারস যাত্রা করিয়াছেন। ইহার আগের দিন বাক্স ও বেডিং লইয়া হিরন্ময়দা, কমলামা, অগ্রদীপের একটী ছেলে ও গৌরদা কয়জনে চলিয়া যায়।

৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৫—নিজ হাতে নিলেন কোদাল, সাধুবাবা হোলীর দিন নিজ হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে বাকসাড়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন।

।৩।৫১ (শুক্রবার)—আজ আশ্রমের পুকুরের পশ্চিমপার্শে দুপুরে ২টার সময় ২টি সাপে শঙ্খ লাগিয়াছিল। সন্ধ্যায় আমি মায়ের আরতি করিয়াছি। শুনিলাম বিমলদা আজ মেলে ভিজিয়ানাগ্রামে সাধুবাবাকে আনিবার জন্য যাইবেন।

৯।৩।৫১ (সোমবার)—শ্রীশ্রীদাদার ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে ফেরার কথা আছে। পরে সন্ধ্যায় খবর পাইলাম দাদা কলিকাতায় বিমলদার বাড়ী ফিরিয়াছেন। এই খবর রাওসাহেব সাঁত্রাগাছী স্টেশন হইতে বাকসাড়া ফাঁড়ীতে দিয়াছিলেন। আশ্রমে কমলামা, শান্তিমা, লীলামা আসিয়াছিলেন। আজ কয়দিন আশ্রমের চারদিক পরিস্কারের কার্যেই কাটিয়া গেল। পানমা বৈকালে আসিয়াছে।

৬।৩।৫১ (সোমবার)—বালিগঞ্জ হইতে শান্তিমা শ্রীশ্রীতারামাকে আজ সকালে আশ্রমে বরাবরের জন্য পূজা করিতে দিয়া গেলেন। আমি মাকে অভিষেক করিলাম ও পূজা করিলাম। শ্রীশ্রীদাদা তখন বালিগঞ্জে বিমলদার বাড়িতে আছেন। সেই কারণে আমি কমলামাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রম হইতে হরিহর বাবার বাড়ী ঘুরিয়া বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে মাকে রাখিয়া শ্রীশ্রীদাদাকে তারা মায়ের খবর দিবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু দাদার দেখা পাইলাম না। পরে কেশবদার দোকান ঘুরিয়া কমলামাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলাম।

।৪।৫১ (সোমবার)—সন্ধ্যার সময় যোগীনবাবা প্রায় ১২ দিন বাড়ীতে কাটাইয়া আজ আশ্রমে আসিলেন। আমি পূজা করিলাম। আশ্রমে 'চন্দন' পাহাড়ে প্রত্যহ ২।১ বাটি করিয়া চন্দন ঢালিতেছি।

১০।৪।৫১ (মঙ্গলবার)—কমলামাকে লইয়া আজ দুপুরে ৩টায় আয়া মার বাড়ীতে রাখিয়া ঘোষ বাবার বাড়ী ও হরিহর বাবার বাড়ী ভিক্ষা করিয়া রাত্রে আমি আশ্রমে ফিরিলাম ও শুনিলাম শ্রীশ্রীদাদা বিমলদার বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। চন্দন পাহাড়ের সামনেকার রূপার রাধাকৃষ্ণ দাদা আজ লইয়া গেলেন।

১২।৪।৫১ (বৃহস্পতিবার)—আজ সকালে ৭টায় পাপার বরকে আশীর্বাদ করিতে আমি ও পরিতোষ গিয়াছি ও সেখান হইতে ট্রেনে করিয়া আয়ামার বাড়ী লক্ষ্মীপূজা করিতে গিয়াছি। বৈকাল ৪টার সময় শ্রীশ্রীদাদা আয়ামার বাড়ী আসিয়াছিলেন ও আমাদের বলিলেন, "তোমরা কাহাকে আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছ?" আমরা বলিলে তিনি বলিলেন, "তোমরা দু'জনে না আসিয়া ১ জনে আসিলে না কেন?"—এই বলিয়া বালি রহনা হইলেন।… শ্রীশ্রীদাদা সন্ধ্যায় আসিলেন। পূজা আরতি সারিয়া রাত্রি ৯টায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

১৩।৪।৫১ বাসন্তীপূজা (শুক্রবার)—সকালে ৯টায় শ্রীশ্রীদাদা ও বিমলদা মোটরে করিয়া আসিয়াছেন। দুপুরে পূজা ও ভোগ হইল। অনেক ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছে।…দাদা পরিতোষকে রাত্রি ১০॥০ টায় মহাভারত পড়িতে বলিলেন।…সন্ধ্যার কীর্তনে আজ খুব আনন্দ হইয়াছে। নলিনীমা দাদাকে দুই বেলাই রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছেন।

১৮।৫।৫১ (শুক্রবার)—আজ হাওড়া হোমে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পরিতোষ, আমি, সুবোধ দেখিয়া আসিলাম। আশ্রমের ময়ূরটি সকালে হঠাৎ অজ্ঞানের মতন হইয়াগিয়াছিল। আমি চরণামৃত দেওয়ার পর উঠিয়া ক্রমশঃ সুস্থ হইয়াছে। গতরাত্রে পরিতোষ স্বপ্ন দেখিয়াছে আমি ও পরিতোষ পাহাড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়াছি। এমন সময় পরিতোষ দেখিল আমার মাথায় একটি বড় সাপ সামান্য ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরিতোষ তখন আমায় বলিতে লাগিল চুপ করিয়া বসিয়া থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে পরিবেশন

২৫।৭।৫১ (বুধবার)—শ্রীশ্রীদাদা দুপুরে ২টায় আশ্রমে আসিয়াছেন। ও রাত্রি ১১টায় আকরার রাজাবাবার মোটরে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আজ

শ্রীশ্রীদাদা নিজহাতে রাত্রে আম ও দই মিষ্টি পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়াছেন। সন্ধ্যায় আমি কীর্তন শুরু করিলাম। পরে দাদাও যোগ দিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা কীর্তন হইল।

২৬।৯।৫১ (বুধবার)—সকাল ১১টার সময় শ্রীশ্রীদাদা একটী ট্যাকসি করিয়া আশ্রমে আসিলেন। বালি হইতে একটী ভক্ত নাম শিশিরবাবু ৫।৬ দিন ধরিয়া আসা যাওয়া করিতেছেন, আজও সকালে আসিয়াছিলেন। প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া গেলেন। পরিতোষ ও শিশিরবাবু দুজনে আজ দুপুরে ভাগবত পাঠ করিয়াছে। আজ দুপুরে কথায় কথায় পরিতোষকে বলিলেন খুব সাবধান মায়ের সামনে কারুকে প্রতিশ্রুতি করাইও না এখানকার পূজা কে করিবে, এখানে মায়ের পূজা করিতে হয় না। এখানে অশৌচ নাই পূজা নাই, সরস্বতীর বিবাহ হইবার আগে বৈকুণ্ঠে যাহা সম্বন্ধ হইয়াছিল সেই বৈকুণ্ঠসম্বন্ধে এখানে সম্বন্ধ হইয়াছে। স্বভাবের সহিত কথা কহিয়া এই সম্বন্ধ হয়।

৩০।৯।৫১ (রবিবার)—শ্রীশ্রীদাদা আশ্রমে আছেন আজ (মহালয়া) জলে নামিয়া অনেকে তর্পণ করিলেন। পিতৃযজ্ঞ আজ শেষ হইল রাত্রে বিমলদা ও বুলুদা দাদাকে লইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু গেলেন না।

১।১০।৫১ (সোমবার)—দাদা ১০টার সময় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে ও পরিতোষকে বলিয়া গেলেন আজ হইতে আবার দেবী পক্ষের যজ্ঞ স্বরু কর।

৬।১০।৫১ (শনিবার) ষষ্ঠী—আজ রাত্রি ১০টার সময় মায়ের মূর্তি আসিয়াছে।

৭।১০।৫১ (রবিবার) সপ্তমী—মাঝের বেদীর উপর মায়ের পূজা হইয়াছে। আমি বেদীতে মায়ের পূজা ও পরিতোষ, মাষ্টার ও চাটুজ্যে ঠাকুরঘরে এই ৪ জনে মায়ের পূজা আরতি করিয়াছি। বলাইদা বৈকালে আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় ধ্রুপদগান ও কীর্তন হইয়াছে। সকালে পরিতোষ ও আমি যজ্ঞ সারিয়া লইলাম। রাত্রে হিরন্ময়দা কেশবদা ডাক্তার দাদা প্রভৃতি অনেক ভক্তরা আশ্রমে ছিলেন।

৮।১০।৫১ (সোমবার)—আজ (মহাঅষ্টমী) আমি ঠাকুরঘরে পরিতোষ ও মাষ্টার ৩ জনে মহাষ্টমীর পূজা করিলাম। চাল ডাল প্রভৃতি দিয়া ভোগ সাজান হইল। অদ্বৈতদা আজ আসিয়াছেন। আজ সন্ধ্যা হইতে খুব গান

বাজনা প্রায় রাত্রি ২টা পর্যন্ত গান ভজন প্রভৃতি সকলেই মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে। এত আনন্দ হইয়াছে যে কত লিখিব।

৯।১০।৫১ (মঙ্গলবার) নবমীপূজা—সকালে আমি ও পরিতোষ পূজায় বসিলাম পূজায় কদিনই ঢাক বাজিয়াছে। আজও রাত্রে অনেকে আশ্রমে রাত কাটাইয়াছেন। পূজায় ৩ জন ঠাকুর রান্না করিয়াছে। আজ রাত্রে অনেক মায়েরা আশ্রমে ছিলেন।

১০।১০।৫১—বুধবার আজ (দশমী) সকালে আমি পূজা করিলাম। পরিতোষ তন্ত্রপাঠ করিয়া সকাল ৮টার সময় মাকে ঠাকুর ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। দাদা সকালে বলিলেন আজ হইতে এদের আশ্রম আলাদাই করিয়া দিয়াছি। এই বলিয়া ভিতরে বসিয়া সিগারেট খাইতে লাগিলেন। এ বৎসরের পূজায় কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই। সকলকেই লইয়া পূজা বেদ পাঠ তন্ত্র ভাগবত গীতা ও চণ্ডী রামায়ণ সকলকেই পড়ান হইয়াছে। বৈকালে অদ্বৈতদা বউ লইয়া আসিয়া রাত্রিবাস করিয়াছেন। আজ বৈকালে মায়ের ভোগ ঘুগনি দেওয়া হইয়াছে।

১১।১০।৫১—দাদা সকালে ছেলেদের লইয়া রাধে ২ করিয়া তাহাদের সকলকে প্রসাদ দেওয়াইলেন। সন্ধ্যায় আমায় কীর্তন করিতে বলিয়া দাদা পালেদের বাড়ী গিয়াছেন। আজ আমার মনের অবস্থা অনুরূপ একটা জিনিষের অভাবে কিছুই ভাল লাগে নাই। সেই কারণে রাত্রে কিছু খাই নাই। আজ ২দিন চাটুয্যেকে দিয়া আমার পূজা পাঠ দিয়াছিলাম। আজ হইতে আবার পূজা আরম্ভ করিলাম।

১২।১০।৫১—শুক্রবার সকাল হইতে বলাইদার খুব জ্বর। মায়েরা ভোগ রান্না করিতেছেন। আজ সকালে আমি ও মাষ্টার দুজনে আশ্রমের চারিধারে বনমালা দিয়া সাজাইলাম। যজ্ঞের বেলপাতা ভাঙিয়া আনিলাম। আজ রাত্রি ২টার সময় দেখিলাম দাদা মায়ের বেদীর উপর বসিয়া মাটী হইতে প্রসাদ কুড়াইয়া খাইতেছেন। পরে সমাধী অবস্থায় কিছুক্ষণ ছিলেন, তাহার পর ত্রিশূলের কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া বাছুর দুটীকে আদরের মত করিলেন। আজ অনেক ভক্ত ও শিষ্যরা দাদাকে প্রসাদ খাওয়াতে আসিয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় গুলটুবাবার আনীত কতকগুলি মেয়ে আহিরিটোলা হইতে আশ্রমে ভজন গান শুনাইলেন।

১৩।১০।৫১—শনিবার সকালে দাদা গঙ্গনবাবুর সঙ্গে দাবা খেলিতে বসিয়াছেন আজ রাত্রি ১০টায় মহালক্ষ্মীর প্রতিমা নৃত্যগোপাল কলিকাতা হইতে দিয়া গেল সঙ্গে ২ পূজা ভোগ আরতী আরম্ভ হইল। পরিতোষ আজ মায়ের পূজা করিয়াছে।

১৪।১০।৫১—রবিবার আজ মহালক্ষ্মী পূজা। সকালে কাকার বাড়ীতে একটি ফটো পূজা করিয়া আসিলাম। ১৲ প্রণামী দিয়াছে। সকালে আশ্রমে মায়ের পূজা আমি করিলাম পরে পরিতোষ করিয়াছে। দুপুরে ২ জন মেম ভক্ত আসিয়াছিল। শ্রীরামলু বাবা সকালে বেড়ো হইতে প্রায় ২০০ পদ্ম ফুল আনিয়াছিল আমি সমস্ত ফুল মাকে অর্চনা করিয়া সাজাইলাম। দুপুরে হিরন্ময়দা ভাগবত পাঠ করিয়াছে। অনেক ভক্তরা সকালে দাদাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। রাত্রি ১০টার সময় মায়ের পূজা সারিয়া শ্রীরামলুবাবা হিরন্ময়দা ডাক্তার বাবা জ্ঞান বাবা এই কজনকে সঙ্গে করিয়া রাজা বাবার মোটারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

১৫।১০।৫১—সোমবার আজ সকালে সালকের সরকার বাবা একটি বড় পাটনায়ে গরু আশ্রমে দান করিলেন আজও মহালক্ষ্মী পূজা আমি ও পরিতোষ দুইজনে করিলাম। সরকার বাবা গরুটি ১ মাস গাবিন অবস্থায় অবস্থায় দিয়াছেন। রাত্রি ১০টা শ্রীশ্রীদাদা রাজা বাবার মোটারে আশ্রমে আসিলেন। রাজা আশ্রমেই থাকিয়া গেলেন।

২২।১০।৫১—সোমবার সকালেই গরু ৫টিকে স্নান করাইলাম চিন্ময়দা শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে একটি রচনা লিখিলেন। বৈকালে চিন্ময়দা বাড়ী চলিয়া গেলেন। দাদার শরীর খারাপের জন্য রাত্রে কিছু খাইলেন না।

২৩।১০।৫১—মঙ্গলবার (অষ্টমী) আজ সন্ধ্যার সময় দাদা লীলা কীর্তন করিলেন। রাত্রে ১০টার পর বড়মাকে ও চাটুয্যে মশাইকে দীক্ষা দিলেন ওঁ নমো নারায়ণায় এই মন্ত্রে। দুপুরে আমি সুতা কাটিলাম আজ দুপুরে অদ্বৈতদা আসিয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া গিয়াছেন। দাদু আজ ৫।৬ দিন হইল আশ্রমে নাই। দাদুর ভাইঝি বড়মা খুব প্রাণ দিয়া আশ্রমের কাজকর্ম করিতেছেন। মাষ্টার আজ ২।৩ দিন হইল সকালে যজ্ঞ করিতেছে। একাই যজ্ঞ করিতেছে। আজ রাত্রে দাদা ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থ ও

সন্ন্যাস সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা দিলেন। বিশেষ করিয়া আমাদের দুইজনকে সন্ন্যাস সম্বন্ধে কিছু ২ বলিলেন।

২৭।১০।৫১—শনিবার আজ অন্নকুটের জন্য বড় টিনের ঘরে বান ও ৪টি বড় উনা খোড়া হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় খুব কীর্তন হইয়াছে! আয়ামা ও লীল মা দুজনে অন্নকুটের ভিক্ষায় বৈকালে বাহির হইয়া রাত্রি ৮টায় ফিরিয় আসিলেন।

২৮।১০।৫১—রবিবার সকালে বিমলদা ছোট ভাই ও বাবা ৩ জনে আশ্রমে আসিয়াছেন। চারিদিক হইতে অন্নকুটের বাজার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে সকালে পরিতোষ ও চাটুয্যে দাদার আদেশে ভিক্ষায় বাহির হইয় গিয়াছে। নাটুদা সকালে ভাগবত পাঠ করিতেছেন। বৈকালে কালী মূর্তি আজ আশ্রমে আসিয়াছেন। কালী পূজা মাষ্টারের উপর ভা পড়িল। আজ হইতেই পূজা আরম্ভ হইল। চারিদিকে বনমালা ফুলগাছ দেওয়া হইল। আজ কয়দিন পর দাদা সন্ধ্যায় খুব কীর্ত করিলেন। আমি পরিতোষ ও চাটুয্যে মায়ের ঘরে পূজা ভোগ ও আরত দিতেছি।

২৯।১০।৫১—সোমবার আজ কালী পূজা। মাষ্টার মায়ের পূজা করিয়াছে রা ১২টার সময় দাদা সঙ্কল্প করিয়া পূজা করাইলেন। কলিকাতা হইতে ব ভক্ত আসিয়াছিলেন। রাত্রে হিরন্ময়দা কেশবদা চিন্ময়দা প্রমথ দত্ত বিষ্টু রবি আয়ামা প্রভৃতি আরও অনেকে রাত্রে আশ্রমে ছিলেন। আ পরিতোষ ও চাটুয্যে ভিতরে পূজা করিলাম রাত্রি ১০টার সময় দাদ বিমলদার মোটারে দুঘণ্টার জন্য চৌধুরী পাড়ায় কালী পূজা দেখিতে গিয়াছিলেন।

৩০।১০।৫১—মঙ্গলবার আজ রাত্রি ১০টার সময় অন্নকুটের বাজার কেশবদা আরও দুজনে করিয়া আনিলেন। অন্নকুটে ৩ জন বাহিরের বামুন কর হইয়াছে। রাত্রি ১২টার পর হইতে রান্না সুরু হইয়াছে। পাড়া হইতে অনেক মেয়েরা কুটনা কুটিতে আসিয়াছেন। আজ অনেকে আশ্রমে রাত্রি কাটাইয়াছেন। দাদা সন্ধ্যায় কীর্তন করিয়াছেন। চাতরা প্রমথনাথ দত্ত মশাই অন্নকুটে ভীষণ পরিশ্রম করিয়াছেন।

১।১০।৫১—বুধবার আজ অন্নকূট। প্রায় ৫০০০ ভক্তের সেবা হইয়াছে। দাদা আজ সকালের দিকে একটু গম্ভীর ছিলেন। প্রায় ১৬ মন চাউল সিদ্ধ ও ডাল তরকারী প্রভৃতি বহুরকম রান্না হইয়াছে। ৩।।৹টার সময় ভোগ আরতী হইয়াছে। আমি ঠাকুর ঘরে একা ও পরিতোষ মাষ্টার ও চাটুয্যে ৩ জনের বাহিরে অন্নকুটের আরতী করিয়াছে। আরতীর পর দাদা আসিয়া ৩বার প্রদক্ষিণ ও ডাল তরকারী অন্ন প্রভৃতিতে হাত লাগাইলেন তারপর পরিবেশন সুরু হইল। দাদা বেদীর উপর অন্নের কাছে বসিয়া অনেক ভক্তদের অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পাড়ার ও কলিকাতার অনেক ছেলে ও অনেক লোকরা পরিবেশন করিয়াছেন। পুরুলিয়া হইতে হরিবিলাস দা দুপুরে আসিলেন। যোগীন বাবা আসিয়াছেন। রাত্রে অনেক মায়েরা আশ্রমে ছিলেন।

।১১।৫১—বৃহস্পতিবার (ভাই দ্বিতীয়া) সকালে আশ্রম চারিদিক ধোয়াধুয়ি করা হইল। পরিতোষের আজ ২ দিন হইল খুব পেট খারাপ হইয়াছে। আজ রাত্রি ১১টার সময় দাদার আদেশে দড়ি টানাটানি হইয়াছে। অদ্বৈত দা ও আমি, অদ্বৈত দা ও পরিতোষ, ডাক্তার বাবা ও কেশব দা, মাষ্টার ও সুবোধ, জীবন দা, মেজদা, সেজদা ও দাদা, অদ্বৈত দা ও বলাই দা এই কয়জনে খেলা হইয়াছে।

।১১।৫১—শুক্রবার হরিবিলাস দা ২।৩ দিন হইল আশ্রমেই আছেন। আজ অদ্বৈত দা বউকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

।১১।৫১—শনিবার আজ আশ্রমের ঘাটের দুপাশে সিমেণ্টের মেজে তৈরী করা হইল কালো মিস্ত্রী করিয়াছে॥ আজ একটী মেটরাণীকে ৩ দিন আশ্রমে থাকিতে দাদা আদেশ করিলেন। আজ হরিবিলাস দা ও চিন্ময় দা কলিকাতা বেড়াইতে গিয়াছেন। চিন্ময়দা রাত্রে একা ফিরিলেন।

।১১;৫১—সোমবার কেশবদা ছেলেকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। গনেশের মাথায় দুধ দই প্রভৃতি দিয়া অভিষেক করা হইল। বলাই দা সকালে দেশে চলিয়া গেল। যোগীনবাবা আশ্রমে আছেন। যোগীনবাবা ও লীলামার শরীর খুব খারাপ।

।১১।৫১—মঙ্গলবার আজও গণেশের মাথায় দু বালতী জল ঢালাইলেন।

।১১।৫১—বুধবার জগদ্ধাত্রীপূজা। পরিতোষ ও জলটু বাবা ২ জনে জগদ্ধাত্রী

পূজা করিয়াছে। দাদার আনত মাটীর জগদ্ধাত্রীরও পূজা হইয়াছে। কলিকাতা ডাক্তার মায়ের মূর্তি এই বৎসর লইয়া আশ্রমে গুলটুবাবার মূর্তি ৫ বৎসর পূজা হইল এবং পরিতোষ ব্রতী হইয়াছে। দাদা আজ ৪।৫ দিন টাকার মাটীর পুতুল কিনিয়াছেন। ছোট ২ গণেশ পাখী ও কৃষ্ণ রাধার মূর্তি প্রভৃতি। আজ বৈকালে ব্যায়াম ও শিল্পের একটী মীটিং হইয়াছে।

৮।১১।৫১—বৃহস্পতিবার সকালে আমি মাটীর পুতুলগুলিকে দুটী খুঁটিতে সাজাইলাম। আজ আরও পুতুল কেনা হইল। সন্ধ্যার কীর্তনের সময় ঠাকুর ঘর হইতে কৃষ্ণ রাধা মদনমোহন প্রভৃতিদের রাস মঞ্চে বসান হইল। তাহার পর দাদা সমাধি হইয়া প্রায় ১ ঘণ্টা ছিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে ভজন আরম্ভ হইল। দাদা তাহাদের সঙ্গে গানে বিভোর হইয়া আছেন। বৃন্দাবন হইতে একজন খেপা কীর্তনীয়া আসিয়াছেন। পুতুলগুলি বেদীর সামনে চারিদিকে সাজান হইল। আজ সুবোধের স্কুল তুলিয়াছে।

৯।১১।৫১—শুক্রবার আজ প্রায় ২ মাস আশ্রমে বাস করিয়া চাটুয্যেমশাই ও বড়মা কলিকাতায় বাড়ী চলিয়া গেলেন। ছোটমা ও বঙ্কিমবাবু আশ্রমে রহিয়া গেলেন। দাদা সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ভজনগানে মাতোয়ারা ছিলেন।

১০।১১।৫১—শনিবার এখন মায়েদের আশ্রমে রাত্রে শুইবার আদেশ দাদা দিয়াছেন। সেই কারণে ছোটমা সাধুমা দিদি প্রভৃতি মায়েরা আশ্রমে শুইতেছেন।

১১।১১।৫১—রবিবার আজ সকাল হইতে একটী রূপার প্রদীপ হারাইয়াছে। চারিদিকে খোজাখুজি করিয়া পাই নাই। সন্ধ্যার সময় হাওড়ার দল আসিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও কীর্তন করিয়াছে। মাত্র ২ ঘণ্টা হইয়াছিল। সকালে চাটুয্যে মশাই আসিয়াছিল সন্ধ্যায় চলিয়া গিয়াছে দাদা রাত্রি ১০টার সময় হাবুলের গাড়ীতে করিয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন। রাত্রি ১টার সময় আশ্রমে ফিরিলেন। আজ আন্না মা কমলা মা ছোটমা সাধুমা ও দিদি এই কয়জন মায়েরা রাত্রে আশ্রমে শুইয়াছিলেন। আজ রাত্রে রাস মঞ্চ সাজাইলাম।

১২।১১।৫১—সোমবার রাস পূর্ণিমা সকালে তেঁতুলতলা হইতে হারানো প্রদীপ

সাধুমা কুড়াইয়া পাইলেন। এ বৎসর রাস খুব সাজান হইয়াছে। আজও রাত্রে অনেক মায়েরা আশ্রমে শুইয়াছিলেন। পরিতোষ রাসপূজা করিয়াছে।

১৩।১১।৫১—মঙ্গলবার রাসমঞ্চে চারিধারে প্রদীপ দিয়া সাজান হইয়াছে। পরিতোষ আমি মাষ্টার চাটুযো ও সুবোধ এই ৫জনে আরতী করিয়াছি। সন্ধ্যায় দাদা কীর্তন করিয়াছেন। আজ ৩ দিন ধরিয়া বহু ভক্তের ভিড় হইয়াছে ও বহু ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন।

১৪।১১।৫১—বুধবার আজ সন্ধ্যায় কীর্তনের পর দাদা ভাবের গান গাহিতেছিলেন। এমন সময় লাইট নিভিয়া গেল। রাত্রি ১০টার সময় আলো জ্বলিবার পর কীর্তন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া রাস ভাঙিলেন। সকালে চাটুয্যে মশাই আসিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টার পর রাধাকৃষ্ণ মদনমোহন গোপাল প্রভৃতি ঠাকুরদের ঠাকুর ঘরে আমি পরিতোষ দাদার আদেশে তুলিয়া রাখিলাম। দুপুরে আমি পৈতা কাটিয়াছি। ভিজয়ানাগ্রাম হইতে একটী মেটরাসী নাম আপ্পাই পানথুলু আজ প্রায় ১৫ দিন আশ্রমে রাত কাটাইতেছে।

৭।১২।৫১—শুক্রবার গতকাল দাদুর অসুখের জন্য শিবুদার কাছ হইতে দিলাম। দাদু খাইলেন না। আজ সকালে আমি ও পানথুলু দুজনে বড় গরুটীর জন্য একটী ছোট গোয়াল ঘর তৈয়ারী করিলাম। সুবোধের আজ ড্রয়িং পরীক্ষা ছিল।

৮।১২।৫১—শনিবার সকালে বেনারস হইতে পণ্ডিতজি আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ পাইয়া সামান্য বেড়াইতে গিয়াছেন! সুবোধের আজ হিন্দি পরীক্ষা ছিল। দুপুরে আমি পরিতোষ দাবা খেলিতেছি এমন সময় শ্রীশ্রীদাদা আসিলেন। আজ বৈকালে মিটিং ছিল। কেশবদা হিরন্ময়দা প্রভৃতি অনেক ভক্তরা আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আজ কয়দিন হইল দাদুর জ্বর অর্শ প্রভৃতি অসুখ হইয়া খুব ভুগিতেছেন।

১১।১২।৫১—মঙ্গলবার আজ দাদুর অসুখ খুব বাড়িয়াছে। আমি ঘোষ বাবার বাড়ী গিয়া দাদাকে দাদুকে দেখিতে আশ্রমে আসিবার জন্য বলিলাম। দাদা বলিলেন কাল যাইব। আমি আশ্রমের ফিরিবার পরই দাদা কেশবদাকে দাদুকে দেখিয়া আসিতে পাঠাইয়াছেন। চাটুয্যে আজ

চাকরীতে গিয়াছিল। বৈকালে পানথুলু গরুর সেবা করিয়াছে। হাওড়ার ডাক্তার আসিয়া দাদুকে ইনজেকসান দিয়া বলিলেন দাদুর ডবল নিমোনিয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ১৫।১৬ টাকার ওষুধপত্র পরিতোষ মল্লিক ফটক হইতে কিনিয়া আনিয়াছে।

১২।১২।৫১—বুধবার বৈকালে ৪টার সময় দাদা দাদুকে দেখিতে আসিলেন। রাত্রি ৮টায় চলিয়া গেলেন। কেশবদাকে রাত্রে থাকিবার জন্য দাদা আদেশ দিয়া গেলেন। বৈকালে রবি ও আয়মা আসিয়াছিল। গত রাত্রে ছোটমা দাদুর কাছে ছিলেন। আজ কমলামা ও ছোটমা দাদুর কাছে আছে।

১৯।১২।৫১—বুধবার পলাশার মায়েরা দেশে যাইবে বলিয়া দাদার সঙ্গে দেখা করিতে টালায় গিয়াছিল। সন্ধ্যায় আবার মায়েদের আশ্রমে দাদা সঙ্গে করিয়া আনিলেন। আজ দুপুরে রবির মাসতুতো ভাইকে সঙ্গে আনিয়াছিল। শঙ্খচক্র দেওয়া হইল।

২০।১২।৫১—দাদা আশ্রমেই আছেন। কেশবদা বৈকালে আসিয়া রাত্রে ছিলেন। দাদুর গতকাল হইতে আবার জ্বর হইয়াছে। পলাশার মায়েরা গত রাত্রি আশ্রমে কাটাইয়া আজ সকালে ভিজিয়ানাগ্রাম রওনা হইলেন। আজ দাদা সাড়ে তিনটায় সকলকে ঘুম ভাঙাইয়া দিয়াছেন। আজ হইতে ভোরে (ধনুরমাস) সুরু হইল। আজ সকালে রাওবাবা গহনা-শুদ্ধ একটি চামড়ার সুটকেস আনিয়া আশ্রমে দিনকতকের জন্য রাখিয়া গিয়াছে।

২১।১২।৫১ (শুক্রবার)—সুবোধের আজ প্রমোশন হইয়াছে। সুবোধ ক্লাসে ফাষ্ট হইয়াছে। আজ পুকুর পাড়ে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞকুণ্ড করিয়া তাহাতে পরিতোষ ও আমি যজ্ঞ করিলাম। কেশবদা আজ সুবোধের একটি সোয়েটার পাঠাইয়া দিয়াছেন।

২২।১২।৫১ (শনিবার)—পানথুলু দুপুরে চাকরীর চেষ্টায় গিয়াছে, বৈকালে হিরন্ময়দা ডাক্তারদা প্রভৃতি আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় কীর্তনের পর ধ্রুপদ গান হইয়াছে। দাদুর এখনও জ্বর ছাড়ে নাই। দাদা রাত্রি ১০টায় শিবপুর হালদার বাড়ী গিয়াছেন রাত্রে ছিলেন।

২৪।১২।৫১ (সোমবার)—(আজ বড়দিন) দাদুর অবস্থা ভাল নয়। শ্রীশ্রীদাদাও এই কথা বলিলেন ডাক্তারবাবাও বলিলেন। সকালে বেড়ো হইতে

সীতারাম ও জামাইকে লইয়া আশ্রমে আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তনের পর শিবুদাদের ধ্রুপদ গান হইয়াছে। ডাক্তারবাবা রাত্রে আশ্রমে ছিলেন।

২৫।১২।৫১ (মঙ্গলবার)—ছোটমা আজ হইতে তিনদিন রান্নাঘরে ঢুকিবেন না। সকালে বড়মা ও চাটুয্যে মশাই আশ্রমে আসিলেন। ডাক্তারবাবা রাত্রে আশ্রমে ছিলেন। দাদুর অবস্থা আজ ভাল নয়। নাড়ি ক্রমশঃ ফেল করিতেছে।

দাদুর স্বর্গারোহণ

১১ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর—বৈকাল ৪।১০ মিঃ দেহত্যাগ করেন। শ্মশানে রাত্রি ৯টা ৫ মিঃ আগুন দেওয়া হয়। রাত্রি ৩টায় আশ্রমে ফিরিলাম ও দাদুর মৃত্যুর জায়গায় কালিমূর্তিকে আমি ও পরিতোষ বসাইলাম। শ্মশানে ১৪ জন গিয়াছিলাম। শ্মশান-বন্ধুর নাম তুলসী, পরিতোষ, খাদুদা, চাটুয্যে, গৌরি, রাজা, হিরন্ময়দা, কেশবদা, ভালুদা, জীবনদা, নিতাইদা, ডাক্তারবাবা, বিভূতিদা, রবি, সীতারাম এই কয়জন। সমস্ত রাস্তা কীর্তন করিতে করিতে গিয়াছি।

২৮।১২।৫১ (শুক্রবার)—দাদা আশ্রমেই আছেন। পুকুর পাড়ের যজ্ঞের আহুতি আমি দিলাম। দাদা আজ দুপুরে খুব লীলাকীর্তন করিলেন। কীর্তন করিতে করিতে দাদুর উদ্দেশ্যে বলিলেন যে তিনিও শীগ্‌গির যাচ্ছেন এবং দাদু যেন বৈকুণ্ঠে তাঁর জন্য জায়গা ঠিক করিয়া রাখেন। কীর্তন করিতে করিতে কাঁদিলেন খুব।

২৯।১২।৫১ (শনিবার)—আজ সুবোধ চাটুয্যে ও পিতান তিনজনে দুপুরে দাদুর ঘরে দাদার আদেশে সেইখানে প্রসাদ পাইয়াছে। কেশবদা ছোট ছেলেকে আনিয়া ৩ রাত্রি কাটাইয়া গেলেন।

৩০।১২।৫১ (রবিবার)—আশ্রমে আজ মীরাবাঈ যাত্রা হইয়াছে। বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা পর্যন্ত। বহু লোক দেখিতে আসিয়াছে। শ্রীশ্রীদাদা যাত্রা হইবার পর রাত্রি ১০টার সময় জগাছার শঙ্করদা বাড়ী গিয়াছেন। ও রাত্রি থাকিবেন এরূপ কথা আছে। আজ আমি একটি জুতা চোর ধরিয়া খুব প্রহার করিয়াছি।

১৩।২।৫২—শ্রীশ্রীদাদা বৈকালে আশ্রমে আসিলেন। সন্ধ্যায় আমাদের সামান্য কীর্তন গান হইয়াছে। রাত্রে ধ্রুপদ গান হইয়াছে। আমি চণ্ডি এবং ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্রে ২ জায়গায় যজ্ঞ করিলাম। রাত্রি ১০টার পর আমাদের লইয়া দাদা খুব কীর্তন করিলেন। চাটুয্যে আজ রাত্রে আশ্রমে ঘাটের ঘরে শুইয়াছে। রাত্রে কেশবদা, কমলামা, ছোটমা, কেশবদার ছোট ছেলে আশ্রমে ছিল। সন্ধ্যা ৬টার পর ৪টি হোমকুণ্ডে আগুন দেওয়া হইল।

১৪।১।৫২—আজ জন্মঅষ্টমী, দাদা সকালে সামান্য কীর্তন করলেন। কলিকাতা হইতে প্রায় ৩০টি ছোট ছোট মেয়ে আসিয়া সকাল হইতে গান-বাজনা করিয়াছে। বলাইদা সকালে দেশ হইতে আসিয়া রান্নার কাজে লাগিয়া গেল। লক্ষণ ও ভূষণ বাসনমাজা কাজে লাগিয়াছে। বৈকালে অনেক গাইয়ে বাজিয়ে আসিয়া সমস্ত দিন গান-বাজনা কীর্তন প্রভৃতিতে কাটিল। দুপুরে তিনটার সময় দাদাকে ভোগ আরতি ও রাত্রি ১০টায় পূজা করা হইল। পরিতোষ দুবেলা পূজা করিয়াছে। পূজার সময় সমাধিতে ছিলেন। রাত্রের পূজায় সমাধি হয়েছেন। প্রায় এক হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন।

১৫।১।৫২—দ্বিতীয় দিন জন্মোৎসব, দাদা আজ আর আরতি করিতে দিলেন না। চণ্ডির আরতি হইল। বহু ভক্ত আসিয়াছেন।

২১।১।৫২—সকাল ৭টায় কিছু জলযোগ করিয়া সীতারাম আমি ও সঙ্গে দুজন নাম বিষ্টু ও হরি এই ৪ জনে পঞ্চকোট পাহাড়ে প্রায় ৫।৬টি মন্দির দেখিয়া পাহাড়ের উপর পর্যন্ত গিয়াছি। পঞ্চকোট উচ্চে প্রায় ১৬শ ফুট। উপরে বাঘ, বাঁদর, হনুমান প্রভৃতির উপদ্রব আছে। পাহাড়টি উঠিতে এবং নামিতে আমাদের প্রায় ৫. ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে। উপরে একটি ঝরণা আছে জল অতি সুন্দর। সেইখানে কিছুক্ষণ বসিয়া চিড়া মুড়ি গুড় প্রভৃতি আহার করিলাম। উপরে আমরা রাস্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। গাছে চড়িয়া অনেক কষ্টে একটি নামিবার রাস্তা পাইলাম। আমাদের রামক্যানালি গ্রামে ফিরিতে প্রায় ৪টা বাজিয়া গেল। আজই রামক্যানালি হাট ছিল। বৈকাল ৪টার পর চা প্রভৃতি খাইয়া হাট দেখিতে গেলাম। হাট হইতে আমার জন্য একটি গামছা ও কিছু বাজার করিলাম। আজ

সীতারামের আর এক আত্মীয় ঘরে রাত্রে রহিলাম নাম মদনবাবু। খুব যত্ন করিয়া দুধ চিড়া প্রভৃতি খাওয়াইলেন। পঞ্চকোটের উপরে একটি রঘুবরের মন্দির আছে।

২২।১।৫২—সকালে নটায় রামক্যানালী হইতে সীতারামের ঘরে আসিলাম ও চা খাইয়া বেড়ো আশ্রমে ফিরিলাম। বাঁধে স্নান করিয়া আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বৈকালে কৃষ্ণবাবুর বাড়ী গিয়া প্রায় ১ ঘণ্টা কথাবার্তা করিয়া আসিয়াছি। রাত্রি নটায় শুইয়া শ্রীশ্রীমা আককা, মাধব, শান্তি ও আমি এই কয়জনে অনেকক্ষণ গল্প করিয়া ঘুমাইলাম।

২৪।১।৫২ (সোমবার)—আজ একটি যুদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরচিন্তা ও আরাধন··· ইহার চেয়ে বড় যুদ্ধ আর কি আছে। ঘা না খাইলে ঈশ্বরের অনুভূতি আসে না।

১।২।৫২—(আশ্রমে এই প্রথম বিবাহ) ১৮ই মাঘ শুক্রবার ব্যাতড়ের রামবাবুর কন্যা শঙ্করী শালিমারের শচীনবাবুর ছেলের সঙ্গে আশ্রমে রাত্রি ১টার সময় বিবাহ হইয়া গেল। আশ্রমে অনেক ভক্ত ও শিষ্যরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীদাদা আশ্রমেই ছিলেন। পুরোহিত নাপিত প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে বিবাহ হইয়াছে। আজ মদনমোহন গোপালকে দোলায় ঝোলান হইল।

২।২।৫২—শনিবার সকালে মোটরে করিয়া শচীনবাবু বরকনে লইয়া গেলেন। বৈকালে হিরন্ময়দা ও আরো অনেক ভক্তশিষ্য আশ্রমে আসিয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় এক ভক্তের একটী বড় যজ্ঞ হইয়াছে। ৫ জন কুমারী ৫ জন ব্রাহ্মণ ৫ জন বিধবা ৫ জন এয়োস্ত্রী ৫ জন বালক এই সকলকে একখানি করিয়া কাপড় পরাইয়া যজ্ঞের কাছে বসান হইল। পরিতোষ আমি মাষ্টার চাটুয্যে ও আর একজন এই ৫ জনে সন্ধ্যা পর্যন্ত যজ্ঞ করিলাম। রাত্রে শিবুদাদের ধ্রুপদ গান বাজনা হইয়াছে।

৩।২।৫২ (রবিবার)—দাদা আজ সন্ধ্যা ৭টায় টালায় ও বালিতে কেষ্টকে দেখিতে গিয়েছিলেন। রাত্রি ১১টায় আশ্রমে ফিরিলেন। আজ ৫।৬ দিন হইল দিবাকর চক্রবর্তী নামে একটি ছেলে ঘাটে চাটুয্যের সঙ্গে রাত্রে শুইতেছে ও একসঙ্গে খাইতেছে। ঘাটে কদম গাছের গোড়ায় পুকুরের

পাড়ে একটি যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ারী করা হইতেছে। আমার ছোট ভাইয়ের পৈতার জন্য আজ একবার আমি বাড়ী গিয়াছিলাম।

৪।২।৫২—সোমবার সকালে সুশীলবাবু দাদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। দাদা সন্ধ্যায় একটি মাড়োয়ারীর বিবাহে কলিকাতা গিয়াছিলেন। রাত্রি ১২টায় আশ্রমে ফিরিয়াছেন। সন্ধ্যার আগে বিমলদা আশ্রমে আসিয়াছিলেন। পুকুর পাড়ে আজ একটি যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ারী করা হইল। রাত্রে আমি সামান্য যজ্ঞ করিয়াছিলাম।

৭।২।৫২—মাষ্টারের গতকাল হইতে জ্বর সর্দি হইয়াছে। আজ বৈকালে মায়ের সামনে একটি ৪ চৌকো ৩ মানুষ হুমকুণ্ড খুঁড়িতে আরম্ভ করিবাম।

১০।২।৫২—মায়ের সামনে হুমকুণ্ড প্রায় ১ হাত খুঁড়িলাম। পরিতোষ ও আমি দুজনে খুঁড়িয়াছি। বৈকালে আমি পরিতোষ পিতান চাটুয্যে ৪ জনে কলিকাতার এক ভক্তের যজ্ঞ করিলাম। শ্রীশ্রীদাদা বৈকালে আশ্রমে আসিয়াছেন।

১৩।২।৫২ (বুধবার)—বড় টিনের ঘরটি আজ ভাঙা হইয়াছে। ৩ মানুষ হুমকুণ্ডটি আজ পরিতোষ ও পিতান খুঁড়িয়াছে। আজ ভিতরে রান্নাঘরে রাত্রে রান্না হয় নাই। বাহিরে কালির রান্নাঘরে নূতন করিয়া সেইখানেই ভোগ রান্না হইল। আমরা ও আরও অনেকে প্রসাদ পাইলাম। চক্রবর্তীর আজও জ্বর আছে। আজ রাত্রি হইতে ৩টা ডেলাইটের মধ্যে ২টি জ্বালিতে আরম্ভ করিলাম।

১৫।২।৫২ (শুক্রবার)—বৈকালে রাজেন বকসীবাবা ছেলেদের লইয়া আশ্রমে আসিয়াছেন ও রাত্রে দাদাকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

২৫।২।৫২ (সোমবার)—আজ গ্রহণ সকালে মদনমোহন গোপাল রাধাকৃষ্ণ অন্নপূর্ণা কালী ভেঙ্কটেশ্বর দুর্গা প্রভৃতিদের অভিষেক করিলাম। বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত আমি পরিতোষ কেশবদা ও ডাঃ আয়েঙ্গার গ্রহণযজ্ঞ করিলাম।

২৮।২।৫২ (বৃহস্পতিবার)—সকালে উলুবেড় হইতে একজন গেরুয়াধারী বৃদ্ধ আশ্রমে আসিয়াছেন। সন্ন্যাস লইব বলায় দাদা তাহাকে নেড়া করাইয়া দিলেন। নাম বিহারীলাল বাগ। দুপুরে পরিতোষ আমি ডাঃ আয়েঙ্গার ২টী মশারী একটি গামছা কিনিতে কলেজ স্ট্রীট গিয়াছিলাম। বৈকালে

কেশবদা আসিয়াছেন। নীলিমার চশমা করাইবে বলিয়া কেশবদার সঙ্গে শরবিন্দুকে চোখ দেখাইতে গিয়াছিলেন।

২৯।২।৫২ (শুক্রবার)—সকালে কেশবদা চলিয়া গেলেন। আজ সকালে বিহারীলাল বাগ বৃদ্ধটী শ্রীশ্রীদাদার হাতে ১০.০০ টাকা দান করিলেন। আজ হইতে দাদা নাম রাখিলেন (নারানদাস মুনি) রাত্রে ঘাটে চাটুয্যের কাছে শুইবার আদেশ দিলেন।

৩।৩।৫২ (সোমবার)—সকালে মায়ের সামনে হুমকুণ্ডটী আমি ও পিতান প্রায় দেড় মানুষ খুঁড়িলাম। মাষ্টার সকালে হাসপাতাল গিয়াছিল, বিহারীলাল বুড়ো সকালে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। বৈকালে দাদার আসন পূবদিক হইতে পশ্চিমে আনা হইল।

৪।৩।৫২ (মঙ্গলবার) সকালে ১০টার সময় বেনারস হইতে রাজকুমার মাত্র ১ ঘণ্টার জন্য ডাঃ আয়েঙ্গারকে দেখিবার জন্য আশ্রমে আসিয়াছেন। আমি সকালে ডাঃ আয়েঙ্গারের শালা আশ্রমে আসিয়াছিল। পরিতোষ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া হাওড়ায় বার্থ রিজার্ভ করিতে গিয়াছে, সকালে আমি মাষ্টার দুজনে মায়ের সামনে হুমকুণ্ডটী খুঁড়িলাম। আজ হুমকুণ্ড হইতে প্রথম জল বাহির করিলাম। শ্রীশ্রীদাদা আজ বৈকালে কলিকাতার ঘোষবাবার বাড়ী গিয়াছেন ও রাত্রে ছিলেন।

৫।৩।৫২ (বুধবার)—হুমকুণ্ডটী আরও বড় করিয়া খুঁড়িলাম। সকালে নাবানদাস বাবাজী ভোগ খাইবে না বলিয়া খুব রাগ হইয়াছিল।

৭।৩।৫২ (শুক্রবার)—আমি কাল কানপুর যাইব বলিয়া গুরুর কাজ চক্রবর্তীকে দেখাইয়া সবরকম বুঝাইয়া দিলাম।

৮।৩।৫২ (শনিবার)—আমি সকালে ৮টায় কানপুর রওনা হইলাম। ২১।৩।৫২ পর্যন্ত কানপুর লক্ষ্ণৌ প্রয়াগ এলাহাবাদ গয়া এই কয়টী জায়গায় ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তায় কোন বিপদ হয় নাই।

২১।৩।৫২—আজ সকালে আশ্রমে ফিরিলাম, দেখিলাম ৫।৬ দিন হইল আশ্রমে একটি রেডিও লওয়া হইয়াছে। আজ ডাঃ আয়েঙ্গার কলিকাতা থাকিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

২৩।৩।৫২—আজ হইতে হাওড়ায় ও আশ্রমে সব জায়গায় এ, সি, কারেন্ট

লাইট দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীদাদা আজ ঘোষ বাবার বাড়ী চলিয়া গেলেন। মায়ের সুমুখে পাতকোটী এখনও খোঁড়া হইতেছে।

২৫।৩।৫২. (মঙ্গলবার)—আজ বৈকালে শ্রীশ্রীদাদা ঘোষবাবার বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিলেন ও মানুষ হুমকুণ্ডায় একটী বড় যজ্ঞ হইল। দাদা রাত্রে চলিয়া গেলেন।

২।৪।৫২ (বুধবার)—আজ সকালে ৭টার সময় কুষ্টিয়ার মা আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীদাদাকে লইয়া শ্যামনগরে অন্নপূর্ণা পূজা করাইতে গেলেন। আন্নামা সকালে বাড়ী চলিয়া গেলেন। ঘোষ বাবা সকালে আসিলেন। আমি মায়ের পূজা করিলাম। ১২টায় দাদা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা হইতে অনেক ভক্তরা আসিয়াছেন; কুষ্টিয়ার মা রাত্রে রহিয়া গেলেন। আন্নামাও ছিলেন।

৩।৪।৫২ (বৃহস্পতিবার)—আজ রামনবমী শ্রীশ্রীদাদা আজ আশ্রমে আছেন। অনেক ভক্তরা আজ আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। আজ দুপুরে, সন্ধ্যায় খুব কীর্তন হইয়াছে। কাটুর পাড়া হইতে কীর্তনের দল আসিয়া রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কীর্তন করিয়াছে। কেশবদা অন্নপূর্ণা মায়ের ছেলে প্যাড়ি আশ্রমে ছিল।

৪।৪।৫২ (শুক্রবার)—বলাইদা সকালে মায়ের সামনে পাতকোটী প্রায় ২ হাত কাটিয়াছে। আজও সন্ধ্যায় খুব কীর্তন হইল। তবে দাদা আজ মোটেই কীর্তন করেন নাই। প্যাড়ি আজও আশ্রমে আছে।

৮।৪।৫২ (মঙ্গলবার)—সন্ধ্যায় দাদা আজ খুব কীর্তন করিলেন। আন্নামার হাটুতে কাকড়া বিছা কামড়াইয়াছে। সেই কারণে সকালে আশ্রমে আসিয়াছেন!

১১।৪।৫২ (শুক্রবার)—দাদা আশ্রমেই আছেন। বহু বহু দূর হইতে অনেক রুগী আসিতেছে। অদ্বৈতদার ছোট ভাই আজ নেড়া হইয়া আশ্রমে আসিয়াছে। কুষ্টিয়ার মা আজ ২।৩ রাত্রি আশ্রমে কাটাইয়া আজ কীর্তনের সময় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। এখন প্রত্যহই কীর্তনের শেষে দুপুরে ও সন্ধ্যায় রাধে রাধে করিয়া বধ্যিখানের বেদীর চারিপার্শ্বে ঘোরা হয়। উপস্থিত আশ্রমে ৫।৬ জন ভক্ত রাত্রি বাস করিতেছে।